জাঁ-ক্রিস্তফ

[উষার আলো]

রমাঁ রোলাঁ

জাঁ ক্রিস্তফ

উ ষা র আ লো

মূল ফরাসী উপন্যাসের প্রথম খণ্ড

অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাপক : রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, লিঃ, কলিকাতা-১৩।

ধা॥

অনুবাদকের কথা

'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর স্রষ্টা রমাঁ রোলাঁ বর্তমান জগতের শুধু একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নন্, তিনি বিংশ-শতাব্দীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, অনন্যসাধারণ অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের অবিস্মরণীয়দের একজন।

বিংশ-শতাব্দীতে সমগ্র য়ুরোপের সভ্যতা যখন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতার স্বার্থে ও প্রভাবে মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় প্রকট হইয়া উঠিল, যখন য়ুরোপে, সভ্যতা, সাধনা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ-ধর্ম ও সমাজ-চেতনা রাজনৈতিকদের প্রচণ্ড প্রেরণায় শুধু নরঘাতী বিদ্বেষ আর রাজ-নৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল, তখন সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে এই একটি লোকের অন্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু অবিনাশী, যাহা কিছু দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে মানব-কল্যাণধর্মী, তাহা তাহার আশ্রয় পাইল।

সেদিন জাতি-প্রেমে অন্ধ ও উন্মাদ য়ুরোপ, প্রত্যেক যুধ্যমান জাতির সশস্ত্র আক্রোশের লেলিহান প্রতিহিংসা-বাসনার মধ্যে, সমর-নেতাদের ক্রুদ্ধ অভিশাপ আর আক্রমণকে মাথায় লইয়া, রমাঁ রোলাঁ তাঁহার অপরূপ সাহিত্য-সাধনায় য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিদারুণ অপঘাতের হাত হইতে রক্ষা করেন। পুরাকালে যখন শত্রু নগর আক্রমণ করিত, তখন নগরের মধ্যে যাহা কিছু মূল্যবান, রক্ষণীয়, তাহা নগর-মন্দিরে আনিয়া যুদ্ধের ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা হইত; তেমনি গত তিন যুগ ধরিয়া আত্ম-ঘাতী সমরানলে, স্বার্থের সংঘর্ষে আর মারাত্মক রাজনৈতিক সর্বস্বতায়, য়ুরোপের সভ্যতার যা কিছু রক্ষণীয় ধন, রমাঁ রোলাঁ তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মন্দিরে। প্রমত্ত উন্মাদ য়ুরোপে রমাঁ রোলাঁ ছিলেন য়ুরোপের জাগ্রত প্রজ্ঞা। হোমার ভার্জিলের য়ুরোপ সক্রেটীস্ প্লেটোর য়ুরোপ, মাইকেল এ্যানজেলো আর দাভিঞ্চি আর রাফায়েলের য়ুরোপ, দান্তে শেক্সপীয়ার য়ুগো গ্যেয়টে টলষ্টয়ের য়ুরোপ, গ্যালিলিও নিউটনের য়ুরোপ, বিঠোফেন, হ্বাগনার আর মোজার্টের য়ুরোপ, সেই য়ুরোপকে তিনি বাঁচাইয়া গেলেন চার্চিল আর হিটলার আর মুসোলিনীর য়ুরোপের বর্বর আত্মস্ফীতির রক্ত-কলঙ্ক থেকে। তাঁহার অমর-সৃষ্টি 'জাঁ-ক্রিস্তফ' হইল সেই অনন্য-সাধারণ

একক সাধনার অমর স্মৃতি-চিহ্ন, নব-যুগের য়ুরোপের 'মহাভারত'। এপিক-মহিমা-চ্যুত পৃথিবীতে মানব-মনের শেষতম এপিক।

বিংশ শতাব্দীর কাহিনী-সাহিত্যে 'জাঁ-ক্রিস্তফ' অদ্বিতীয় অনন্য-সাধারণ, একক...গঠনের দিক থেকে প্রাচীন মিশরের পিরামিডের মতন বিশাল, স্থির; অন্তরের দিক থেকে মহাসমুদ্রের মতন প্রাণ-গভীর; নিত্য-প্রাণ নিত্যশব্দ, নিত্য-সুর, নিত্য-গতির জন্মভূমি। সুবিশাল বন্ধনের মধ্যে গর্জন করিতেছে সুবিপুল গতি।

য়ুরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের মারাত্মক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ সমগ্র মানবীয় সভ্যতায় আজ যে মহা-সংকট দেখা দিয়াছে, বিশ্ব-মানবের দিক হইতে রোলাঁ 'জাঁ-ক্রিস্তফ' গ্রন্থে তাহার অন্তর ও বাহিরের মর্ম-কাহিনীকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই 'জাঁ-ক্রিস্তফ' শুধু জার্মানীর কাহিনী নয়, শুধু ফ্রান্সের কাহিনী নয়, শুধু য়ুরোপের কাহিনী নয়, 'জাঁ-ক্রিস্তফ' হইল আজিকার বিশ্ব-মানবেরই কাহিনী। আজকে বিশ্ব-মানবের চেতনায় যে সব দুঃখ, ব্যথা, সমস্যা, আশা, আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবীয় নীতি ও আচরণে যে মূল্য-বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, 'জাঁ-ক্রিস্তফ' গ্রন্থে রোলাঁ জীবনের তিক্ততম অভি-জ্ঞতার মধ্য হইতে মহাকবি আর মহাজীবনের স্রষ্টা ঋষির ধ্যান-সিদ্ধ সত্য-দৃষ্টি লইয়া তাহাদের দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। চিন্তার এই ভয়াবহ অরাজকতার মধ্যে, প্রমত্ত শক্তির দানবীয় একাধিপত্যের যুগে, বিশ্ব ব্যাপী একচক্ষু রাজনৈতিকদের সম্মিলিত বাধা আর আক্রোশের বিরুদ্ধে, পৃথিবীময় সাধারণ মানুষের হত চেতন উদাসীনতার উর্ধ্বে, রোলাঁ এই মহাগ্রন্থে মানব-মনের চিরসত্যকে অনাগত পৃথিবীর মানুষদের জন্য অনির্বান অগ্নি-শিখার মতন জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর মধ্যে যে-সত্য মূর্ত হইয়া আছে, তাহা পুঁথিগত নীতি-কথার প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি নয়, সে-সত্য তাঁহার জীবনের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের রক্ত-ঝরা সাধনার বাস্তবতায় অগ্নিমান্, সে-সত্য বুদ্ধের উপলব্ধির মতন, যিশুর সজ্ঞান আত্ম-তর্পণের মতন, মহাত্মা গান্ধীর সত্যানু-সন্ধানের মতন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার তপস্যার মতন, তাঁহার প্রত্যেকটি অনুভূতিকে, প্রত্যেক অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে অনির্বাণ প্রাণ-বহ্নিতে রূপান্তরিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, যাহার ফলে 'জাঁ-ক্রিসতফ'-এর প্রতিটি অক্ষর তাহার ভাষাগত দেহকে ছাড়াইয়া একটি নিদ্রাহীন তন্দ্রা-হীন জাগ্রত মনের আশ্রয় হইয়া আছে। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' গ্রন্থের মধ্যে

জাগিয়া আছে, মহাকালের সজাগ প্রহরীর মতন, রোলাঁর অপরাজেয় মন, যে-মন সকল দুঃখ, সকল দৈন্য, সকল ব্যর্থতা আর বেদনার মধ্য হইতেই ঘোষণা করিয়া গেল, To know life and yet to love it.

য়ুরোপীয় সভ্যতার দুই প্রধান প্রতিনিধি, জার্মানী ও ফ্রান্স, অঙ্গাঙ্গী প্রতিবেশী, অথচ এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিত্য স্পন্দমান য়ুরোপের ইতিহাস। এবং বিংশ-শতাব্দীতে এই জাতি-বৈরিতা প্রচণ্ড বিদ্বেষের আগুনে সমগ্র য়ুরোপকে জ্বালাইয়া, বিশ্ব-জগৎকে দগ্ধ করিল। এবং এই বিদ্বেষই আজ সমগ্র জগতের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। তাই রোলাঁ এই দুই জাতিকে কেন্দ্র করিয়া 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর কাহিনীকে গড়িয়া তোলেন। এবং তাঁহার গ্রন্থের নায়ক, জার্মান জাঁ-ক্রিস্তফ, জার্মান প্রতিভার সুন্দরতম অভিব্যক্তি, একদা জার্মান শাসকদের সামরিক দম্ভ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, জাতি-দ্রোহের কলঙ্ক ও অভিশাপ লইয়া, চিরশত্রুর দেশ মায়াবিনী ফ্রান্সকেই অন্তরের সম্রাজ্ঞী বলিয়া বরণ করিয়া লইল। যে-সত্যের জন্য নিজের জন্মভূমিকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিতে হইল, এবং যে-প্রেয়সীর আকর্ষণে সে তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রলয়-সমুদ্রে পাড়ি দিল, একদিন চরম বেদনায় তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইল, সেই ফ্রান্স, তাহার অন্তরের প্রেয়সী, ভালবাসার মূল্যস্বরূপ সেও চাহে মিথ্যার সহিত আপোষ, অন্যায়ের সহিত আত্ম-প্রবঞ্চনা, আত্ম-বিক্রয়। জাঁ-ক্রিস্তফের সত্যাগ্রহী অন্তর ফ্রান্সের সেই বুদ্ধি-দীপ্ত সূক্ষ্ম আত্ম-প্রতারণার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জার্মানী তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া নির্বাসন দিল, ফ্রান্সও যেদিন বুঝিল জাঁ-ক্রিস্তফ অন্যের মত তাহাকে মানিয়া লইতে সম্মত নয়, ফ্রান্সও সেদিন তাহাকে জার্মানীর গুপ্তচর বলিয়াই ঘোষণা করিল। এই দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষের যে বিশাল প্রাচীর প্রতিদিনই বিশালতর হইয়া উঠিতেছিল, জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে উৎসর্গ করিল, সেই বিদ্বেষের প্রাচীরকে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য। তাহার সমগ্র জীবন হইল এই যুগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে অতন্দ্র সংগ্রাম। মানুষের পুঞ্জীভূত অন্যায় আর মিথ্যার বিরুদ্ধে চির-অপরাজেয় মানব-আত্মার বিদ্রোহ।

এই পটভূমিকার উপরে রোলাঁ মানবাত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার নায়ক জাঁ-ক্রিস্তফকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এই বিশাল গ্রন্থে তিনি জাঁ-ক্রিস্তফকে বর্তমান জীবনের সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়া, সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাই এই গ্রন্থ হইল, বর্তমান

জীবনের সুবিশাল রঙ্গমঞ্চ। এবং এই বিরাট রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত নায়ককে সৃষ্টি করিতে গিয়া, তিনি তাহাকে সঙ্গীত-শিল্পী করিয়াই গড়িয়াছেন। জীবনের শুধু বাহিরের রূপ নয়, জীবনের অন্তরের অন্তরতম স্পন্দন ধরা পড়ে একমাত্র সঙ্গীতে। সঙ্গীত হইল আত্মার বাণী। সে-বাণীকে সঙ্গীত যেমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে, আর কোন শিল্প তেমনভাবে তাহা পারে না। যাহা অব্যক্ত, যাহা অনাদি, অনন্তের সহচর, একমাত্র সঙ্গীতই পারে তাহাকে স্পর্শ করিতে, তাহাকে রূপ দিতে। জাঁ-ক্রিস্তফের আদর্শবাদী শিল্পী-অন্তর সেই অনাদি অনন্ত প্রাণ-শক্তিরই উপাসক, তাহার জীবন সেই প্রাণ-শক্তিরই খণ্ড প্রকাশ, তাই সে সঙ্গীত-শিল্পী। তাহার মধ্য দিয়া রোলাঁ শিল্প-সাধনার অমর মহাকাব্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। জাঁ-ক্রিস্তফ বিশ্বের অমর শিল্পীর প্রতিনিধি। তাহার ব্যক্তিগত সাধনার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে শিল্প-সাধনার নিগূঢ় ইতিহাসের মর্ম কাহিনী।

• • • •

রোলাঁ ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা করেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে এই বিশাল গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড রচনা করেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এই গ্রন্থ যখন ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়, তখন ফ্রান্স ইহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। ফরাসী সমালোচকেরা কেহ কেহ সমালোচনা করেন বটে কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁহারা প্রশংসার কিছুই দেখিতে পান নাই। সম্পূর্ণ অবজ্ঞার মধ্যে এই গ্রন্থ এবং তাহার সৃষ্টিকর্তা বৎসরের পর বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকে। তারপর যখন মহাযুদ্ধ সমগ্র য়ুরোপকে ছিন্নভিন্ন আর্ত করিয়া তুলিল, তখন সেই যুদ্ধ-ধূমাচ্ছন্ন য়ুরোপে কামান গর্জনের ঊর্ধ্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে রোলাঁর কণ্ঠ বজ্র-নিনাদে সেই হত্যা-লালসার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। বিশ্বের সমর-নেতাদের সেই ক্রূর হত্যা-প্রতিযোগিতার দিকে রোলাঁ জগতের শিল্পীদের, মস্তিষ্কজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সেই আত্মঘাতী রাজনৈতিক-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে, অন্ধ জাতি-প্রেমের উন্মাদনার বিরুদ্ধে, বিশ্ব-মানবের চেতনাকে জাগাইয়া তুলিলেন। তখন

য়ুরোপের দৃষ্টি সেই অবজ্ঞাত-গ্রন্থের উপর গিয়া পড়িল। 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ'-এর যে-সার্থকতার বিষয় য়ুরোপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, মহাযুদ্ধ আসিয়া রক্তাক্ত বাস্তবতায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিল। মহাযুদ্ধের বিভীষিকার বাস্তবতায় 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ'-এর মর্মবাণী য়ুরোপের চেতনায় আপনা হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু সমর-উন্মাদ জার্মানী ও ফ্রান্স উভয়েই 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ'-এর গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের পুস্তক-বিক্রেতারা তাঁহাদের দোকান হইতে এই গ্রন্থকে দূর করিয়া দিলেন কিন্তু ক্ষতবিক্ষত আর্ত বিশ্ব এই গ্রন্থকে মাথায় তুলিয়া লইল। বিশ্বের মানব-দ্বেষী রাজনৈতিকদের কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিল, 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ'-এর অপরাজেয় আত্মার অমর আশ্বাস-বাণী, মানবতার মুক্তি-মন্ত্র।

জীবনের প্রথম যাত্রা-পথে যখন এই গ্রন্থের সহিত প্রথম পরিচিত হই, তখন আমরা কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের প্রৌঢ় সাহিত্যিকদের অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনাকে মাথায় লইয়া তখন 'কল্লোলে' সমবেত হইয়াছিলাম। সেদিন যৌবনের প্রাণ-উন্মাদনায় আমরা বিশ্বের জীবিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সহিত যোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পত্রালাপ করি। আমাদের তরুণ চিত্তের সেই দুঃসাহসিকতায় সেদিন আমরা রোলাঁকে আমাদের অন্তরের প্রীতির অর্ঘ নিবেদন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি আনন্দে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, আমাদের সাহিত্যিক সাধনায় নিয়মিত উৎসাহ দিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই আমাদের বাসনা ছিল, এই গ্রন্থকে বাংলাভাষায় আমরা অনূদিত করিব। এবং তখন ডাঃ কালিদাস নাগ এবং তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত গোকুল-চন্দ্র নাগ 'কল্লোল'-পত্রিকায় এই অনুবাদ কার্য আরম্ভও করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক সংখ্যার পর নানাকারণে এই অনুবাদ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর, একটা সম্পূর্ণ যুগ চলিয়া গিয়াছে। সেদিনকার অসমাপ্ত সাধনার কাজ বিখ্যাত অনুবাদ-সাহিত্য প্রকাশক র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাবের শ্রীমান বিমল মিত্রের চেষ্টায় পুনরায় সুরু হইল। এই কার্যে রোলাঁর সাধন-সঙ্গী মাদাম মেরী রমাঁ রোলাঁর সম্মতি ও উৎসাহ পাইয়া ধন্য বোধ করিতেছি।

মূল গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড এখানে অনূদিত হইল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য খণ্ড-গুলি নির্দিষ্ট সময়ে ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশিত হইবে।

এই দুরূহ অনুবাদ কার্যে কতখানি সফল হইয়াছি, তাহার বিচার পাঠকবর্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে সাহিত্যিক জীবনে যাঁহাকে অন্যতম গুরু পথনির্দেশক বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি, তাঁহার মর্মবাণীকে একান্ত শ্রদ্ধা সহকারেই আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাষাগত অনাত্মীয়তা এবং নিজের অক্ষমতার দরুণ, আমি জানি, রোলাঁর অন্তরের সেই সুগভীর অনুভূতিকে যথাযথ হয়ত রূপান্তরিত করিতে পারি নাই কিন্তু কে পারে যথাযথভাবে তাহাকে রূপান্তরিত করিতে? কে পারে সমুদ্রের গর্জনকে রূপান্তরিত করিতে? আকাশ ছাড়া কে পারে আকাশের বিস্তৃতিকে ধরিতে?

কলিকাতা

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[এক]

গৃহান্তরাল হইতে কানে আসিয়া লাগে নদীর জলমর্মর। সারাদিন ধরিয়া রুদ্ধ বাতায়নে বৃষ্টি ধারা আঘাত করিয়া চলে। বাতায়নের ভগ্ন কোণ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়ে। বাহিরে দিবসের পীত আলোক ম্লান হইয়া আসে। ভিতরের ঘরে গাঢ়তর হইয়া ওঠে ম্লান নিস্তব্ধতা।

সদ্যজাত শিশু দোলনায় নড়িয়া ওঠে। ঘরে প্রবেশ করিবার আগে, বৃদ্ধ জুতা জোড়া বাহিরে খুলিয়া রাখে, তবুও তাহার পায়ের শব্দে ঘরের অন্ধকার যেন সচকিত হইয়া ওঠে। শিশু অস্ফুটকণ্ঠে অনুযোগ জানায়। শয্যা হইতে দেহ-ভার উত্তোলন করিয়া জননী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। আলো জ্বালিবার জন্য বৃদ্ধ পিতামহ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ান, শিশু যেন জগতে প্রথম চোখ মেলিয়া চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকার দেখিয়া ভয় না পায়। প্রদীপের শিখায় বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের রক্তাক্ত বিষণ্ণ আনন স্পষ্ট হইয়া ওঠে, অযত্নবিন্যস্ত এক গাল শাদা দাড়ির মধ্যে প্রখর-দৃষ্টি চোখ দুইটি জ্বলিতে থাকে। ধীরে দোলনার দিকে তিনি অগ্রসর হন। সারা গায়ে ভিজা-গন্ধ। লুইসা ইঙ্গিতে বারণ করে, শিশুর একান্ত নিকটে না যাইতে।

রক্তহীন শুভ্র, লুইসা দোলার পাশেই শুইয়া ছিল। সুগঠিত অঙ্গ-রেখা, শান্ত-স্নিগ্ধ শূন্যমুখে মাঝে মাঝে লাল চাকা-চাকা দাগ, ফুল্ল ওষ্ঠদ্বয় রক্তহীন বিবর্ণ, ম্লান ভীরু হাসিতে ঈষৎ ভিন্ন, দুই চোখ দিয়া যেন শিশুকে গ্রাস করিয়া আছে, নীলাভ দুই চোখ, উদাস। চোখের মণি দুইটি ছোট কিন্তু তাহাতে কে যেন অনন্ত মাধুরী মাখাইয়া রাখিয়াছে।

জাগিয়া উঠিয়াই শিশু কাঁদে, প্রদীপের আলোয় তাহার চোখে আঘাত লাগে। চারিদিকে তাহার একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! চারিদিক অন্ধকার...সহসা তাহার মধ্যে দীপের চকিত দীপ্তি...সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। সবেমাত্র সৃষ্টির গহনলোকের নিশ্ছিদ্র তমসা হইতে

সে এই নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে, এখনও তাহার মনে জড়াইয়া রহিয়াছে অপর-এক পৃথিবীর স্মৃতি। জাগিয়া উঠিয়া তাহার চারিদিকে দেখিতেছে শব্দময়ী রাত্রির ঘন-অন্ধকারের অবরোধ, তাহার মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব ছায়ামূর্তি বিরাট মুখ লইয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সেই বিরাট মুখের শাণিত দৃষ্টি তাহার গঠিত অনুভূতির রাজ্য এলোমেলো করিয়া দিয়া যায়...সে কিছুই ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ...কাঁদিয়া নিজেকে রিক্ত করিবার শক্তিও তাহার এখন আসে নাই। ভয়ে নিঃস্পন্দ শুইয়া থাকে। চোখ, মুখ আপনা হইতেই বিস্ফারিত হইয়া যায়। গলায় অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ ওঠে। বিরাট মাথা, দেখিলে মনে হয় যেন ফুলিয়া আছে...মুখে উদ্ভট সব রেখা—বেদনার নীরব রেখা। হাতের আর মুখের চামড়ার রঙ কোথাও তামাটে, কোথাও ঘন লাল, মাঝে মাঝে হলুদের ছোপ...

'হে ভগবান্! এ যে দেখছি রীতিমত কুৎসিত!' বৃদ্ধের উক্তির মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রদীপ নামাইয়া বৃদ্ধ টেবিলের উপর রাখেন।

তিরস্কৃত শিশুর মত লুইসার ঠোঁট ফুলিয়া ওঠে। জাঁ-মিচেল আড়চোখে লক্ষ্য করেন। হাসিয়া ওঠেন।

'তোমার কি ইচ্ছে যে আমি ওকে সুন্দর বলি? বল্লেও কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এতে তো তোমার কোন হাত নেই, ওরা সবাই ঐরকম কুৎসিত হয়েই জন্মায়।'

প্রদীপের আলো আর বৃদ্ধের খর-দৃষ্টিতে এতক্ষণ যে-মুহ্যমান নিশ্চলতার মধ্যে নব-জাতক আবদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমশ তাহা হইতে যেন সে মুক্তিলাভ করে। মুক্তিলাভ করিয়াই কাঁদিতে সুরু করে। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে সে যেন আশ্বাস পায়, তাই সাহস করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া ওঠে। কান্না তীব্রতর হইতে থাকে। তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া লুইসা বৃদ্ধকে মিনতি করে: 'ওকে আমার কাছে সরিয়ে দিন!'

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ শুধু মন্তব্যই করেন। বলেন: 'ছেলে কাঁদলো বলেই তাকে আদর করতে হবে, সেটা কিছু কাজের কথা নয়। ওকে কাঁদতে দাও।'

কিন্তু মন্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোলনা শুদ্ধ শিশুকে জননীর নিকট আগাইয়া দেন। তবে তেমনি ভাবেই অনুযোগ করেন: 'এ রকম কুৎসিত ছেলে আর দুটি দেখি নি!'

লুইসা চঞ্চল হস্তে শিশুকে বুকে টানিয়া লয়। বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। লাজ-মধুর পরিতৃপ্তির ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া ওঠে।

'ওরে আমার বাছারে, কি ভীষণ বিশ্রী রে!'

অকুণ্ঠ ভাবে লুইসা তাহাকে আদর করে।

জাঁ-মিচেল সরিয়া আগুন-খানার নিকট গিয়া বসেন। যেন লুইসার প্রতিবাদ স্বরূপ শুক্‌না কাঠ দিয়া নীরবে আগুনকে খোঁচাইয়া তোলেন। আপাতগম্ভীর বিষণ্ণ মুখ...কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহার অন্তরালে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ধরা পড়িয়া যায়!

'লক্ষ্মী মেয়ে!' বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন: 'এ নিয়ে দুঃখু করো না। বদলাবার যথেষ্ট সময় আছে। আর যদি নাই বদলায়, তাতেই বা কি? একটা জিনিস শুধু ওর কাছ থেকে চাই, সুশ্রী হোক্ আর কুশ্রী হোক্ ও যেন খাঁটী মানুষ হতে পারে!'

জননীর দেহের স্নিগ্ধ উত্তাপের সান্নিধ্যে শিশু আশ্বস্ত হয়। কান্নার বদলে কানে আসে স্তন্য-পানের শব্দ। গলার ভিতর হইতে জাগিয়া ওঠে বাণীহীন তৃপ্তির একটা অস্পষ্ট আওয়াজ। চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া জাঁ-মিচেল দৃঢ়কণ্ঠে পুনরুক্তি করেন:

'খাঁটী মানুষের চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই!'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভাবিয়া লন, কথাটা আরো বিস্তার করিয়া বলা উচিত কি না। কিন্তু বলিবার মতন নূতন আর কিছুই পান না। তাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন: 'তোমার স্বামীটি যে এখানে নেই, তার মানে?'

কুণ্ঠিত কণ্ঠে লুইসা জবাব দেয়:

'বোধহয় তিনি এখনও থিয়েটারে...শুনেছিলাম রিহার্স্যাল আছে!'

'মিথ্যে কথা...থিয়েটার বন্ধ...এইমাত্র তার পাশ দিয়ে এলাম। তার হাজার মিথ্যের আর একটা...'

'না, না। সব সময়ই তাঁকে দোষ দেবেন না। হয়ত আমার বোঝবার ভুল হয়েছিল। হয়ত কোথাও কোন ছাত্রের ওখানে আটকে পড়েছেন...'

বৃদ্ধ সে-জবাবদিহিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। একটু থামিয়া নীচু গলায় ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করেন:

'আবার কি...সুরু করেছে না কি?'

লুইসা তাড়াতাড়ি জবাব দেয় : 'না, বাবা, না তো!'

বৃদ্ধ সোজা লুইসার চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চান। লুইসা চোখ ঘুরাইয়া লয়।

'আমি জানি, তুমি যা বল্লে তা সত্যি নয়। তুমি মিথ্যে বলছো...'

নীরবে লুইসার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। বৃদ্ধের বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘশ্বাস ওঠে, 'হা ভগবান!' একটা জ্বলন্ত কাঠ লাথি দিয়া ঠিক করিতে গিয়া পায়ের সংস্পর্শে আগুন-উস্কানী লোহাটা সশব্দে পড়িয়া যায়। জননী ও শিশু দুইজনেই সহসা কাঁপিয়া ওঠে।

লুইসা মিনতি জানায়: 'দোহাই বাবা, আপনার পায়ে পড়ি...খোকা এক্ষুণি আবার কেঁদে উঠবে!'

কাঁদিবে, না যেমন আহার করিতেছিল, তেমনি আহার করিয়া চলিবে, শিশু দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাহা ভাবিয়া লয়। কিন্তু কোনটাই তৎক্ষণাৎ করা সম্ভব নয় দেখিয়া, সে যেমন আহার করিতেছিল, তেমনই করিয়া চলিল।

জাঁ-মিচেল মনের জ্বালাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, নীচু গলায় বলিয়া উঠিলেন:

'ভগবানের কাছে কি যে অপরাধ করেছিলাম যার জন্যে এমন মাতাল ছেলে তিনি আমাকে দিলেন? আমি যে সারা জীবন এইভাবে চালিয়ে এলাম, তাতে আমার কি লাভ হলো? জীবনের যা কিছু সুখ-সাধ তা থেকে নিজেকে যে বঞ্চিত করে এলাম, কেন? কিসের জন্যে? কিন্তু তুমি...তুমি কি এটা বন্ধ করতে পার না? হায় ভগবান! সেই তো ছিল তোমার প্রথম কর্তব্য...কেন তাকে বাড়ীতে আটকে রাখতে পার না?'

লুইসার দুই চোখ দিয়া শুধু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

'আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না বাবা...এম্নি আমার কম অশান্তি নেই! যা কিছু করতে পারি, আমি তার সব করে দেখেছি। যদি জানতেন, একলা ঘরে কি রকম ভয়ে ভয়ে আমাকে থাকতে হয়...! অষ্টপ্রহর মনে হয়, বাইরের সিঁড়িতে এই বুঝি তাঁর পায়ের শব্দ হলো...মনে হয় এক্ষুণি দরজা খুলে ঢুকবেন...ভগবানকে মনে মনে ডাকি, হে ভগবান, না জানি কি অবস্থায় দেখবো...রাতদিন এই ভাবনায় আমার শরীর ভেঙেগ গেল...'

কান্না চাপা দিয়া রাখিতে আর পারে না। বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়া ওঠেন। চেয়ার ছাড়িয়া লুইসার শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হন। ক্রন্দন-

বেপথু স্কন্ধদেশের কাছে এলোমেলো বিছানাটা হাত দিয়া ঠিক করিয়া দিয়া ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে থাকেন!

'ভয় কি? কিসের ভয়? আমি তো রয়েছি এখন!'

পাছে শিশু ভয় পায়, সেইজন্য লুইসা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লয়। হাসিতে চেষ্টা করে। বলে:

'আমি অন্যায় করেছি, এসব কথা আপনাকে ব'লে...'

তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলেন:

'বাছারে, আমি জানি, উপহার দিলাম বলে গর্ব করার মতন কোন জিনিস তোমাকে দিই নি...তা আমি জানি...'

লুইসা বলে: 'না, না, এ সব আমারই দোষ। ওঁর উচিত হয়নি আমাকে বিয়ে করা...আমি জানি, উনি তার জন্যে কত কষ্ট পান!'

'কি, তুমি কি বলতে চাও, তোমাকে বিয়ে ক'রে সে মনে করে যে সে ভুল করেছে?'

'আপনিও তাই করেন। আপনি নিজেই তো রেগে গিয়েছিলেন, আপনার ছেলের পাশে আমাকে দেখে!'

'সে-সব কথা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই না। সত্যি বটে, বিরক্ত হয়েছিলাম। ওর মতন একজন তরুণ যুবা, আমি জানি তুমি কিছু মনে করবে না...যাকে আমি নিজের হাতে মানুষ ক'রে গড়ে তুলেছি, নাম করা একজন সংগীত-শিল্পী, একজন সত্যিকারের আর্টিষ্ট, তার উচিত ছিল তোমার চেয়ে ওপর থাকের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। তোমার নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না, তা ছাড়া তুমি এসেছ সমাজের নীচের স্তর থেকে ...এমনকি তোমাদের উপজীবিকাও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রায় একশো বছর ধরে ক্রাফ্‌ট বংশের কোন ছেলে কখনও এমন কোন মেয়ে বিয়ে করে নি, যে মেয়ে সংগীত-শিল্পী নয়। কিন্তু তুমি জান, তার জন্যে আজ তোমার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই...যেদিন থেকে তোমাকে বুঝতে শিখেছি, সেদিন থেকে তোমাকে রীতিমত ভালই বাসি। তা ছাড়া, একবার যখন বেছে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তখন তো আর ফেরৎ দেওয়া যায় না। এখন শুধু একটি জিনিসই করবার আছে, সেটা হলো—যে-যার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে যাওয়া!'

দোলার নিকট হইতে বৃদ্ধ পুনরায় আগুনের কাছে চেয়ারে গিয়া বসেন। কয়েক মুহূর্ত আপনার মনে কি যেন চিন্তা করেন, তারপর

স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়া ওঠেন: 'জীবনের সর্বপ্রধান কাজ হলো, নিজের কর্তব্য পালন করে যাওয়া।'

প্রতিবাদের অপেক্ষায় বৃদ্ধ আগুনের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু জননী বা নব-জাতক কেহই যখন কোন প্রতিবাদের সুর তুলিল না, বৃদ্ধ বুঝিলেন, তিনি নির্বিবাদে বলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনিও নীরব রহিলেন।

আর কোন কথা তাহারা কেহই উত্থাপন করিল না। আগুনের ধারে বসিয়া বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল এবং শয্যায় শায়িত অবস্থায় লুইসা, দুইজনেই বিষণ্ণ নীরবতায় জাগিয়া যে যার নিজের স্বপ্ন দেখে। যাহা কিছুই বৃদ্ধ বলুন না কেন, পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার মন কোন সান্ত্বনাই পায় নাই। লুইসাও সেই কথা ভাবিত এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিত, যদিও নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিবার মতন কোন অপরাধই সে খুঁজিয়া পাইত না।

যেদিন সে জাঁ-মিচেলের পুত্র মেলশিয়র ক্রাফ্‌টকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে, সেদিন সে ছিল সামান্য একজন পরিচারিকা। সকলেই এই অদ্ভুত সংযোগে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, সে নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই। ক্রাফ্‌টদের সৌভাগ্য-সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না বটে, কিন্তু সেই রাইন্‌-নদীর ধারের ছোট্ট শহরটিতে বিশেষ গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের প্রভুত খ্যাতি ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন বৃদ্ধ এই শহরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং সেইদিন হইতেই তাঁহারা এই শহরেই থাকিয়া গিয়াছেন। পিতা এবং পুত্র দুজনকেই সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে কলোন হইতে মানহেইম্‌ পর্যন্ত বিরাট ভুখণ্ডের প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞই জানিত ও চিনিত। মেলশিয়র হফ্‌ থিয়েটারে ভায়লিন বাজাইত। জাঁ-মিচেল তাঁহার সময়ে গ্রান্দ-ডুকাল কন্‌সার্টের পরিচালক ছিলেন। মেলশিয়র সম্পর্কে বৃদ্ধের মনে বিরাট এক দুরাকাঙ্খা ছিল। তাই এই বিবাহে বৃদ্ধ একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হইয়া পড়েন। খ্যাতি ও যশের যে-সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজেকে তুলিতে পারেন নাই, আশা ছিল পুত্রকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু পুত্রের এই উন্মাদ খেয়াল বৃদ্ধের সমস্ত আশা চূর্ণ করিয়া দিল। প্রথম প্রথম রাগে চিৎকার করিয়াছেন,—মেলশিয়র আর লুইসা, দুইজনকেই সমানে অভিশাপ দিয়াছেন। কিন্তু যখন পুত্রবধূকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিবার সুযোগ পাইলেন, তখন তাহাকে ক্ষমা না

করিয়া পারিলেন না। বাহিরের রুক্ষ আবরণের আড়ালে বৃদ্ধের অন্তর স্বভাবতই ছিল সুকোমল। বাইরে বৃদ্ধ ভর্ৎসনা না করিয়া বড় একটা কথা বলিতেন না। কিন্তু সেই ভর্ৎসনার আড়ালে তাঁহার পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শই লুইসা অনুভব করিত।

কিসের তাড়নায় মেলশিয়র যে এই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আজও পর্যন্ত কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, মেলশিয়র নিজেও পারে নাই। লুইসার রূপ যে নয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই ছিল না। বাহির হইতে মানুষকে ভুলাইবার মত কোন গুণই তাহার ছিল না। দেখিতে ছোট-খাট, ম্লান বিবর্ণ এবং ক্ষীণজীবী এই মেয়েটি ছিল মেলশিয়র এবং জাঁ-মিচেলের ঠিক বিপরীত। পিতা-পুত্র, দুই-জনেরই বিশাল বপু...বিরাট রক্তাভ মুখ...দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু...প্রাণ খুলিয়া পর্যাপ্ত পানাহার করিতে তাহারা ভালবাসে, হাসিতে, গল্পে, কলরবে আনন্দ পায়। তাহাদের বৃহৎ আয়তনের আড়ালে সে যেন চাপা পড়িয়া যাইত, সে যে আছে, তাহা দৃষ্টিতেই পড়িত না; যতটুকু পড়িত তাহাও যেন সে এড়াইয়া থাকিতে পারিলে বাঁচিত। যদি মেলশিয়রের অন্তরে কোন কোমলতা থাকিত, তাহা হইলে একথা অনু-মান করা হয়ত সম্ভব হইত যে, অন্য আর কিছু গুণ না থাকুক, লুইসার ভালমানুষীতেই সে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা দাম্ভিক লোক আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর ছিল। তাহার মতন একজন তরুণ যুবা, পরিপূর্ণ যার স্বাস্থ্য, মোটামুটিভাবে সুন্দরও যাকে বলা চলে, এবং সে-সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সচেতন, একান্ত অবিবেচক হইলেও রীতিমত প্রতিভাশালী, ইচ্ছা করিলেই যে বিপুল যৌতুকসহ যে-কোন সুপাত্রীর পাণিপীড়ন করিতে পারিত—হয়ত শহরে তার নিজের যে সব ছাত্রী আছে, তাহাদের যে-কোন একজনের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারিত, তাহা না করিয়া হঠাৎ যে এইভাবে ইতর শ্রেণীর অতি সাধারণ একটি মেয়ে, দরিদ্র, অশিক্ষিত, রূপহীনা—তাহার জীবনের গতিপথে যে কোন সাহায্যই করিতে পারিবে না, তাহার নিকটই সে আত্মসমর্পণ করিল, ইহা বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়।

জগতে এক ধরণের মানুষ আছে, লোকে তাহাদের নিকট যাহা প্রত্যাশা করে, ঠিক তাহার বিপরীতটাই তাহারা করিয়া বসে। এমন কি, তাহারা নিজেরা যা ভাবে, কার্যকালে নিজেরা তাহার বিপরীতই আচরণ করে। মেলশিয়র তাহাদেরই একজন। তাহারা যে সতর্ক থাকে না,

তা নয়, কথাতেই বলে, সতর্ক লোক, দুইজন লোকের সমান। তাহারা জোর গলায় জাহির করে, জগতে এমন কিছুই নাই যাহা তাহাদের বিমূঢ় করিয়া রাখিতে পারে, তাহাদের বিশ্বাস যে কোন দুর্যোগের মধ্যেই তাহারা অভ্রান্তভাবে তাহাদের জীবন-তরণী স্থির লক্ষ্যের দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা একটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসে, নিজেদের মনের খবর বাদ দিয়াই তাহারা ভাবে। তাহারা জানে না, যে তাহারা নিজেদেরই চেনে না। এবং সেই আত্ম-অপরিচয়ের বিস্মৃতির মুহূর্তে, এ ধরণের বিস্মৃতি তাহাদের জীবনে অনবরতই ঘটে, তাহারা শুধু ঢেউ-এর উপর নির্ভর করিয়াই তরণীর হাল ছাড়িয়া দেয়। এবং যখনই এইভাবে নৌকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া হয়, নৌকারও দুষ্ট-বুদ্ধি তখন জাগিয়া ওঠে, চালককে বানচাল করিতে পারিলেই তখন সে খুশি হয়। তাই নৌকা তখন পথ হইতে সরিয়া সোজা পাহাড়ে গিয়া ধাক্কা খায়। মেলশিয়রও তাই এত আয়োজন করিয়া অবশেষে বিবাহ করে একজন পাচিকাকে। যেদিন মেলশিয়র তাহার জীবনকে লুইসার সহিত এক বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেদিন সে মাতালও ছিল না, বিবশ বিভ্রান্ত অবস্থায়ও ছিল না অথচ অনুরাগের প্রবল তাড়নার আকস্মিকতাও তাহার পেছনে ছিল না,—তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হৃদয় আর মন ছাড়া, এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়াও, মনে হয়, আমাদের মধ্যে রহস্যময় এমন সব শক্তি সুপ্ত হইয়া থাকে, ঠিক যে-মুহূর্তে অন্য সব অনুভূতি ঘুমাইয়া পড়ে, তাহারা তখন জাগিয়া ওঠে। একদা সন্ধ্যাকালে যখন নদীর তীরে শর বনের ধারে লুইসাকে পাশে লইয়া সে বসিয়াছিল এবং নিজের অজ্ঞাতে তাহার দুইটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, হয়ত সেদিন লুইসার দুই ভীরু চোখের চাহনিতে সে সেই রহস্যময় শক্তিরই সন্ধান পাইয়াছিল।

বিবাহ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলশিয়র আতঙ্কিত হইয়া বুঝিল, কি ভুলই না সে করিয়াছে এবং এই সম্পর্কে তাহার মনোভাব বেচারা লুইসার কাছে গোপন রাখিবারও কোন চেষ্টা করিল না। কুণ্ঠিত হইয়া লুইসা ক্ষমা চায়। মেলশিয়র খুব যে খারাপ লোক ছিল, তাহা নয়, অবস্থা বুঝিয়া সে ক্ষমাই করিত। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাহার অনুশোচনা ফিরিয়া আসিত। বাড়ীর বাহিরে বন্ধু মহলে, কিম্বা তার ধনী ছাত্রীদের সংসর্গে যখন সে গিয়া পড়িত, তাহার অনুশোচনা তীব্রভাবে ফিরিয়া আসিত। ইদানীং তাহার ছাত্রীরা আর পূর্বের ন্যায়

তাহাকে সমীহ করিয়া চলে না। বিবাহের পূর্বে সংগীত-শিক্ষার সময় যখন তাহাদের হাত ভুল কড়িতে গিয়া পড়িত, সংশোধন করিয়া দিবার সময় মেলশিয়রের আঙ্গুলের সহিত তাহাদের আঙ্গুল যখন সহসা ঠেকিয়া যাইত, মেলশিয়র দেখিত সে-স্পর্শে তাহারা গোপনে কাঁপিয়া উঠিত। ইদানীং সে-স্পন্দন আর তাহাদের জাগে না। বিষণ্ণ মুখে মেলশিয়র বাড়ী ফিরিয়া আসে। লুইসা সে-মুখ দেখিয়াই অন্তর হইতে বুঝিতে পারে, এখনি অভ্যস্ত নিন্দার ঝড় উঠিবে। কোন কোন দিন সোজা বাড়ীতে ফিরিত না। কোন না কোন সরাইখানায় ঢুকিয়া পড়িত। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত সে সরাইখানায় সন্ধান করিয়া ফিরিত, অন্য কাহারও নিকট হইতে যদি সে-মর্যাদা আদায় করিতে পারে, যদি অন্য কোন নারী সাময়িক করুণায় তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়।

যেদিন তাহা জুটিত, সেদিন রাত্রিতে হাসিতে হুল্লোড়ে পাড়া মাতাইয়া মেলশিয়র বাড়ী ফিরিত। লুইসা ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সে জানিত এই উল্লাসের পেছনে আছে অন্যদিনের বিষণ্ণ মুখের নির্বাক গঞ্জনার চেয়ে ক্রুরতম আঘাতের সম্ভাবনা। তাহার স্বামীর যেটুকু মমতা অবশিষ্ট ছিল, সংসারের টাকা-পয়সার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও অদৃশ্য হইয়া যাইত, এবং তখন সে বদ্ধ উন্মাদের মত আচরণ করিত। লুইসা মনকে বুঝাইত, এই ব্যাপারের জন্য অংশত সে-ই দায়ী।

ক্রমশ মেলশিয়র ধাপের পর ধাপ নামিয়াই যাইতে লাগিল। যে-বয়সে তাহার উচিত ছিল, যেটুকু ক্ষমতা তাহার আছে, তাহাকে কঠোর অনুশীলনের দ্বারা, অবিশ্রান্ত নিষ্ঠার দ্বারা বিকশিত করিয়া তোলা, সে-বয়সে সে তাহার পরিবর্তে, যাহা হয় হ'ক বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। অন্যে আসিয়া তাহার স্থান দখল করিয়া লইল।

যে অজানা শক্তি তাহার জীবনকে সেই স্বর্ণ-কেশী পরিচারিকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। সে তাহার যতটুকু করিবার তাহা পালন করিয়াছে...ছোট্ট জাঁ-ক্রিস্তফকে সে এই পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছে...

রাত্রি গভীর হইয়া আসে। অতীত ও বর্তমানের বহু বেদনার কথা চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল আত্মসমাহিত অবস্থায় আগুনের ধারে গিয়া বসেন। লুইসার কণ্ঠস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

স্নেহভরে লুইসা বলিয়া ওঠে: 'বাবা, রাত যে অনেক হয়ে গেল... আপনি বাড়ী ফিরে যান...অনেক দূর তো যেতে হবে আপনাকে।'

বৃদ্ধ জবাব দেন: 'মেলশিয়রের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।'

'পায়ে পড়ি, বাবা...আমার কথা শুনুন...আপনি বাড়ী যান...'

'কেন?' ঘাড় তুলিয়া বৃদ্ধ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন। লুইসা কোন উত্তর দিতে পারে না।

বৃদ্ধ পুনরায় বলেন: 'ভয় করছে তোমার, না? তুমি চাওনা যে তার সঙ্গে আমি দেখা করি?'

'হাঁ...হাঁ বাবা! দেখা হলে আরো খারাপ হবে...আপনারা দুজনেই রেগে যাবেন...সেটা আমি মোটেই চাই না। পায়ে পড়ি আপনার, যান...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়ান। বলেন: 'বেশ...তাহলে... আমি যাচ্ছি...'

বিছানার কাছে আগাইয়া গিয়া অযত্ন-বর্ধিত দীর্ঘ শ্মশ্রু দিয়া লুইসার কপালে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দেন। আর কোন প্রয়োজন কিছু আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন। ধীরে বাতি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে চেয়ারে ধাক্কা খাইয়া কোন রকমে টাল সামলাইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসেন। কিন্তু বাহিরের সিঁড়িতে পা ফেলিতেই হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, যদি মেলশিয়র মাতাল হইয়াই আজ বাড়ী ফিরিয়া আসে...! বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়ান, মাতাল অবস্থায় একা ঘরে যে কোন অনর্থ সে করিতে পারে, আশঙ্কায় বৃদ্ধ আর চলিতে পারেন না।...

ঘরের ভিতর শয্যায় জননীর পার্শ্বে নব-জাত শিশু পুনরায় অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া নড়িয়া ওঠে। তাহার ক্ষণ-প্রবাসের সুগভীরতা হইতে যেন এক অজানা বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। জননীর অঙ্গ ঘেঁষিয়া সে স্থির হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে সারা দেহে আক্ষেপ জাগিয়া ওঠে, হাতের মুঠা শক্ত করিয়া ধরে, কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দেয়। ধীরে অনিবার্যভাবে বেদনা বাড়িয়াই উঠিতে থাকে। সে জানে না কি সে-বেদনা, কোথা হইতেই বা আসিতেছে। শুধু মনে হয় যেন তাহা সুবিপুল, নিরবচ্ছিন্ন...অসহায়ভাবে সে কাঁদিয়া ওঠে। কোমল কর-স্পর্শে জননী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার বেদনার ভার কমিয়া আসে। কিন্তু তবুও কান্না থামে না, তখনও মনে হয় সে-বেদনা যেন তাহার অতি নিকটেই রহিয়াছে, তাহার দেহের অভ্যন্তরে। পরিণত বয়সে মানুষ যখন বেদনা পায়, তখন সে-

বেদনার জ্বালা সে নিভাইতে পারে কথঞ্চিৎ, যদি সে জানিতে পারে কোথা হইতে সে-বেদনার উৎপত্তি! দেহের কোন্‌ অংশ হইতে তাহার উৎপত্তি, সে ভাবিয়া যদি তাহা স্থির করিতে পারে, তখন প্রয়োজন হইলে তাহাকে দূর করিবার আয়োজনও করিতে পারে, নতুবা তাহাকে ছিঁড়িয়া টানিয়া ফেলিয়াও দিতে পারে। তাহাকে সীমার প্রাচীরে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, কিম্বা তাহার সম্পর্ক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। শিশুর নাই সে-জ্ঞান-সম্বল। তাই বেদনার সহিত মানব-শিশুর প্রথম সংগ্রাম ঢের বিশী বেদনাময়, ঢের বেশী সত্য। তার নিজের সত্বার মতন, মনে হয়, তার বেদনাও যেন অনন্ত। মনে হয়, সে-বেদনা যেন তাহার বক্ষে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে; তাহার হৃদয়ে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত অস্থি-মাংসের সে যেন স্বামিনী। এবং ইহাই রূঢ় সত্য। যতক্ষণ না তাহার দেহ চুষিয়া শেষ করিয়া ফেলিতে পারে, ততক্ষণ আর সে-দেহ ছাড়িয়া সে যাইবে না।

শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জননী কানে কানে বলে: 'ভয় নেই ...ওরে...ওরে আমার মাণিক...'

কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাহার ক্রন্দন তেমনি উঠিতে থাকে। তাহার সম্মুখের সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপিয়া যেন বেদনার রাজ্য পড়িয়া আছে, এই অগঠিত মাংসপিণ্ড যেন তাহার পূর্বাভাস পাইয়া গিয়াছে। তাই কোন কিছুতেই সে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। রাত্রিতে সেণ্ট মার্টিনের গির্জার ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে, ধীরসুগম্ভীর রোলে। শৈবালে পদ-ধ্বনির মতন সিক্ত নৈশ বায়ুতে সেই শব্দের অনুরণন জাগিয়া ওঠে। মথিত ক্রন্দনের মাঝ-পথে সহসা শিশু নীরব হইয়া যায়। সেই অপরূপ ধ্বনি-সঙ্গীত, মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মত, তাহার অন্তরকে যেন স্নিগ্ধ-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দেয়। সহসা রাত্রি যেন আলোকময়ী হইয়া ওঠে, বাতাস মধুরতায় আর্দ্র হইয়া যায়, কোথায় তলাইয়া যায় তাহার দুঃখের ভার। ফুলের মতন হাসিয়া ওঠে অন্তর, মুক্তির শ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে সে আবার প্রবেশ করে তাহার স্বপ্নলোকে।

পর্যায়ক্রমে তিনটি ঘণ্টা মৃদু মধুর রোলে ঘোষণা করিয়া চলে, আগামী প্রভাতের উৎসব বার্তা। সে-সঙ্গীতের ধারায় লুইসার মনও স্বপ্নলোকে চলিয়া যায়, তার অতীতের বহু বেদনার স্মৃতি অন্তরে আপনা হইতে জাগিয়া ওঠে। আজ তাহার পার্শ্বে যে শিশু নীরবে শুইয়া আছে, অদূর ভবিষ্যৎ কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহার জন্য?

একদাক্রিমে বহু ঘণ্টা শয্যায় পড়িয়া আছে, ক্লান্ত, বেদনাদগ্ধ। হাত-পা, সারা অঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে।

চারিদিকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলে; তবুও সে সাহস করিয়া নড়িতে পারে না। পার্শ্বে শায়িত শিশুর দিকে বারে বারে চাহিয়া দেখে, রাত্রির অন্ধকার সত্ত্বেও যেন তাহার মুখ-রেখা স্পষ্ট দেখিতে পায়, সহসা মনে হয় সে-মুখে যেন অতি-বার্ধক্যের ছাপ। ক্রমশ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ক্লান্ত মস্তিষ্কের পথে রোগাতুর ছায়ামূর্তি সব ঘোরাফেরা করে। স্বপ্নের মধ্যে মনে হয়, যেন মেলশিয়র আসিয়া দরজা খুলিল, হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে। মাঝে মাঝে চারিদিকের নীরবতার মধ্যে গৃহপার্শ্ববর্তী নদীর জল-মর্মরের শব্দ তীব্রতর হইয়া ওঠে, যেন অন্ধকারে কোন বন্য শ্বাপদ গর্জন করিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টিধারাহত বাতায়ন যেন দুই একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ঘণ্টার ধ্বনি ম্লানতর হইয়া আসে, ক্রমশ একেবারে থামিয়া যায়। পার্শ্বে শিশুকে লইয়া লুইসা ঘুমাইয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে সারাক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকেন, সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া বৃষ্টির ধারা গড়াইয়া চলিয়াছে, দীর্ঘ শ্মশ্রু, নৈশ হিমে সিক্ত, সঙ্কুচিত হইয়া আসে। দুর্বিনীত পুত্র কখন বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহারই জন্য বৃদ্ধ বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আছেন; সারাক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনে শুধু এই দুশ্চিন্তাই পুঞ্জীভূত হইয়া চলিয়াছে, মদ্যপানজনিত উন্মত্ততায় মানুষ কি ভয়াবহ অনাচারই না করিতে পারে। যদিও সে-সব কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার মন চাহিতে-ছিল না, তবুও পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া তিনি যাইতেও পারিতেছিলেন না, কারণ এই অবস্থায় ফিরিয়া গেলে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা ফেলিতে পারিবেন না। অদূরে গির্জার নিশীথ ঘণ্টার ধ্বনিতে মন আরও বিষণ্ণ হইয়া যায়, জীবনের সব ব্যর্থ আশার স্মৃতি যেন সেই শব্দের সঙ্গে জাগিয়া উঠিতে থাকে। এই বৃষ্টি-সিক্ত রাত্রিতে এইভাবে তাঁহাকে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হই-তেছে, সে-কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ আর লজ্জায় তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে।

• • •

দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ গতি অতি ধীরে ওঠে নামে। সীমাহীন মহা-সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতন দিন আসে, রাত্রি যায়, অনিবার্য ছন্দের

শৃঙ্খলে বাঁধা। সপ্তাহ শেষ হয়, মাস চলিয়া যায়, আবার নূতন সপ্তাহ আসে। প্রতি দিবসের মতনই আসে শিশুর নিকট আর এক নূতন দিন।

আর একটি নূতন দিন! মনে হয়, সুবিপুল তার বিস্তার, মুখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। সমান মাত্রায় আলো আর অন্ধকারের তাল ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে, সেই তালে তাল দিয়া চলিয়াছে আলোক-ধর্মী শিশুর প্রাণ-স্পন্দন; তাহারই আলোক-দোলায় দুলিয়া সে স্বপ্ন দেখে, বেদনায় অথবা আনন্দে মোড়া তার যাবতীয় ঐকান্তিক প্রয়োজনের স্বপ্ন। আলো-আঁধারের ছন্দে এমন নিখুঁতভাবে গাঁথা তার জীবনের স্পন্দন, যেন মনে হয়, সেই আলো-আঁধারের ছন্দ থেকেই তাহার উৎপত্তি।

জীবন দুলিয়া চলে, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত, অতি গুরুভার ছন্দে। তাহার মন্দমন্থর গতিতে শিশু যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া আর যাহা কিছু, তাহা শুধু স্বপ্ন, টুকরো টুকরো স্বপ্ন, অবয়বহীন, ভাসমান। লক্ষ্যহীনভাবে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে চূর্ণ অণুর ধূলি-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণীর পর ঘূর্ণী সৃষ্টি করিয়া, তাহারই সঙ্গে চলিয়াছে হাসি-অশ্রু, বিভীষিকার পর্যায়। চারিদিকে তার তীব্র শব্দ, চলমান সব ছায়ামূর্তি, দুঃখ-বেদনা, ভয়, হাসি,...তার নিকট মনে হয় যেন সব স্বপ্ন...তার দিন আর রাত্রি, সবই স্বপ্ন দিয়া গঠিত...

তবু সেই বিশৃঙ্খল ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে, স্নেহ-ভরা চোখের চাহনি...বন্ধুর স্পর্শ। জননীর দেহের সংস্পর্শ হইতে, মাতৃ-স্তনের দুগ্ধ-ধারা হইতে, দেহের মধ্যে জাগিয়া ওঠে আনন্দের বন্যা। যে অজানা শক্তি তাহার মধ্যে সুপ্ত হইয়া আছে, ক্রমশ ক্রমশ যেন তাহা সুবিপুল হইয়া ওঠে, তাহার ছোট্ট শিশু-দেহের বন্ধ-কারায় যেন গর্জন করিয়া উঠিতে থাকে দুরন্ত সাগর তরঙ্গ। যাহার দেখিবার দৃষ্টি আছে, সে যদি দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই শিশু-দেহের অন্তরালে দেখিতে পাইবে অন্ধকারে অর্ধনিমজ্জমান বিচিত্র সব পৃথিবী, কোথাও নীহারিকা হইতে মূর্তি ধরিয়া জাগিতেছে নূতন ধরণী...শিশুর দেহ...নবীন বিশ্বের সূতিকাগার...সীমাহীন শিশুর সত্বা...যাহা কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে সবই যেন আছে তাহার ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডে।...

মাসের পর মাস চলিয়া যায়।...জীবনের ধারা-স্রোতের মধ্য হইতে একটি দুটি করিয়া মাথা তুলিয়া জাগিয়া ওঠে স্মৃতির দ্বীপ। কি

আছে সে-সব দ্বীপের ভিতর, কতটুকুই বা তার আয়তন, তখনও তার কোন মানচিত্র গড়িয়া ওঠে নাই, শুধু জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে নামহীন সব পর্বতশৃঙ্গ। তাহাদের বেষ্টন করিয়া উষার আলো-আঁধারীতে পড়িয়া আছে নিস্তরঙ্গ চেতনার বিরাট বিস্তার। একদা ধীরে প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ আসিয়া পড়ে দ্বীপের প্রথম পর্বত-শৃঙ্গে...

ক্রমশ চেতনার সুগভীর গহ্বর হইতে স্পষ্ট মূর্তি জাগিয়া উঠিতে থাকে, একটি দুটি করিয়া ঘটনার সুস্পষ্ট রেখা। তেমনি আসে সীমাহীন দিন, একটির পর একটি, সেই একই ছন্দে বাঁধা কিন্তু প্রত্যেক দিনের শৃঙ্খলের আড়ালে একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে নূতন সব মূর্তি। কাহারও মুখে হাসি, কাহারও চোখে অশ্রু। ক্রমশ প্রতিদিবসের শৃঙ্খলও যেন আলগা হইয়া আসে, দিবসকে মনে করিতে মনে পড়ে সপ্তাহ, মাস...

সেই কলস্বনা শব্দের নদী...সেই ঘণ্টার ধ্বনি...যত দূরে সে পিছনে চাহিয়া দেখে, কালের সুগভীর অন্ধকার স্তরে, চেতনার প্রতি মোড়ে মনে হয় যেন সেই পরিচিত ধ্বনিই সে শুনিয়া আসিতেছে। রাত্রি...তন্দ্রা আর নিদ্রার মাঝামাঝি। বাহিরে কোথা হইতে এক টুকরা মৃদু আলো আসিয়া জানলাটাকে শুভ্র করিয়া দেয়...ঘরের বাহিরে কলস্বরা নদী বহিয়া চলে...নিশীথে নীরবতার মধ্যে সে অবিরাম কল-ধ্বনিকে যেন বিশ্বচরাচর স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কখনও বা সে-ধ্বনি কোমলকর-স্পর্শে নিদ্রাকে গাঢ়তর করিয়া তোলে...কখনও বা নিদ্রার সঙ্গে এক হইয়া মিশাইয়া যায়। আবার কখনও বা ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া ওঠে, হিংস্র জন্তুর মত আঘাত করিবার জন্য চিৎকার করে। চিৎকার থামিয়া যায়। পরিবর্তে ভাসিয়া আসে অনন্ত মাধুরীভরা মৃদু কলস্বর, ছোট ছোট ঘণ্টার স্পষ্ট মধুর রূপালী আওয়াজ—আনন্দ-মুখর শিশুদের হাসির মত, কানে-কানে-গাওয়া গানের সুরের মত, নাচের ছন্দের মত, ঘুম-না-জানা কোন্-সে-অনাদি মায়ের ঘুমপাড়ানি-সুর। তার সুরের দোলায় শিশুকে দোলায়, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক যেমন দুলাইয়াছে তাহার পূর্বে যাহারা আসিয়াছিল। সে-সুর তাহার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহার সকল স্বপ্নে জড়াইয়া যায়...এক অপরূপ তরল সঙ্গীতের আবরণে যেন তাহাকে আবৃত করিয়া রাখে। হয়ত

যেদিন রাইনের জল-বিধৌত তীরে ছোট্ট সমাধি-ঘরে সে আবার ফিরিয়া যাইবে, তখনও এই কল-মর্মর তাহার অন্ত-চেতনার ধারে ধারে এমনি বাজিতে থাকিবে...

আবার সেই ঘণ্টা...রাত্রি-প্রভাত! নব-উষা!

যেন একটির পর একটি তারা পরস্পর পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়া ওঠে, বিধুর, বিষণ্ণ, সুপরিচিত, শান্ত। তাহাদের সেই প্রভাতী শব্দের আহ্বানে শিশুর অন্তরে জাগিয়া ওঠে স্বপ্নের মিছিল। অতীতের সব স্বপ্ন, তাহার অজ্ঞাতে যাহারা তাহার বহু পূর্বে চলিয়া গিয়াছে, অথচ যাহাদের মধ্যে তাহার সত্বা লুকাইয়া ছিল এবং তাহার মধ্যে যাহাদের সত্বা আজ আবার নব-জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজ স্বপ্নরূপে ফিরিয়া আসে তাহাদের সকলেরই আশা-আকাঙ্খা-হতাশা। সে-শব্দ-সঙ্গীতে ঝরিয়া পড়ে যুগ-যুগান্তের স্মৃতি। কত না বিদায়-অশ্রু, কত না উৎসবের বাঁশী! মনে হয় যে-ঘরে সে শুইয়া আছে, সেই ঘরের বুকের ভিতর হইতেই যেন সে-শব্দ উঠিতেছে...তাহার চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে যেন সে-শব্দের মধুর তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া দেখা যায় একফালি নীল আকাশ ; মশারীর ঝালর ভেদ করিয়া শয্যায় আসিয়া পড়ে এক টুকরা সূর্যের আলো। সেই তাহার পরিচিত পরিমিত পৃথিবী, প্রতিদিন প্রভাতে শয্যায় ঘুম ভাঙিয়া নয়ন মেলিলেই যাহা তাহার চোখে পড়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ সেই সব জিনিসকে মনে মনে সে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া চিনিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, কেন না একদা সেই পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর পরিচালক তাহাকেই তো হইতে হইবে।

এমনি প্রতি প্রভাতে আলোকিত হইয়া ওঠে তাহার রাজ্য। সামনেই দেখা যায় বড় টেবিলটা, যেখানে বাড়ীর লোকেরা বসিয়া আহার করে, তাহার কাছেই খাবার রাখিবার দেরাজ, যাহার আড়ালে লুকাইয়া সে খেলা করে। বিছানার নীচে টাইল-দেওয়া মেঝে যাহার উপর হামাগুড়ি দিয়া সে চলে, সামনেই চিত্র-বিচিত্র সব কাগজ দিয়া মোড়া দেওয়াল, দেয়ালে বিচিত্রভঙ্গী নানা মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহারা কত না গল্প তাহাকে বলে ; আর ঐ ঘড়িটা রাত্রিদিন টক্‌টক্ করিয়া, কখনও বা তোতলার মতন বিচিত্র আওয়াজ করিয়া কত যে কথা বলিয়া চলে, একমাত্র সে-ই তাহা বুঝিতে পারে। আশ্চর্য, তাহার সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে কত না বিচিত্র জিনিস! তাদের প্রত্যেককে অবশ্য সে জানে না, চেনে

না। প্রতিদিন তাই তাহার নিজস্ব বিশ্বে সে আবিষ্কারে বাহির হয়। এ ঘরে যাহা কিছু আছে, সবই তাহার। এবং কিছুই মূল্যহীন নয়। মানুষ হোক আর মাছিই হোক তাহার কাছে প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তাহার কাছে সবই জীবন্ত...উনুনে যে আগুন জ্বলে, সামনের টেবিলটা, সূর্যের আলোয় যে-সব ধূলিকণা নাচিয়া বেড়ায়, ঘরের মধ্যে যে বিড়ালটা আসা-যাওয়া করে, সবই তাহার নিকট সমান জীবন্ত। এই ঘর, ইহাই হইল তাহার দেশ, তাহার বিশ্ব-জগৎ। প্রতিটি দিন যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা জীবন। এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে সে কি করিয়া নিজেকে ধরিয়া রাখিবে? কি বিপুল এই বিশ্ব! যেন তাহার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হারাইয়া যাইতে হয়। তাহাকে ঘিরিয়া একি নিত্য কোলাহল, এত মুখ, এত যাওয়া-আসা, এত নড়া-চড়া, এত আওয়াজ।...মাঝে মাঝে সে ক্লান্ত হইয়া যায়; চোখ বুঁজিয়া থাকে, ঘুমাইয়া পড়ে। টেবিলের তলায়, দেরাজের পাশে, জননীর কোলে, কখন যে কোথায় তাহাকে ঘুমে পাইয়া বসে, সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। হঠাৎ কোথা হইতে আসে ঘুম, গভীর, সুমধুর ঘুম, সে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।...ভালই লাগে...তাহার পৃথিবীতে সবই ভাল লাগে...

জীবনের এই প্রথম দিনগুলির স্মৃতি অন্তরে নিত্য আন্দোলিত হইতে থাকে, শস্যভরা মাঠের মতন, বায়ু-বিতাড়িত অরণ্যের মতন... ভাসমান মেঘের মতন ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলিয়া তাহারা চলিয়া যায়।...

ছায়ারা মিলাইয়া যায়...সূর্যের আলোকে আবার অরণ্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। ক্রমশ দিবসের আলো-ছায়ার গোলক-ধাঁধার মধ্যে জাঁ-ক্রিস্তফ পথ করিয়া চলিতে শিখে।

সবে প্রভাত হইয়াছে। পিতা-মাতা দুজনেই তখনো নিদ্রিত। পিঠে ভর দিয়া নিজের ছোট্ট বিছানাতে সে শুইয়া থাকে। দেখে, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে সূর্যের আলো আসিয়া নাচিতেছে। কি অনন্ত কৌতূহলই না আছে সেই আলোর নাচনের মধ্যে! হঠাৎ সে প্রাণ খুলিয়া জোরে হাসিয়া ওঠে, শিশুর মুখে যে হাসি শুনিয়া অন্তর আপনা হইতে আনন্দে দুলিয়া ওঠে। সে-হাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া জননী কৃত্রিম ক্রোধে জিজ্ঞাসা করে: 'কিসের হাসি, দুষ্টু কোথাকার?' উত্তরে জাঁ-ক্রিস্তফ আরো হাসিয়া ওঠে, শ্রোতা পাইয়া তাহার হাসির বেগ বাড়িতেই থাকে। হঠাৎ দেখে, জননীর মুখ গম্ভীর, ঠোঁটে আঙুল দিয়া শব্দ করিতে বারণ করিতেছে, পাছে পিতার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু

জননীর ক্লান্ত চোখের আড়াল হইতে যে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া ওঠে, শিশু তাহা লক্ষ্য করিতে ভোলে না। যেন চুপি চুপি কানে কানে তাহারা দুই-জনে কথা বলে। বিরক্ত হইয়া পিতা চোখ বুজিয়াই তর্জন করিয়া ওঠে। ভয়ে তাহারা আর কোন কথা বলিতে পারে না। অভিমান-আহত ছোট্ট মেয়েটির মতন জননী পিছন ফিরিয়া শুইয়া থাকে, ঘুমাইবার ভান করে। জাঁ-ক্রিস্তফ লেপের ভিতর নিজেকে লুকাইয়া ফেলে...ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে চেষ্টা করে...সমস্ত ঘর আবার নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া যায়...

লেপ ঢাকা দিয়া কতক্ষণ থাকা যায়? সন্তর্পণে লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ শুধু চাহিয়া থাকে। কান খাড়া করিয়া শোনে, ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া বাতাস আসার শব্দ হইতেছে, পাইপের ভিতর দিয়া জল-পড়ার শব্দ উঠিতেছে, বাতাসে ভাসিয়া আসে ঘণ্টার ধ্বনি। যখন পূর্বদিক হইতে হাওয়া বয়, তখন নদীর অপর পারের গ্রামের গির্জা হইতে এপারের ঘণ্টার প্রত্যুত্তর শোনা যায়। বাইরে দেয়াল-ছাওয়া আইভি-লতার বনে চড়ুই পাখিরা ইতিমধ্যে সকলে একত্র হইয়াছে ; তাহাদের মিলিত আলাপের ভিতর হইতে তিন চারিটি কণ্ঠ স্পষ্ট স্বতন্ত্র হইয়া ওঠে...শিশুদের হট্টগোলের মধ্যে যেমন তিন চারটি গলা স্পষ্টভাবে সকলকে ছাপাইয়া ওঠে। চিমনির মাথায় একটি পায়রা কোথা হইতে বক্-বকম করিতে থাকে। এই সব বিভিন্ন শব্দের ঘুম-ভাঙানী ছন্দ শিশু তন্ময় হইয়া শোনে। শুনিতে শুনিতে ধীরে অতি মৃদু গুঞ্জন করিয়া ওঠে, তারপর আরো একটু জোরগলায় সে প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করে এবং ক্রমশ একটু একটু করিয়া গলা বাড়াইয়াই চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাহত-নিদ্রা পিতা বিরক্ত হইয়া আবার গর্জন করিয়া ওঠে: 'হতচ্ছাড়া গাধা, আবার চেঁচাচ্ছিস্...থাম্...নইলে কান টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো!' জাঁ-ক্রিস্তফ আবার বিছানার মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া ফেলে, হাসিবে কি কাঁদিবে, ঠিক করিতে পারে না। ভয় লাগে, ক্ষুব্ধও হয়। গর্দভের সঙ্গে তাহাকে তুলনা করা হইয়াছে, সেকথা মনে মনে ভাবিতে তাহার ভীষণ হাসি পায়। বিছানার ভিতরে লুকাইয়া, গর্দভের অনুকরণে সহসা চিৎকার করিয়া ওঠে। এবার পিতা উঠিয়া আসিয়া বেত লাগায়। যত অশ্রু তাহার সঞ্চয় ছিল, বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়ে। সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে? শুধু হাসিতে চাহিয়াছিল, হাসিয়া শয্যা হইতে উঠিত! এখন আদেশ হইল, একবিন্দু

নড়িতে পারিবে না। চিরকাল বিছানায় শুইয়া কেহ ঘুমাইতে পারে? কখন জাগিবে তবে?

একদিন সে আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হঠাৎ দেখিল, ঘরের বাহিরে একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করিতেছে, আর সেই একটা কি অদ্ভুত আওয়াজ রাস্তা হইতে আসিতেছে। বিছানা হইতে নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িয়া, টাইলের উপর দিয়া কোন রকমে টলিতে টলিতে হামাগুড়ি দিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, ব্যাপারটা কি! কিন্তু দরজা বন্ধ। খুলিবার জন্য একটা চেয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া সব শুদ্ধ পড়িয়া গেল। আঘাতের বেদনায় চিৎকার করিয়া উঠিল। মেলশিয়র রাগিয়া বেত লইয়া ছুটিয়া আসিল, আবার পিঠে বেতের দাগ পড়িল। কেন বারে বারে তাহাকে বেতের প্রহার ভোগ করিতে হয়?...

বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে গির্জায় আসিয়াছে। ভাল লাগিতেছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। তাহাকে নড়িতে চড়িতে বারণ করা হইয়াছে। সব লোক একসঙ্গে মিলিয়া কি যেন বলিতেছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সবাই যেন বিষণ্ণ, গম্ভীর। সকলেই কেমন যেন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয়ে ভয়ে তাহাদের দিকে সে চাহিয়া দেখে। তাহাদের প্রতিবেশিনী লীনা বুড়ী, ঠিক তাহার পাশেই বসিয়া ছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল যেন বুড়ী ভীষণ বিরক্ত হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার নিজের পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, তাঁহাকে যেন চিনিতেই পারে না। প্রথম প্রথম তাহার ভয় করিত। ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া পড়িল...তাহার সামনে আয়ত্তের মধ্যে যাহা কিছু পায়, তাহা লইয়া সেই অস্বস্তি দূর করিতে চেষ্টা করে। হঠাৎ এক পায়ে দাঁড়াইয়া ওঠে, ঘাড় বাঁকাইয়া ছাদে কি আছে দেখিতে চেষ্টা করে, অকারণে মুখ ভ্যাংচায়, ঠাকুরদার লম্বা কোট ধরিয়া টান দেয়, ভাঙ্গা চেয়ারের খড় উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, আঙ্গুল দিয়া ছেঁড়া চেয়ারে গর্ত করে, বাহিরে কোথায় পাখীরা ডাকিতেছে, উৎকর্ণ হইয়া শোনে, জোর করিয়া হাই তুলিয়া পাশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে।

এমন সময় হঠাৎ শব্দের বন্যা ভাসিয়া আসে—অর্গ্যান বাজিয়া ওঠে। তাহার মেরুদণ্ড দিয়া যেন আনন্দের শিহরণ প্রবাহিত হইয়া যায়। চেয়ারের হাতলে চিবুক লাগাইয়া সে দাঁড়াইয়া ওঠে, সমস্ত মুখের চেহারা

বিজ্ঞের মত স্থির গম্ভীর হইয়া যায়। হঠাৎ কেন যে সেই সংগীতের কলরোল জাগিয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি যে তাহার অর্থ তাহাও সে ঠিক করিতে পারে না। বিপুল বিস্ময়ে তাহার যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়, কিছুই স্পষ্ট করিয়া, আলাদা করিয়া শুনিতে পায় না। কিন্তু তবুও তাহার ভাল লাগে। মনে হয় যেন সেই জঘন্য পুরানো বাড়ীতে সেই ভাঙগা বিশ্রী চেয়ারে আর সে বসিয়া নাই; পাখীর মত মাঝ-আকাশে সে যেন উড়িয়া চলিতেছে। গির্জার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সেই শব্দের বন্যা ছুটিয়া চলে, ঘরের প্রত্যেক কোণ ভরাট হইয়া যায়, দেয়ালে দেয়ালে তাহার অণুরণন জাগিয়া উঠিতে থাকে; মনে হয় সেই শব্দ-তরঙেগ সে যেন এদিক ওদিক চারিদিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, সে-তরঙেগ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া যেন তাহার করিবার আর কিছু নাই। কি মুক্তি! কি আনন্দ!

শব্দের তরঙেগ দুলিতে দুলিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে।

পিতামহ ফিরিয়া দেখেন, সে নিদ্রিত। বিরক্ত হন মনে মনে। উপাসনার সময় তার এই অভদ্র ব্যবহারে বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হন।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মেঝেতে সে খেলিতে বসে। এই মাত্র সে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে, মেঝের উপরে মাদুরটুকু হইল তাহার নৌকা, টালি-দেওয়া সেই মেঝে আজ হইয়াছে তাহার নদী। মাদুর হইতে নামিতে গিয়া আর একটু হইলে সে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা তাহার ঘটিয়া গেল, সে-সম্বন্ধে কাহারও কোন দৃষ্টি নাই! মা ঘরে আসিতেই সে ঘাগ্‌রার পাড় ধরিয়া টানে: 'দেখছো না, চারদিকে জল...সাঁকোর ওপর দিয়ে যাও!' [লাল টালির মধ্যে মধ্যে যে সব ফাটল ধরিয়াছিল, সেইগুলিই তাহার সাঁকো।] তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই মা নদী পার হইয়া যায়। শিশু ভীষণ চটিয়া যায়, নাট্যকার যেমন চটিয়া যায়, যদি দেখে শ্রোতারা অভিনয়ের মধ্যে গল্প করিতেছে।

পরমুহূর্তেই সে-সব কথা সে ভুলিয়া যায়। সেই টাইল-দেওয়া মেঝে আর তাহার কাছে নদী নয়, নির্বিঘ্নে তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া স্বরচিত সংগীতে গুণ্ গুণ্ করিয়া সুর দিতে দিতে পরমানন্দে নিজের বুড়ো আঙগুল চুষিতে থাকে। সামনে দুইটি টাইলের মাঝখানে একটা জায়গা ফাটিয়া গিয়াছে, তাহাই নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে থাকে। টাইলের ধারগুলো মনে হয় যেন কার বিচিত্র মুখভঙগী। ফাটলের মাঝখানের

সামান্য গর্তটুকু ক্রমশ বড় হইয়া ওঠে, দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকা ভূমির মতন! চারিদিকে তাহার পাহাড়। একটা পোকা নড়িয়া বেড়ায়, দেখিতে দেখিতে পোকা হাতীর মতন বড় হইয়া ওঠে। জাঁ-ক্রিস্তফ তন্ময় হইয়া যায়! বাহিরে বজ্রপাত হইয়া গেলেও, সে শুনিতে পাইবে না।

সে যে কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, সে-সম্বন্ধে কাহারও কোন মাথা ব্যথা নাই। সে-ও অপর কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখিতে চাহে না। সেই মাদুর-নৌকা, আর টাইলের রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ সব জীব-জন্তুর দল, তাহাদের না হইলেও তাহার কিছু যায় আসে না। তাহার নিজের দেহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কি বিচিত্র কৌতূহলের আবেদন তাহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া নিজের হাতের আঙ্গুলের নখের দিকেই চাহিয়া থাকে, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহাদের যেন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মুখ, যেমন সব মুখ সে তার আশে-পাশে দেখে। শুধু কি নখ! তাহার দেহের প্রত্যেক অংশ... যাহা কিছু তাহার দেহে আছে, সে তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে সে আবার তন্ময় হইয়া যায়।

সেই অবস্থায় তাহাকে যাহারা মাটি হইতে তুলিয়া লয়, তাহারা অন্যায় ভাবে অযথা তাহার উপর জোর প্রকাশ করে। শিশু বলিয়া তাহাকে সহ্য করিতেই হয়!

মাঝে মাঝে তাহার মা পিছন ফিরিলেই সেই অবসরে সে বাড়ীর বাহিরে পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। প্রথম সে ধরা পড়িয়া যাইত, ছুটিয়া আসিয়া মা তাহাকে টানিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। ক্রমশ তাহাকে একলা ছাড়িয়া দিতে তাহারাও অভ্যস্ত হইয়া গেল, তবে সে-ও বেশী দূর যাইত না। বাড়ীটা শহরের এক প্রান্তে, একেবারে শেষের দিকে ছিল। তাহাদের বাড়ীর পর হইতেই গ্রাম সুরু হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত জানালা দেখা যাইত, ততক্ষণ পর্যন্ত সে না থামিয়াই নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইত, মাঝে মাঝে এক পায়েও দৌড়াইত। কিন্তু রাস্তার বাঁক পার হইলেই ঘন ঝোপে যখন ঢাকা পড়িয়া যাইত, সে থামিয়া পড়িত। মুখে আঙ্গুল গুঁজিয়া দিয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিত, আজ কি গল্প সে নিজেকে শুনাইবে! গল্পে ভর্তি তাহার মন। অবশ্য একথা ঠিকই যে, তাহার অধিকাংশ গল্পই দেখিতে-শুনিতে প্রায় একই রকমের এবং প্রত্যেক গল্পটিই দুই এক লাইনেই বলিয়া শেষ করা যায়। মনে

মনে সে বাছিতে সুরু করে। অধিকাংশ সময়, সে একই গল্প আরম্ভ করে, কখন কখন যেখান হইতে আগের দিন ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে ভাবিতে সুরু করে, কখনও বা একটু অদল-বদল করিয়া গোড়া হইতেই আরম্ভ করে। তবে দৈবসংযোগে সামান্য একটা আওয়াজ যদি তখন কানে আসে, সামান্য একটা শব্দ, তাহা হইলে সম্পূর্ণ আলাদা আর একদিকে তাহার মন চলিয়া যায়।

কি বিপুল সম্ভাবনাই না আছে এই জাতীয় দৈব-সংযোগের মধ্যে! বেড়ার ধারে কুড়াইয়া পাওয়া একটা ভাঙ্গা ডাল, এক টুকরা সামান্য কাঠ, তাহা হইতেই কত যে কি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। ভাঙ্গা ডাল, দেখিতে দেখিতে যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি হইয়া যায়। যদি লম্বা আর সরু হয়, তাহা হইলে অনায়াসে তাহাকে বর্শা ভাবা যায়, কিম্বা তলোয়ারও হইতে পারে। তাহাকে ভাল করিয়া একবার শূন্যে ঘুরাইতে পারিলেই মাটি হইতে দলে দলে সৈনিকেরা জাগিয়া ওঠে। জাঁ-ক্রিস্তফ তাহাদের সেনাপতি, তাহাদের সকলের আগে ভাগে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সে হইল তাহাদের নেতা, আদর্শ সৈন্যদের লইয়া সামনের পর্বত-শৃঙ্গ অধিকার করিবার জন্য সে জোর কদমে চলিয়াছে। যদি ডালটিকে দুমড়াইয়া নোয়ানো সম্ভব হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহা চাবুকে রূপান্তরিত হইয়া যায়। চাবুক হাতে জাঁ-ক্রিস্তফ ঘোড়ায় চড়িয়া দুরারোহ পর্বত-শৃঙ্গ অনায়াসে লাফাইয়া অতিক্রম করিয়া চলে। দৈবাৎ কখনো যদি অশ্বের পা পিছলাইয়া যায়, অশ্বারোহী তখন মাটির নীচে খানায় গড়াগড়ি দেয়, হাত-পা কর্দমাক্ত হইয়া যায়, কখনও বা হাঁটু ছড়িয়া রক্ত দেখা দেয়। যদি ডালটি আরো সরু লিক্‌লিকে হয়, তখন তাহা লইয়া জাঁ-ক্রিস্তফ অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করিতে সুরু করিয়া দেয়। অর্কেষ্ট্রা পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে সে গানও গায়। গান শেষ হইয়া গেলে, হাতের ছড়িটা মাথায় ঠেকাইয়া ঈষৎ মাথা নত করিয়া সামনের ঘন-সবুজ লতা-গুল্মকে অভিবাদন জানায়, কারণ তাহারাই তাহার শ্রোতা। বাতাসে ছোট ছোট সবুজ মাথা দোলাইয়া তাহারাও প্রত্যাভিবাদন জ্ঞাপন করে।

যাদুবিদ্যাতেও তাহার কম অধিকার ছিল না। মাঠের মধ্য দিয়া বড় বড় করিয়া পা ফেলিয়া চলিত, আকাশের দিকে চাহিয়া নানা রকমের হাতের ভঙ্গী করিত। যাদুবলে মেঘেদের উপর ছিল তাহার আধিপত্য। সে তাহাদের আদেশ করিত ডান দিকে যাইবার জন্য কিন্তু তাহারা যদি তাহার আদেশ অমান্য করিয়া বাঁ দিকে চলিয়া যাইত, সে রাগিয়া গিয়া

তাহাদের ভর্ৎসনা করিত, পুনরায় আদেশ দিত। চোখ প্রায় বুজিয়া আড়-নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিত, আশায় আশঙ্কায় অন্তর কাঁপিতে থাকিত, ছোট এক টুকরা মেঘও কি আজ তাহার আদেশ পালন করিবে না? কিন্তু মেঘের দল নিশ্চিন্ত মনে ধীরে বাঁ-দিকেই সরিয়া যাইত। মাটিতে পা ঠুকিয়া, হাতের যাদুদণ্ড তুলিয়া রাগে তখন আদেশ করিত : 'তা হলে এবার বাঁ দিকেই যাও!'

এবার, সত্য সত্যই তাহারা তাহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইল। নিজের শক্তির এই স্পষ্ট প্রমাণে গর্ব বোধ করিত, আনন্দিত হইত বালক। সে গল্পে যেরূপ শুনিয়াছিল, ঠিক সেই মত, ফুলেদের কাছে গিয়া সন্তর্পণে তাহাদের স্পর্শ করিত এবং সেই সঙ্গে আদেশ করিত, অবিলম্বে স্বর্ণ-রথে পরিবর্তিত হইয়া যাও। যদিও স্বর্ণ-রথ তখনই দেখা যাইত না, তবুও তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল, সে ধৈর্য ধরিয়া যদি অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা স্বর্ণ-রথে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কখন বা ফড়িং ধরিয়া তাহাকে খরগোসে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিত। ধীরে তাহার পিঠে যাদুদণ্ড ঠেকাইয়া মনে মনে মন্ত্র জপিত। ফড়িং পালাইতে চেষ্টা করিত, সে বাধা দিত। কিছুক্ষণ পরে মাটিতে তাহার কাছাকাছি উপুড় হইয়া শুইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে ভুলিয়া যাইত যে সে যাদুকর। কাঠি দিয়া তাহাকে উলটাইয়া পালটাইয়া তাহার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া উঠিত।

মাঝে মাঝে তাহার সেই যাদুদণ্ডে সূতা বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে সে নদীর জলে ছিপ ফেলিত, অপেক্ষা করিয়া থাকিত, মাছ আসিয়া সূতায় আটকাইয়া যাইবে বলিয়া। অবশ্য সে খুব ভালভাবেই জানিত যে মাছেরা টোপ ছাড়া শুধু সূতায় কখনও কামড়ায় না বা বঁড়শী ছাড়া তাহাদের তোলা যায় না, তবুও তাহার মনে আশা জাগিয়া উঠিত, হয়ত একবার অন্তত তাহারা তাহার খুশির জন্য সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে। এবং এমনই সুগভীর ছিল তাহার বিশ্বাস যে, একবার রাস্তার ধারে একটা চাবুকের ডগায় সুতা বাঁধিয়া এক নর্দমার ফাঁকে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল। উত্তেজিতভাবে মাঝে মাঝে ছিপ তুলিয়া দেখে, মাছ লাগিয়াছে কিনা... হঠাৎ একবার যেন মনে হয় খুব ভারী বোধ হইতেছে, তাহার ঠাকুরদাদার নিকট শুনিয়াছিল, মাছ ধরিতে গিয়া কে যেন ছিপে এক সিন্দুক মোহর তুলিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভারী বোধ হইতে থাকে, তখন অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ছিপ টানিয়া তোলে...

এইসব খেলার মাঝখানে হঠাৎ কোথা হইতে তাহার মনে বিচিত্র সব স্বপ্ন নামিয়া আসিত, পরিপূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে সে তলাইয়া যাইত। তখন তাহার আশেপাশে চারিদিক হইতে সব কিছু যেন মুছিয়া যাইত, সে যে কি করিতেছে, তাহাও মনে থাকিত না, এমন কি নিজের সম্বন্ধেও অচেতন হইয়া পড়িত। হঠাৎ কখন যে এইভাবে স্বপ্ন তাহাকে পাইয়া বসিত তাহার কিছুই ঠিক ঠিকানা ছিল না। পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিতে চলিতে কিম্বা সিঁড়ির উপর উঠিতে উঠিতে হঠাৎ তাহার সামনে যেন মহাশূন্যতা মুখব্যাদন করিয়া আসিত! তখন মনে হইত, কোন ভাবনা বা কোন চিন্তাই যেন তাহার মনে নাই। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিত, সভয়ে দেখিত সেই অন্ধকার সিঁড়িতে সে তেমনি ঠিক সেই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে। সেই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ—মনে হইত তাহার মধ্যে যেন একটা সমগ্র জীবন-কালই অতিবাহিত হইয়া গেল।

ঠাকুরদা প্রায়ই তাহাকে লইয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতেন। ঠাকুরদার গা ঘেঁষিয়া পাশে পাশে চলিত, তাঁহার হাতের মধ্যে নিজের ছোট্ট হাতখানি তুলিয়া দিত। কখন রাস্তা দিয়া, কখনও বা সদ্য-কর্ষিত মাঠের মধ্য দিয়া তাহারা চলিত, মাঠ হইতে কর্ষিত-মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত, ভাল লাগিত। অন্ধকারে ঝিল্লী ডাকিয়া উঠিত। বৃহদাকার সব কাক রাস্তার উপর বসিয়া দূর হইতে তাহাদের আসিতে লক্ষ্য করিত, তাহারা নিকটে আসিলে ভারী ডানার আওয়াজ করিয়া অন্ধকারে উড়িয়া যাইত।

বৃদ্ধ হঠাৎ কাশিয়া উঠিতেন। সে কাশির কি অর্থ তাহা জাঁ-ক্রিস্তফ ভাল করিয়া জানিত। গল্প বলিবার জন্য বৃদ্ধ উস্খুস্ করিতেছেন—এই কাসি হইল তাহারই বিজ্ঞাপন। কিন্তু বৃদ্ধের ইচ্ছা, বালক কৌতূহলী হইয়া আগে তাঁহাকে অনুরোধ করুক, গল্প বলার জন্য। বৃদ্ধ সুগভীর ভাবে নাতিটিকে ভালবাসিতেন, তাঁহার সকল কথার এমন সহৃদয় শ্রোতা আর দ্বিতীয়টি ছিল না। কৌতূহলী হইয়া বালক যখন গল্প শুনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত বৃদ্ধের তখন বিপুল আনন্দ হইত। নিজের অতীত জীবনের টুকরা টুকরা কাহিনী বলিতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ ক্রমশ অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে চলিয়া যাইতেন।

...রেগুলাসের আর আর্মিনাসের কাহিনী, লুটজাউ-এর সৈন্যদের বীরত্ব, কোয়েরনার ও ফ্রেডেরিক ষ্টাবস্—যে সম্রাট নেপোলিয়াঁকে হত্যা

করিতে গিয়াছিল, একে একে তাহাদের সকলের গল্প বৃদ্ধ বলিয়া যাইত। সেই সব অপরূপ বীরত্বের কাহিনী বলিতে বৃদ্ধের চোখমুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত! ইতিহাসের সেই সব বীর নায়কদের নাম উচ্চারণ করিবার সময় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আবেগে এমন গম্ভীর হইয়া আসিত যে জাঁ-ক্রিস্তফ অনেক সময় নামগুলি স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইত না, গল্প বলিতে বলিতে যেখানে নাটকীয় মুহূর্ত আগাইয়া আসিত, বৃদ্ধ ইচ্ছা করিয়াই সেখানে এমন কৌশল অবলম্বন করিতেন যাহাতে শ্রোতা ঔৎসুক্যে চঞ্চল হইয়া ওঠে। বলিতে বলিতে সেই মুহূর্তের ঠিক আগে থামিয়া যাইতেন, এমন ভাব দেখাইতেন যে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, সশব্দে একবার নাক পরিষ্কার করিয়া লইতেন, শিশু উৎকণ্ঠা আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া আপনা হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিত: 'হাঁ... তারপর কি হলো ঠাকুরদা?' এই প্রশ্নটুকু শুনিবার জন্যই বৃদ্ধ এত কাণ্ড করিতেন, তাঁহার অন্তর দ্বিগুণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এমন একদিন আসিল, যখন জাঁ-ক্রিস্তফ পিতামহের সেই কৌশল বুঝিয়া ফেলিল। তখন সে দুষ্টুমি করিয়া এমন উদাসীন ভাব দেখাইত, যেন গল্পের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে তাহার আর কোন আগ্রহই নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার শিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। কি লইয়া এইসব গল্প তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিত না, কখন বা কোথায় যে এইসব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারও কোন স্পষ্ট ধারণা তাহার ছিল না, তাহার ঠাকুরদাদা আমিনাস্‌কে দেখিয়াছে কি দেখে নাই, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, হয়ত গত রবিবারে গির্জায় যে সব লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেউ হয়ত রেগুলাস্ হইবে, ভগবানই জানেন কেনই বা হইবে না! কিন্তু তাহা লইয়া সে মাথা ঘামাইত না। পথ চলিতে চলিতে তাহারা দুইজনেই সেই সব বীরত্বের কাহিনীতে গর্বে, আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিত, যেন তাহারা দুইজনেই সেই সব ঘটনার নায়ক। সেই বৃদ্ধ আর সেই শিশু, দুই-জনেই তাহারা সেই এক জায়গায় ছিল সমবয়সী, সমান শিশু।

মাঝে মাঝে ঠাকুরদা সেই সব নাটকীয় মুহূর্তের সকরুণ বর্ণনার মধ্যে, কি যেন সব জটিল তত্ত্বকথা জুড়িয়া দিতেন, জাঁ-ক্রিস্তফের সুর কাটিয়া যাইত। বুঝিত সেই ধরণের কথা বলিতে ঠাকুরদার বড়ই ভাল লাগে। যেন কোন একটা বিষয় লইয়া এই ধরণের উপদেশ দিতেন এবং খুব অল্প কথাতেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। যেমন, 'আঘাত করার

অপেক্ষা আঘাত সহ্য করাই শ্রেয়', অথবা, 'জীবনে আত্মমর্যাদাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ', কিম্বা, 'মন্দ হওয়ার চেয়ে ভাল হওয়াই ঢের কঠিন'—তবে মাঝে মাঝে ইহার অপেক্ষা আরও জটিল গুরু-গম্ভীর কথাও বৃদ্ধ বলিতেন। তখন জাঁ-ক্রিস্তফের বুঝিতে বড়ই অসুবিধা হইত। তবে বালক-শ্রোতার সমালোচনা সম্পর্কে বৃদ্ধের কোন আশঙ্কাই ছিল না, তাই তিনি যাহা বলিতেন নির্ভয়ে জোর দিয়াই বলিতেন। প্রয়োজন হইলে কোন কথা বারবার করিয়া বলিতেন, কিম্বা, কোন কথা যদি বলিয়া শেষ করিয়া উঠিতে না পারিতেন, তাহা হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাকে অসমাপ্তই রাখিয়া দিতেন; বলিতে বলিতে যদি খেই হারাইয়া যাইত, শূন্য স্থান ভরাট করিবার জন্য মাথায় যাহা আসিত নির্বিবাদে বৃদ্ধ তাহাই বলিয়া যাইতেন। কোন কথার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতে হইলে, তিনি হঠাৎ অসংগত জোরে সেই কথাটা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন। বালক একান্ত শ্রদ্ধাভরে সব শুনিয়া চলিত, যদিও মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ হইত তবুও সে জানিত, তাহার পিতামহ রীতিমত একজন সুবক্তা।

কর্সিকার যে বিজয়ী ফরাসী বীর সমগ্র য়ুরোপকে একদা পদানত করিয়াছিলেন, বারে বারে তাঁহারই কথা বলিতে এবং শুনিতে বৃদ্ধ ও বালকের, দুইজনেরই ভাল লাগিত। জাঁ-ক্রিস্তফের পিতামহ তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন। সেই জগৎজয়ী বীরের বিরুদ্ধে এক রকম তাঁহাকে সংগ্রাম করিতেও হইয়াছিল। কিন্তু বিপক্ষ বলিয়া তিনি যে তাঁহার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবেন, এমন লোক তিনি নন্। অন্তত কুড়িবার এই এক কথা বৃদ্ধ বালককে শুনাইয়াছেন। যদি রাইন নদীর এই দিকে নেপোলিয়ঁর মত কোন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিজের হাত স্বেচ্ছায় কাটিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই নেপোলিয়ঁর বিরুদ্ধেই তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়। নেপোলিয়ঁ তখন দশ লীগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহাদের ছোট্ট দল ভয়ে সামনের অরণ্যের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া লুকাইয়া পড়িল, যে যার ভয়ে পলাইয়া যাইতে যাইতে চিৎকার করিয়া উঠিল : 'নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!'...অতীত দিনের সেই পরাজয়কে ঢাকিবার জন্য বৃদ্ধ বলিয়া চলেন: 'বৃথাই, বৃথাই সেই পলাতক সৈন্যদের আবার একত্র করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলাম...তাদের সামনে গিয়ে, কত না অনুরোধ করলাম, ভয় দেখালাম, কাঁদলাম কিন্তু

কিছুই হ'ল না, তারা আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে চলে গেল। পরের দিন ভোর বেলা দেখলাম, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু বহুদূরে সরে এসেছি...।' সেই পলায়নের ব্যাপারকে বৃদ্ধ যুদ্ধ বলিয়াই নাতির নিকট পরিচয় দেন। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ বৃদ্ধ পিতামহের যুদ্ধ-কীর্তির চেয়ে কর্সিকার সেই বিজয়ী বীরের কথাই বেশী করিয়া শুনিতে চায়, তাই বারেবারে তাঁহার কথাই জিজ্ঞাসা করে। সেই বীরপুরুষের অপূর্ব বিজয়-অভিযানের কাহিনী বালক তন্ময় হইয়া শোনে।

কল্পনার নেত্রে সে দেখে, অসংখ্য লোক নেপোলিয়াঁকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সপ্রেমে তাঁহার জয়-বার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার হাতের সামান্য ইঙ্গিতে দলে দলে সৈন্য পলাতক শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে...নেপোলিয়াঁর শত্রুদের যখনই দেখিত, দেখিত তাহারা পালাইতেছে। নেপোলিয়াঁর কাহিনীকে বালক শ্রোতার নিকট আরো রোমাঞ্চকর করিবার জন্য বৃদ্ধ ইতিহাসের বেড়া ভাঙিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়া যাইতেন, নেপোলিয়াঁ স্পেন জয় করিয়াছিলেন এবং ইংলন্ডও প্রায় জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ ক্রাফ্ট সেই উত্তেজনাময় কাহিনী বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে কাহিনীর নায়ককে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া উঠিতেন। তাঁহার মধ্যে তখন সহসা স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠিত, বিশেষ করিয়া যখন সম্রাটের পরাজয়ের প্রসঙ্গ আসিত। চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া পড়িতেন, নদীর দিকে বদ্ধ-মুষ্টি তুলিয়া অসীম ঘৃণায় গালাগাল দিয়া উঠিতেন, "রাস্কেল"..."বুনো জানোয়ার"..."অসভ্য"..."দুর্নীতি-পরায়ণ"। বালক শ্রোতার মনে ঐতিহাসিক সুবিচারের একটা ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ ঐ সব শব্দ প্রয়োগ করিতেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ, বালক নিজস্ব যুক্তির ধারা অনুযায়ী বহু আগেই তাহার মনে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গড়িয়া লইয়াছিল: "যদি তাঁহার ন্যায় একজন মহাপুরুষ অসভ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সভ্যতা এমন কিছু বড় জিনিস নয়...আসল ব্যাপার হইল, মহা-পুরুষ হওয়া!" তাঁহার পাশে থাকিয়া বালক যে এইরূপ চিন্তা করি-তেছে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশই বৃদ্ধের মনে জাগিত না।

গল্প শেষ হইলে তাহারা দুইজনে আবার পাশাপাশি নীরবে চলিত, দুইজনেই দুইজনের মতন করিয়া সেই সব অদ্ভুত কাহিনীর কথাই মনে মনে রোমন্থন করিত। কখন কখন বৃদ্ধের সহিত পথে কোন সম্ভ্রান্ত

পৃষ্ঠপোষকের দেখা হইয়া যাইত। বৃদ্ধ সম্ভ্রমভরে দাঁড়াইয়া পড়িতেন, ঈষৎ মাথা নত করিয়া আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার বাঁধা বুলি সবিস্তারে উচ্চারণ করিতেন। আপনার অজ্ঞাতে বালক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত। পিতামহের সেই দীনভাব সে সহ্য করিতে পারিত না। বালক জানিত না যে তাহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা এবং সরকারী "প্রভুত্ব"কে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন। যে-সব বীরপুরুষের গল্প বলিতে বৃদ্ধের ভাল লাগিত, সাধারণ লোকদের ছাড়াইয়া তাঁহারা উপরের ধাপে পৌঁছাইয়াছে বলিয়াই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের একটা বিশেষ আবেদন ছিল। সে-কথা জাঁ-ক্রিস্‌তফ তখনও বুঝিত না।

যেদিন বাতাস অতিরিক্ত উত্তপ্ত বোধ হইত, সেদিন বৃদ্ধ গাছতলায় ছায়ায় গিয়া বসিতেন এবং দেখিতে দেখিতে ঝিমাইতে সুরু করিয়া দিতেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ তখন নিকটে ইতস্তত-বিন্যস্ত ইঁটের উপর, অথবা কোন পথ চিহ্ন অথবা ঐ জাতীয় কোন উঁচু জায়গায় গিয়া কোন রকমে বসিত, বসিতে অসুবিধাই হইত; আপনার মনে গুণ গুণ করিতে করিতে আপনার স্বপ্নলোকে চলিয়া যাইত। কখনও বা মাটিতে পিঠ দিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িত, দেখিত আকাশে মেঘেরা ভাসিয়া চলিয়াছে; কোনটা দেখিতে ষাঁড়ের মতন, কোনটাকে মনে হইত বুঝি বা দৈত্য, কোনটা মাথার টুপির মতন, আবার কোনটার স্ত্রীলোকের মতন চেহারা। কখন কখন মৃদু কণ্ঠে তাহাদের সহিত আলাপ করিত, কখনও বা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছোট্ট এক টুকরা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিত, দেখিত তাহার পার্শ্ববর্তী বিরাট মেঘখন্ড কি করিয়া তাহাকে ক্রমশ গ্রাস করিয়া লইতেছে! কোথা হইতে কখনও বা ভাসিয়া আসিত গভীর কালো মেঘ, নীলাভ; সঙ্গে সঙ্গে আরও একদল আসিয়া পড়িত, অতি দ্রুত তাহাদের গতি, তাহাদের দেখিয়া কেমন যেন মনে ভয় জাগিয়া উঠিত। সেই সব ভাসমান মেঘের দল, তাহাদের সহিত যেন তাহার কোথাও ঘনিষ্ট যোগ আছে। কিন্তু বিস্মিত হইয়া যাইত, যখন দেখিত, তাহার পিতামহ বা তাহার মা, কেউ সেদিকে লক্ষ্যই করে না। বালকের মনে হইত, সেই সব ঘন কালো মেঘ যদি ক্ষতি করিতে চাহিত, ভয়ংকর ক্ষতি করিবার মতই, মনে হয়, তাহাদের শক্তি আছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বিচিত্র ভঙ্গী করিতে করিতে, তাহারা শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াই যাইত, পথের মধ্যে থামিয়া থাকিত না। এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে দেখিতে বালক কেমন যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িত, হাত-পা স্থির রাখিতে

পারিত না, যেন সে নিজে আকাশ হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িতেছে। চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিত, চারিদিক স্থির নীরব...জাঁ-ক্রিস্তফ ঘুমাইয়া পড়িত...

কিছুক্ষণ পরেই বালকের তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। কান পাতিয়া শোনে, চারিদিকে বনে মৃদু-মর্মর ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে, চোখ মেলিয়া দেখে সূর্যালোক-আহত পল্লব-পত্র মৃদুমন্দ কাঁপিতেছে। তখনও বাতাসে ক্ষীণ কুয়াশার আমেজ লাগিয়া রহিয়াছে; রঙীন হাল্কা পাখায় মৌমাছিরা উড়িয়া বেড়ায়, বীণার তন্ত্রীতে ঝংকারের মতন ওঠে অস্ফুট গুঞ্জন ; আলোক-মত্ত পতঙ্গের দল আবেগ-আকুল দ্রুত ঘুরিয়া ফিরে ...ভাষাহীন অপরূপ নিস্তব্ধতা...ঘন বৃক্ষের ছায়ায় বনের সবুজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কাঠ-ঠুকুরিয়া ডাকিয়া ওঠে...সে-ডাকে মনে হয় যে কুহক-মন্ত্র আছে। দূরে কোথাও কৃষক তারস্বরে বলদকে ডাকিতেছে, পাথরের রাস্তায় চলন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ হয়, জাঁ-ক্রিস্তফের চোখ আবার বুঁজিয়া আসে। কাছেই একটা মরা ডালের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে একটি পিপীলিকা হাঁটিয়া চলিয়াছে ...জাঁ-ক্রিস্তফ আবার চোখ মেলিয়া চাহে...দেখে সেই মরা ডালের উপর দিয়া তখনও তেমনি চলিয়াছে সেই পিপীলিকাটি...

কোন কোন দিন বৃদ্ধ গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়েন, মুখের রেখা ঘুমের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া যায়, লম্বা নাক মনে হয় যেন আরো লম্বা হইয়া গিয়াছে, মুখ হাঁ করিয়াই বৃদ্ধ ঘুমাইতে থাকে। তখন বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে জাঁ-ক্রিস্তফের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়, ভয় হয় বুঝি বা অকস্মাৎ সেই মুখ পরিবর্তিত হইয়া অন্য কোন বীভৎস আকার ধারণ করিবে। ইচ্ছা করিয়াই সে তখন চিৎকার করিয়া গান গাহিয়া ওঠে কিম্বা যে উঁচু জায়গায় বসিয়াছিল সশব্দে সেখান হইতে লাফাইয়া পড়ে, যাহাতে বৃদ্ধের ঘুম ভাঙিয়া যায়। একদিন তাহার হঠাৎ কি খেয়াল হইল, ঘুমন্ত মুখের উপর এক রাশ শুকনো সূঁচোলো ঘাস ফেলিয়া দিল ; বৃদ্ধ জাগিয়া উঠিলে বলিল, গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ তাহাই বিশ্বাস করিলেন দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন পুনরায় যখন এই একই কৌশল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়া হাত তুলিয়াছে, সদ্য সদ্য ধরা পড়িয়া গেল ; দেখে, বৃদ্ধ চোখের কোণ দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বৃদ্ধ একদম গম্ভীর হইয়া

গেলেন, তাঁহার সম্মান লইয়া এইরূপ খেলা করিবার অধিকার তিনি দিতে পারেন না। এক সপ্তাহ ধরিয়া দুইজনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া যায়।

পথ যত খারাপ হইত, জাঁ-ক্রিস্তফের ততই ভাল লাগিত। পথের প্রত্যেকটি পাথরের টুকরা, তাহার নিকট সবিশেষ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেককে যেন সে আলাদা করিয়া চেনে। পথের ধূলায় যে চাকার দাগ ফুটিয়া থাকিত, আকাশের ছায়া-পথের শুভ্র দুগ্ধ-রেখার মতই মনে হইত দুর্জ্ঞেয় এক ভৌগোলিক আকস্মিকতা। তাহার বাড়ী হইতে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত যত নালা-নর্দমা ছিল, যত পাথর-ঢিবি ছিল, তাহাদের সকলের মানচিত্র তাহার মস্তিষ্কে আঁকা হইয়া গিয়াছিল। এবড়োখেবড়ো পথের আঁকাবাঁকা রেখার একটাকেও যদি কোন রকমে একটু ভাঙিগয়া চুরিয়া পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিত, তাহার মনে হইত যেন সে একটা বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্ব দেখাইল ; পায়ের গোড়ালি দিয়া একটা মাটির ঢিবির মাথা খানিকটা সমতল করিয়া, নীচের গর্তটুকু সেই মাটি দিয়া ভরাট করিয়া যখন সে ফিরিত, তখন সগর্বে ভাবিয়া লইত, সেদিনটা তাহার বৃথাই অতিবাহিত হয় নাই।

কখন হয়ত বড় রাস্তায় কোন ঘোড়ার গাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে, গাড়োয়ানের সহিত বৃদ্ধের পূর্ব-পরিচয় থাকিলে, তাহারা দুইজনেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিত। সেই অভাবনীয় সৌভাগ্যটুকু তাহার নিকট স্বর্গসুখ বলিয়া মনে হইত। টগ্‌বগ্‌ করিয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিত, জাঁ-ক্রিস্তফ আনন্দে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িত, রাস্তায় কোন লোক আসিয়া পড়িলে হাসি থামাইয়া ফেলিত। তখন গম্ভীর মুখ করিয়া উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকিত, যেন এইভাবে গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেই সে অভ্যস্ত। তাহার ঠাকুরদাদা এবং গাড়োয়ান কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও দেখিত না, নিজেদের গল্পে নিজেরা মত্ত হইয়াই থাকিত। তাহাদের পায়ের কাছে সে কোনরকমে কষ্টে-সৃষ্টে একটু জায়গা করিয়া লইত, কখনও বা বসিবার জায়গাই পাইত না, তাহাদের পায়ের চাপে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, তবুও তাহার আনন্দের অবধি থাকিত না। প্রাণ খুলিয়া জোরে কথা বলিয়া চলিত, কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল কি দিল না, সে-সম্বন্ধে তাহার কোন দুর্ভাবনাই থাকিত না। দেখিত সামনে ঘোড়ার কান দুটি অনবরত নড়িতেছে...

যেন তাহার স্বতন্ত্র কোন বিচিত্র জীব! ডাইনে, বাঁয়ে, যেদিকে খুশি ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কখন সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেছে আবার এমন মজা করিয়া পিছনে পড়িয়া যাইতেছে যে, সে না হাসিয়া আর থাকিতে পারিত না। ঠাকুরদার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহাকে চিমটি কাটে কিন্তু বৃদ্ধ সে-সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখান না, উল্টা জাঁ-ক্রিস্‌তফকেই ভর্ৎসনা করেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য আদেশ দেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ গভীর দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যায়। ভাবিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানুষ যখন বড় হয়, তখন কোন কিছুতেই আর সে বিস্মিত হয় না, তখন হয়ত সব কিছুই তাহার জানা হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে বড় হইতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায় হইল, সর্ববিষয়ে তাহার এই যে বিস্ময়ের ভাব তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সব কিছু সে জানে, এমনি গম্ভীর উদাসীন হইয়াই সে থাকিবে।

তাই পরক্ষণেই সে নীরব হইয়া যায়। গাড়ীর ঝাঁকানিতে তন্দ্রা আসে। ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজিতে থাকে, ডিং ডিং ডং ডিং...বাতাসে সঙ্গীত জাগিয়া ওঠে...সেই রূপালী ঘণ্টার চারিদিকে মৌমাছির ঝাঁকের মতন সে-সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া ফিরে। গাড়ীর চলার ছন্দের সঙ্গে সমান তাল দিয়া চলে, অফুরন্ত সঙ্গীতের উৎস...একটা গান শেষ না হইতেই, আর একটি সুরু হইতেছে, গায়ে গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। জাঁ-ক্রিস্‌তফের কানে লাগে অপরূপ, অপূর্ব! তাহার মধ্যে একটি সুর, বিশেষ করিয়া তাহার এত সুন্দর লাগে যে, সেইদিকে ঠাকুরদাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। নিজেই তারস্বরে সেই সুরে গাহিয়া ওঠে। কিন্তু কেহই কর্ণপাত করে না। সে আরো উঁচু পর্দায় ধরে, আরো তীব্র কণ্ঠে...অবশেষে বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া ওঠেন, থাম্‌... কানের কাছে ঢাকের আওয়াজে তালা লাগাবার জোগাড় হলো!

তাহার পক্ষে এ মন্তব্য সহ্য করা কঠিন হইয়া ওঠে। লজ্জায় মুখ লাল করিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে চুপ করিতেই হয়। সেই দুটি পরম অপদার্থ বৃদ্ধ, সঙ্গীতের মাহাত্ম্য বুঝিবার এতটুকু ক্ষমতা যাহাদের নাই, ইচ্ছা হয় ঘৃণায় তাহাদের নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে। হঠাৎ তাহার মনে হয়, তাহাদের সেই দাড়ি-শুদ্ধ মুখ অতীব কুৎসিত, তাহাদের গা হইতে যেন তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

নিরুপায় হইয়া ঘোড়ার চলন্ত ছায়ার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই সে

সান্ত্বনা খুঁজিয়া লয়। সত্যি, কি আশ্চর্য লাগে সেই চলন্ত ছায়া! ঠিক লাইন ধরিয়া, সেই ছায়া-প্রাণীরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা ফিরিবার মুখে, জাঁ-ক্রিস্তফ দেখিল, মাঠের আর একদিক জুড়িয়া তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। একটা চড়াই-এর উপর উঠিতে জাঁ-ক্রিস্তফ দেখিল, একটা ছায়ার মাথা কোন উপরে উঠিল, আবার ঠিক আগেকার জায়গায় নামিয়া গেল। সেই ছায়া-প্রাণীর নাকের ডগাটা মনে হইতেছিল, অসম্ভব রকমের চেপ্টা, কতকটা ফাটা বেলুনের মত; কান দুইটি কি বড়...আবার হঠাৎ কেমন মোম-বাতির মত সরু হইয়া আসিল! জাঁ-ক্রিস্তফ ভাবে, ওটা সত্যি ছায়া, না কোন প্রাণী? যাহাই হোক্ না কেন, একথা কিন্তু খুবই সত্য, সে কিছুতেই উহার সমনাসামনি দাঁড়াইতে পারিবে না। অনেক সময় তাহার ঠাকুরদাদার ছায়ার পিছনে পিছনে সে ছুটিয়াছে—ছায়ার মাথা মাড়াইয়া চলিয়া যাইবার জন্য তাহার তীব্র বাসনা জাগিয়াছে, কিন্তু এই রকম অদ্ভুত ছায়ার পিছনে সে কিছুতেই ছুটিতে সাহস পায় না। সূর্য অস্ত যাইবার সময় গাছের যে-সব ছায়া পড়িত, তাহা দেখিয়াও সে বহুদিন বহু দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে এই সব গাছের ছায়া ভূতের মতন পথ আগলাইয়া দাঁড়াইত, ম্লান, শীর্ণ মূর্তি যেন তাহারা বলিয়া উঠিত: 'ব্যাস, ঐ পর্যন্ত! আর এগিয়ো না!' সেই সঙ্গে গাড়ীর চাকা আর ঘোড়ার খুর হইতে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিত: 'ব্যাস্, আর এগিয়ো না!'

গাড়ীর চালক আর তাহার ঠাকুরদাদার বক্‌বকানি যেন শেষ হইতেই চায় না। মাঝে মাঝে তাহাদের গলা হঠাৎ চড়া হইয়া উঠিত, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা কোন স্থানীয় ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিত। তাহার মনে হইত যেন তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপর ভীষণ রাগিয়া গিয়াছে এবং ভয় হইত, হয়ত এক্ষুণি তাহারা হাতাহাতি করিবে। রাগারাগি ছাড়া চড়া গলার আর যে কোন অর্থ থাকিতে পারে, তাহা তখনও জাঁ-ক্রিস্তফ জানিত না। আসলে সেই চড়া গলার মধ্যে ঘৃণাও ছিল না, কোন আবেগের উত্তেজনাও ছিল না। সামান্য ছোট-খাট ব্যাপার লইয়া তাহারা চড়া-গলায় আলোচনা করে, সেই ভাবে আলো-চনা করিতে তাহাদের ভাল লাগে বলিয়াই করে। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ তাহাদের আলোচনার কোন মানেই বুঝিতে পারে না, শুধু তাহাদের কথার চড়া সুর শুনিয়া এবং উত্তেজিত মুখের ভাব দেখিয়া ভয় পায়

এবং মনে মনে ভাবে: 'ইস্! লোকটার কি ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা হয়েছে! নিশ্চয়ই রেগে গিয়ে চোখ পাকাচ্ছে... লোকটা হাঁ করে যেন খেতে আসছে...ইস্! রাগে আমার নাকের ওপর খানিকটা থুতু ফেলে দিল! হে ভগবান, ঠাকুরদাকে বুঝি লোকটা এবার মারবে!'

এমন সময় হঠাৎ গাড়ী থামিয়া যায়। গাড়োয়ান বলিয়া ওঠে: 'এই তো পেঁৗছে গিয়েছেন!' জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হইয়া দেখে, এই-মাত্র যাহারা প্রাণান্ত ঝগড়া করিতেছিল, তাহারা হাসিয়া করমর্দন করিল। জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার ঠাকুরদাদাই আগে গাড়ী হইতে নামেন, তারপর গাড়োয়ান হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া দেয়। ঘোড়ার পিঠে আবার চাবুকের শব্দ হয়, সশব্দে গাড়ী তাহাদের ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, আবার রাইন নদীর ধারে সেই ছোট্ট নীচু রাস্তাতে তাহারা দুইজনে হাঁটিয়া চলে। মাঠের পিছন দিক দিয়া সূর্য নামে। রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়া পড়িয়াছে। পায়ের চাপে নরম ঘন-ঘাস নুইয়া পড়ে, বিচিত্র শব্দ ওঠে। তীরবর্তী অল্‌ডারগাছগুলি নদীর দিকে ঝুঁকিয়া আছে, আধ-খানা দেহ যেন জলে ভাসিতেছে। কোথা হইতে এক ঝাঁক মশা নাচিয়া চলিয়া যায়। নিঃশব্দে স্রোতের শান্ত টানে একটা নৌকা সামনে দিয়া ভাসিয়া চলে। ছোট ছোট ঢেউগুলি উইলোর নত শাখাকে আদর করিয়া যেন চুম্বন করে। দিবসের খর আলো স্নিগ্ধ মৃদু হইয়া আসে, বাতাস স্বচ্ছ অনাবিল, নদীর রূপালী বুকে নামে দিন-শেষের ধূসর ছায়া। তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসে, চারিদিকে ঝিঁঝিঁরা ডাকিতে থাকে। উঠানের মাঝখানে প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকে আলো-করা জননীর হাসি-ভরা মুখ...

ওগো, আজিকার এই দিন, জানি একদা আবার দেখা দিবে তুমি আনন্দ-স্মৃতিরূপে, সুমধুর কল্পনার আকারে! সুরের পাখায় জীবনের যাত্রা-পথে আবার জাগিয়া উঠিবে আজিকার এই সঙ্গীত। ...জীবনের যাত্রা-পথে দেখা দিবে কত বৃহৎ নগরী, গর্জমান কত সমুদ্র, কত স্বপ্ন, কত সৌধ আর কত না প্রীতি-ভরা মুখ...কিন্তু সেদিন তাহারা আর এমন করিয়া মনে রেখাপাত করিয়া থাকিয়া যাইবে না, যেমন থাকিয়া গেল এই শৈশবের পথচলার স্মৃতি! ছায়া-ছায়া ঐ বাগানের কোণটুকু, যাহা সে প্রতিদিন জানালার ঝাপসা কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিত, কোন কাজ থাকিত না বলিয়া মুখ-নিঃসৃত বাষ্পে

জানালার কাঁচকে নিজেই ঝাপসা করিয়া তুলিত, সেই ছিল তাহার অবসরের খেলা—শৈশবের এই সব ছোট-খাট স্মৃতিগুলি তাহার মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিয়া গেল, তাহারাই বারেবারে জীবনের মোড়ে মোড়ে ফিরিয়া আসিবে, জাগাইয়া তুলিবে আলো-ছায়ার বিচিত্র সুর।

ক্রমশ সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসে...বাড়ীতে দরজা-জানালা সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়। গৃহ...নীড়...যাহা কিছু ভয়ঙ্কর—অন্ধকার, রাত্রি, ভয়, অজানার আশঙ্কা—সকলের হাত হইতে মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রাঙ্গণে তাহার কোন শত্রুর পদধ্বনি জাগে না...ঘরের ভিতরে জ্বলে আলো, শিখাময় স্নেহময়। রান্নাঘরে উনুনের উপর লোহার শিকে হলুদ-বরণ হাঁস একটু একটু করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে...বাতাস হইয়া ওঠে ঘৃত-গন্ধী মধুর...সুখাদ্যের সম্ভাবনায় আমোদিত। খাওয়া... ক্ষুধার তৃপ্তির আনন্দ...কি সুবিপুল তার উল্লাস আর আগ্রহ! সারা-দিনের ক্লান্তির পর, ঘরের স্নিগ্ধ উত্তাপ...পরিচিত কণ্ঠের সান্নিধ্য... আমেজ আনিয়া দেয় দেহে। প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহ উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, চারিদিকে পরিচিত আলো আর ছায়া।...সামনের টেবিলের আলোর আচ্ছাদনী, অগ্নিকুণ্ডে তারার ফুলঝুরি ছড়াইয়া শত-শিখায় নাচিতেছে যে আগুন, সব যেন মনে হয় আনন্দের মায়া-মূর্তি। জাঁ-ক্রিস্তফ সন্তর্পণে ঠোঁটের কাছে প্লেট তুলিয়া লয়...সব আনন্দের স্বাদ যেন একসঙ্গে সেই প্লেটে আসিয়া জমা হইয়াছে...। তারপর... শয্যা, স্নিগ্ধ সুকোমল। কখন কি করিয়া সে শয্যায় আসিল? শ্রান্তিতে ভরিয়া আসে দেহ। কানে আসে কথাবার্তার মৃদু শব্দ... তাহার সহিত মনে মিশিয়া যায় বিদায়-দিবসের স্মৃতি। তাহার পিতা বেহালা লইয়া বাজাইতে সুরু করে। তীব্র মধুর সুর যেন রাত্রির আকাশে অন্তরের বেদনা জানাইতে বাহির হয়। অবশেষে দিবসের সর্বোত্তম আনন্দরূপে আসে জননী, তাহার পার্শ্বে বসিয়া নিজের কোলের মধ্যে তাহার হাত দুটি টানিয়া লয়। তন্দ্রায় চোখ ভারি হইয়া আসে। মাকে অনুরোধ করে গাহিবার জন্য; পুরানো গান, তাহার ভাষার কোন অর্থই তাহার কাছে থাকে না, শুধু তাহার সুর তাহার তন্দ্রাকে নিবিড় করিয়া তোলে। তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অতি মৃদু স্বরে লুইসা গাহিতে থাকে। কিন্তু সে-সঙ্গীত শুনিয়া তাহার পিতা বিরক্ত হয়, তাহার নিকট সে-সঙ্গীত সেকেলে অপদার্থ, কিন্তু

জাঁ-ক্রিস্‌তফের শুনিতে ক্লান্তি লাগে না। নিশ্বাস রোধ করিয়া হাসি-কান্নার মাঝখানে যেন সে দুলিতে থাকে। ভুলিয়া যায়, সে কোথায় রহিয়াছে, কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধ করুণা যেন তাহার ভিতর হইতে উথলিয়া উঠিতে থাকে। দুটি ছোট হাতে জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরে। হাসিয়া জননী বলিয়া ওঠে: 'ওরে পাগল, গলা টিপে মেরে ফেলবি নাকি?'

তবু আরো নিবিড়ভাবে সে আঁকড়াইয়া ধরে। কতখানি যে সে ভালবাসে তার জননীকে কেমন করিয়া সে জানাইবে? এমনি নিবিড়-ভাবে সে ভালবাসে সবাইকে...সকলকে...সব কিছুকে! সব কিছুই ভাল এই পৃথিবীতে, সুন্দর সব কিছুই এই পৃথিবীর!...ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে। বাহিরে প্রাঙ্গণে ঝিঁঝিরা ডাকিতে থাকে। রাত্রির তন্দ্রাতরঙ্গে ভাসিয়া আসে ঠাকুরদার মুখে-শোনা সব কাহিনী, জাগিয়া ওঠে সেই সব কাহিনীর বীর নায়কেরা...যদি সেই বীরদের মতন বীর সে হইতে পারে! নিশ্চয়ই, সে তাহাদের মতন হইবে... ভাবিতে ভাবিতে, কল্পনা আর সত্য কখন এক হইয়া যায়...সে তখন তাহাদেরই মতন বীর হইয়া ওঠে।...কি আনন্দ শুধু বাঁচিয়া থাকায়!

কি প্রাচুর্য, কি শক্তি, কি আনন্দ সেই ক্ষুদ্র শিশুর দেহে! প্রতি মুহূর্তে সে যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। প্রাণ-শক্তির কি উচ্ছল অতিরিক্ততা! এক মুহূর্তের জন্যও দেহ ও মনের গতির বিরাম নাই, নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে চলিয়াছে সে-গতি। অষ্ট-প্রহর জীবন-শিখাকে বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত নাচিয়া চলিয়াছে একটা ক্লান্তিহীন অনির্বান উৎসাহ...জগতে যাহা কিছু আছে সবই তাহার প্রয়োজন। জীবন যেন একটা মধুর স্বপ্ন, কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিনী, অনন্ত আশার অনাদি ভান্ডার, একটা হাসি, একটা গান, বিরাম-বিহীন একটা মাদকতা। জীবন তাহাকে এখনও বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্বদাই সে বন্ধনকে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিয়াছে। ভাসিয়া চলিয়াছে অনন্তের বুকে। কি আনন্দ! আনন্দের জন্যই সে আসিয়াছে! তাহার সত্বার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা সে-আনন্দকে অস্বীকার করিতে পারে! সব শক্তি, সব অনুরাগ দিয়া তাহাকেই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে!

জীবন কিন্তু তাহা সহ্য করিবে না...তাহার নিষ্ঠুর বাস্তবতা দিয়া একদা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবেই...

[দুই]

ক্রাফটরা মূলত এণ্টওয়ার্প সহর হইতে আসিয়াছিল। প্রথম জীবনে জাঁ-মিচেল নাকি দুরন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন। বালককালের খেয়ালের বসে তিনি নিদারুণ এক কলহে জড়াইয়া পড়েন এবং তাহারই পরিণাম-স্বরূপ জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। বর্তমানে যে ক্ষুদ্র শহরটিতে তাঁহারা বসবাস করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রতিভাবান সংগীত-শিল্পীরূপে সেই সংগীতের দেশে আসিয়া তিনি অচিরকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিবাহের মধ্য দিয়া সেই শহরের সংগে তাঁহার সম্পর্ক আরো দৃঢ়মূল হইয়া যায়...প্রিন্সের অর্কেষ্ট্রার প্রধান পরি-চালকের কন্যা ক্লারা সারটোরিয়াসের সহিত চল্লিশ বৎসর আগে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কালক্রমে শ্বশুরের সেই পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হন। সাধারণ জার্মান মেয়ের মতন শান্ত-প্রকৃতি ক্লারার জীবনে দুটি মাত্র আকর্ষণের বস্তু ছিল, রান্না ও সংগীত। স্বামীর প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল একমাত্র তাঁহার পিতাই অনুরূপ শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারিতেন। জাঁ-মিচেলও পত্নীকে কম শ্রদ্ধা করিতেন না। পনেরো বৎসর কাল ধরিয়া তিনি দাম্পত্য জীবন যাপন করেন পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে এবং তাহার ফলস্বরপ চারটি সন্তান তাঁহার ঘরে আগমন করে। তারপর যখন ক্লারা পরলোক গমন করিল, জাঁ-মিচেল শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তাহার পাঁচ মাস পরেই পুন-রায় ওটিলিয়া স্কুজ্‌কে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন—হাস্যময়ী পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী রক্তিমাননা বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। এই বিবাহের আট বৎসর পরে ওটিলিয়াও প্রথমা স্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তিনি সাতটি সন্তান উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। জাঁ-মিচেলের সর্বশুদ্ধ এগারোটি সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র জীবিত রহিল। প্রত্যেক সন্তানটিকেই বৃদ্ধ প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিতেন, কিন্তু উপর্যুপরি এই সব মৃত্যুবেদনা তাঁহার চরিত্রের সরসতাকে শুষ্ক করিয়া দিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে বেশী আঘাত পান, তিন বৎসর পূর্বে যখন ওটিলিয়া তাঁহার পাশ হইতে সরিয়া গেলেন...সে-বয়সে আর নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করা যায় না, নূতন করিয়া ঘর বাঁধা আর চলে না। কিছুকালের মত বৃদ্ধের মন একেবারে এলোমেলো

হইয়া গেল, কিন্তু বহু চেষ্টায় তিনি সে-আঘাতও কোন রকমে সামলাইয়া উঠিলেন। কোন দুঃখই সে-অন্তরের স্থৈর্যকে নষ্ট করিতে পারে না।

স্বভাবতই তিনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য। কোন বিপদই তাঁহার দেহকে স্পর্শ করিতে পারিত না, ফ্লেমিশ্ চরিত্রের ধারা অনুযায়ী সর্বদাই তিনি আনন্দের, বিরাট বিপুল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন...মুখেতে সর্বদাই ফুটিয়া থাকিত সুবিপুল হাস্য, শিশুর মত সহজ, সরল। যে-দুঃখ যে-বেদনাই আসুক না কেন, তাহার জন্য তাঁহার পান-পাত্রে কোনদিন একবিন্দু সুরা কম থাকিত না, টেবিলে এক টুকরা খাদ্যও ফেলিয়া রাখিতেন না, একদিনের জন্যও তাঁহার পরিচালিত ব্যাণ্ডের বাজনা থামে নাই। তাঁহার পরিচালনায় সেই রাইন-অঞ্চলের দরবারি-অর্কেষ্ট্রা রীতিমত খ্যাতি অর্জন করে। সেই সুগঠিত দেহ আর তাহার অন্তরালে সুবিপুল দুর্জয় ক্রোধের অগ্ন্যুদ্গারের জন্য সেই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তিনি লোকোত্তর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জাঁ-মিচেল তাঁহার সেই দুর্জয় ক্রোধ সংযত করিতে পারেন নাই। কোন কিছুরই সহিত আপোষ করিতে তিনি চাহিতেন না, তাই সর্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন, বুঝিবা কখন কোন কিছুর সহিত আপোষ করিয়া ফেলেন। অবশ্য, সৌজন্য এবং ব্যবহারিক ভব্যতা সম্বন্ধে তিনি একান্ত সজাগ হইয়াই থাকিতেন। জনমতকে ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু তবুও রক্তের মধ্যে সহসা যখন বান ডাকিত নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। তখন যাহা সামনে পড়িত, তাহাতেই ক্ষেপিয়া উঠিতেন। কোথা হইতে মাঝে মাঝে অধীর অন্ধ এক ক্রোধের ভূত ঘাড়ে আসিয়া চাপিত, তখন শুধু রিহার্সালের সময় নয়, স্বয়ং প্রিন্সের উপস্থিতিতে কন্সার্ট বাজাইবার সময়ও হাতের পরিচালনা-দণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন, ভূতে-পাওয়া লোকের মত মাটিতে পা ঠুকিয়া যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন তাহাকে নাম ধরিয়া তীব্র কম্পিত কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিতেন। প্রিন্স মজা দেখিতেন কিন্তু যে আর্টিষ্টের উপর ক্রোধ বর্ষিত হইত, স্বভাবতই সে মনে মনে বিরূপ হইয়া উঠিত। পরমুহূর্তেই নিজের অসংযত ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িতেন এবং তখন অতিরিক্ত ভব্যতার আতিশয্যে তাহাকে ধামা চাপা দিবার বৃথাই চেষ্টা করিতেন। আবার কয়েক-

দিন পরেই ঠিক সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিত এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উদগ্র অসহ্যতা ক্রমশ আরো উদগ্র হইয়াই উঠিল, ফলে তাঁহার চাকরী বজায় রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা যে ক্রমশ কুৎসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তিনি নিজেও উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহার এই অগ্নুদ্গারের প্রতিবাদে অর্কেষ্ট্রার শিল্পীরা যখন ধর্মঘট করিবার আয়োজন করিতেছিল, সেই সময় তিনি নিজেই পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া বসিলেন।

মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার এতদিনের অকুণ্ঠ শিল্প-সেবার কথা স্মরণ করিয়া হয়ত তাহারা এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতে চাহিবে না এবং তাঁহাকে থাকিয়া যাইবার জন্যই অনুরোধ করিবে। কিন্তু সে-জাতীয় কোন ব্যাপারই ঘটিল না। তাঁহার দিক হইতেও উপযাজক হইয়া সেই পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে তাঁহার গর্ব-বোধে আঘাত লাগিল। সুতরাং ভগ্ন-হৃদয়ে তাঁহাকে সরিয়াই আসিতে হইল এবং মানুষের অকৃতজ্ঞতায় একাই শুধু কাঁদিয়া অন্তরকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু সেই দিন হইতে তিনি সত্যই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, সারাটি দিনকে কি করিয়া ভরাট করিয়া তুলিবেন, তাহার চিন্তায়। যদিও সত্তর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন তবুও তাঁহার উৎসাহ এবং কর্মশক্তি তেমনি অটুট ছিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া, আলোচনা-সভায় তর্ক-বিতর্ক করা, যেখানে যাহা কিছুতেই মাথা গলাইতে পারেন তাহাতেই জুটিয়া পড়া, এবং তাহার দরুণ নিত্য হাঁটাহাঁটি করার মধ্যে কোন ক্লান্তিই বোধ করিতেন না। মস্তিষ্ক তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সজাগ হইয়াই ছিল, তাই নানা ব্যাপারে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। বাদ্য-যন্ত্র সারাইবার কাজ লইলেন; সারাইতে সারাইতে পুরাতন বাদ্য-যন্ত্রে নূতন কোন অংশ জোড়া যায় কি না, তাহা লইয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেন, কখনও কখন কৃতকার্যও হন। অবসরে সংগীত-রচনাও করিতেন এবং সে-সব রচনা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতেন। 'মিস্সা শোলেনিস্' নামে একবার বহু চেষ্টা চরিত্রের পর একটি পুরা সংগীত রচনা করেন। এই সংগীত রচনায় এত বেশী মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাঁহার শরীর প্রায় ভাঙিয়া পড়ে। প্রথম প্রথম এই বিশেষ রচনাটি সম্বন্ধে আনন্দে এবং গর্বে সকলের কাছেই উল্লেখ করিয়া

বেড়াইতেন, তাঁহার বংশের এক গৌরব-সৃষ্টি। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে সেই রচনার শূন্য-প্রাণ তাঁহার নিজের কাছেই প্রকট হইয়া উঠিল, নিদারুণ বেদনায় তিনি দেখিলেন তাঁহার অজ্ঞাতে তিনি শুধু প্রাচীন সংগীত হইতে টুকরা টুকরা অংশ লইয়া, কোন রকমে প্রাণহীন একটা নতুন দেহ গড়িয়া তুলিয়াছেন। যাহাকে তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রেরণার সৃষ্টি মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপরের পরিত্যক্ত বসনের টুকরা মাত্র। তাই ইদানীং সেই রচনার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই ব্যথিত হইয়া উঠিতেন। তবুও মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তস্তল হইতে জাগিয়া উঠিত প্রবল এক দুরাশা। সেই দুরাশায় প্রণোদিত হইয়া ভাবিতেন তাঁহার মনে যে-সব সংগীত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অপূর্ব তাহাদের সম্ভাবনা। আবেগ-কম্পিত দেহে তাড়াতাড়ি টেবিলে গিয়া বসিতেন। নিশ্চয়ই এবারের প্রেরণা তাঁহাকে আর প্রতারণা করিয়া যাইতে পারিবে না! কিন্তু কলম লইয়া লিখিতে গিয়া দেখেন, অন্তরের আবেগ শুধু অন্তরেই ধোঁয়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নীরন্ধ্র নীরবতায় তিনি একলা শুধু বসিয়া আছেন, অন্তরে যে-সংগীত জাগিয়া উঠিয়াছিল, কোথায় নিমেষের মধ্যে তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাদের বাণীরূপ দিতে গিয়া দেখেন, শুধু কানে আসিয়া বাজিতেছে অতি-পরিচিত সেই পুরাতন 'মেণ্ডেল্‌সন' আর 'ব্রাহ্‌ম্‌স'-এর সুরই...

জর্জ সাঁ বলেন: 'জগতে এক শ্রেণীর হতভাগ্য প্রতিভাধরেরা জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের প্রতিভা থাকে, কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। সেই অপ্রকাশের বেদনাকে সারাজীবন বহন ক'রে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান।' বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল সেই হতভাগ্যদেরই একজন ছিলেন। শুধু যে অন্তরের সংগীতকেই বাহিরে রূপ দিতে পারেন নাই, তাহা নয়, অন্তরের বহু ভাবনাকেও তেমনি পারেন নাই বাণীরূপ দিতে, কিন্তু নিজের কাছে সে-কথা স্বীকার করিতে চাহিতেন না। সেখানে নিজেকে নিত্য প্রবঞ্চনা করিয়া চলিতেন। কি বিপুল আশাই না তাঁহার ছিল কথা বলিতে—যে-কথা মানুষ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে; কত সাধই না ছিল অন্তরের ভাবনাকে লেখায় অমর করিয়া রাখিবেন...সংগীতে, বক্তৃতায় দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিবেন! অন্তরের সংগোপনলোকে এই ব্যর্থ-বাসনার দল আজ শুধু দুষ্ট ক্ষতের মতন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াই চলিয়াছে।

কিন্তু কাহারও নিকট সেকথা প্রকাশ করিয়া বলিতেন না, এমন কি নিজের কাছেও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেন। চেষ্টা করিতেন, যাহাতে সেই ব্যর্থ আশার চিন্তা মনে উদিতই না হয়। কিন্তু হায়! শত চেষ্টা সত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারে সেই সব কথাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেন। এইভাবে অন্তরের অন্তস্তলে নিজের মরণের সিংহাসন সংগোপনে নিজেই বহন করিয়া ফিরিতেন।

হতভাগ্য বৃদ্ধ! জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তিনি নিজের সংগোপন সত্বাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কত না সৌন্দর্যের, কত না সম্ভাবনার বীজ অন্তরে লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একটিতেও ফল ধরিল না। আর্টের মহিমা সম্বন্ধে গভীরতম সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহার মধ্যে ছিল, জীবনের নৈতিক মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা তাঁহার রক্তের সহিত মিশিয়া ছিল, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেইসব ধারণাকে বাস্তবতায় অনুবাদ করিতে গিয়া এক হাস্যকর বিপর্যয় ঘটাইয়া তুলিতেন। অন্তরে যার গর্বোন্নত দিব্য মহিমা, বাহিরে সে ক্রীতদাসের মতন পদ ও পদবীকে মাথা নত করিয়া অতি-সম্মান দেখাইয়া তৃপ্ত রহিত! অন্তরে স্বাধীনতার সুতীব্র পিপাসা, বাহিরে অনর্থক দীনতা, শুধু আত্মশক্তির অভিনয়, প্রত্যেক কুসংস্কারের কাছে অসহায় আত্মবলিদান! অনাবিল সৌন্দর্যের জন্য অন্তরে নিত্য ওঠে সামগান কিন্তু বাহিরে কার্যক্ষেত্রে তাঁহাকে করিতে হয় কদর্যতার সহিত নিত্য ভীরু আপোষ! পথে পা দিতে না দিতে বন্ধ হইয়া যায় পথ-চলা।

তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ বাসনা, জাঁ-মিচেল পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রথম প্রথম এমন আশাও হইত যে মেলশিয়র বুঝি তাহাদের চরিতার্থ করিয়া তুলিবে। শৈশব হইতেই তাহার মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। যাহা কিছু সে শুনিত বা দেখিত, অবলীলাক্রমে তাহা তুলিয়া লইত এবং অতি অল্প বয়সেই বেহালা-বাদকরূপে সে এমন সম্মোহনের সৃষ্টি করিল যে বহুকাল ধরিয়া সে দরবারের কনসার্ট দলের মধ্য-মণি হইয়া রহিত। পিয়ানো এবং অন্যান্য বাজনাও চমৎকার বাজাইত। কথক হিসাবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিল। যদিও একটু ভারি দেখাইত, তবুও চমৎকার সুগঠিত ছিল তাহার দেহ; যে-ধরণের দেহকে জার্মানরা ক্লাসিক সৌন্দর্যের প্রতীক বিবেচনা করে, মেলশিয়রের সৌভাগ্য যে সেই অপরূপ দেহ-গঠনের অধিকারী সে হইয়াছিল। সমুন্নত প্রশস্ত ললাট, যদিও তাহার মধ্যে

বিশেষ কোন আলোক-ব্যঞ্জনা ছিল না, মুখ-রেখা সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়, কুঞ্চিত কেশদাম, যেন রাইন নদীর দেশের জুপিটার। পুত্রের কৃতিত্বে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল পরম গর্বই উপভোগ করিতেন; যখন ভায়োলিনে মেলশিয়র তাহার সুরের যাদু জাগাইয়া তুলিত, বৃদ্ধ প্রশংসায় আত্ম-হারা হইয়া যাইতেন, বৃদ্ধ নিজে কোনদিন সার্থক ভাবে কোন যন্ত্রেই এমন করিয়া নিজেকে জাগাইতে পারেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তখন মনে হইত মেলশিয়রের হাতের ছড়ি যেন অন্তরের যে-কোন ভাবনাকেই রূপ দিতে পারে, কিন্তু বিপদ হইল, তাহার অন্তরে সে-রকম কোন মহৎ ভাবনাই ছিল না। এবং তাহার জন্য তাহার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তাও ছিল না। সমস্ত নিপুণতা সত্বেও তাহার অন্তর ছিল সাধারণ কমিক অভিনেতার অন্তরের মতন, যে শুধু প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীকেই দুরস্ত করে, সে-ভঙ্গীর আড়ালে বক্তব্য কি রহিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবার কোন প্রবৃত্তিই যাহার থাকে না, অথচ উদ্বেগ-আকুল দম্ভে যে শ্রোতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে নিজের অভিনয়ের অনুমোদনের আশায়।

নিজের শিল্প-জীবন সম্বন্ধে সর্বদা উদ্বেগ-আকুল হইয়া থাকা সত্বেও, মেলশিয়র প্রচলিত রীতি-নীতি সম্বন্ধে জাঁ-মিচেলের মতই এক ভীরু শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করিত। আর এক জায়গায় তাহাদের পিতা-পুত্রে বিশেষ মিল ছিল। তাহাদের উভয়ের চরিত্রে এমন একটা আক-স্মিকতা এবং এলোমেলো ভাব ছিল যে লোকে বলিত, ক্রাফটরা স্বভাবতই একটু ছিট-গ্রস্ত। প্রথম প্রথম তাহাতে মেলশিয়রের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ এই সমস্ত বাতিক প্রতিভারই লক্ষণ স্বরূপ, এই রকম একটা ধারণা তাহার মনের আড়ালে কাজ করিত। কিন্তু বেশী দিন লাগিল না, লোকে তাহার এই সব উদ্ভট আকস্মিকতার উৎস-মুখের সন্ধান পাইয়া গেল, সে-উৎস হইল মদের বোতল...দার্শনিক নীট্শে বলিয়া গিয়াছেন, সুরার দেবতা বাক্কাস্ সঙ্গীতেরও অধি-দেবতা... মেলশিয়রও অন্তরের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায় তাহাই বিশ্বাস করিত। কিন্তু বরাতক্রমে তাহার দেবতাটি ভক্তের প্রতি অতি অকরুণ ব্যবহারই করিলেন,—ভক্তের অন্তরে যে ভাব-শক্তির অভাব ছিল, তাহা পরিপূরণ করা দূরে থাক, সেখানে যতটুকু যাহা পড়িয়াছিল, তাহাও নিঃশেষে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। তাহার অসম্ভব বিবাহ-কাণ্ডের পর, অবশ্য বাইরের লোকের ধারণায় তাহা অসম্ভব মনে হইয়াছিল

বলিয়াই সে-ও অসম্ভব মনে করিয়া লইয়াছিল, সে আরো বেশী করিয়া তাহার ইষ্ট-দেবতার শরণাপন্ন হইল। ফলে বেহালা বাজানো সম্পর্কে রীতিমত অবহেলা করিতে লাগিল। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাহার এমন অভ্রান্ত দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে কখন সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল, জানিতেও পারিল না। তাহার স্থলে জনতার অন্তরে বেহালা হাতে প্রধান-তন্ত্রী হিসাবে অন্য বাদক আসিয়া দাঁড়াইল। যখন সে বুঝিতে পারিল, তখন তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার বদলে এই সব আঘাতে সে নিজেকে আরো নিরুদ্যম করিয়া তুলিল। সুরার মজলিসে সুরা-সঙ্গীদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়াই নিজের কর্তব্য পালন করিল। আত্ম-ক্ষয়ী অসম্ভব দম্ভে সে মনে করিয়া লইয়াছিল সঙ্গীত-পরিচালকের পদ পিতার পর উত্তরাধিকারসূত্রে নিশ্চয়ই সে পাইবে। কিন্তু পাইল অন্য লোক। সে মনে করিল, জগৎ তাহার প্রতিভা না বুঝিয়া তাহাকে নির্যাতিত করিল। এমনিধারা বহু প্রতিভাকেই তো জগৎ বুঝিতে না পারিয়া অবহেলা করিয়াছে। সৌভাগ্যবশত বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলকে লোকে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া মেলশিয়রকে অর্কেষ্ট্রা হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইল না, সামান্য বেহালা-বাদকরূপে সে রহিয়া গেল, কিন্তু যে-সব ছাত্র-ছাত্রী জুটিয়াছিল, তাহারা সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। শেষোক্ত আঘাতেই তাহার দম্ভ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বেশী ক্ষতি হইল তাহার পকেটের। ক্রমান্বয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে তাহার অর্থ-ভাগ্যও ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। একদিন প্রাচুর্য যে দেখিয়াছে, দারিদ্র্য তাহার নিকট আরো ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মেলশিয়র প্রতিজ্ঞা করিল, সে-দিকে সে ফিরিয়াও চাহিবে না। তাহার ব্যক্তিগত সুখের কিম্বা প্রয়োজনের জন্য একটি কপর্দকও কম খরচ করিতে সে পারিল না।

মন্দ লোক বলিতে যাহা বুঝায়, মেলশিয়রকে ঠিক তাহা বলা যায় না। সে যে একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক ছিল, তাহাও নয়। পুরাপুরি আত্মকেন্দ্রিক হইতে হইলে যে-অনুপাতে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তাহা তাহার ছিল না। তাহার চরিত্রের জমার ঘরে ছিল বৃহৎ একটা শূন্য। তাই ভাল বা মন্দ, সে কিছুই হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইভাবে যাহারা কিছুই হইয়া উঠিতে পারে না, জীবনে তাহারাই ভয়ংকর হইয়া ওঠে। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ ভারের মতন তাহারা সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায়

এবং পড়িয়া তাহারা যাইবেই। এবং সেই পতনের সঙ্গে তাহারা, তাহাদের সঙ্গে যাহারা থাকে, তাহাদেরও টানিয়া লইয়া পড়ে।

যখন সংসারের নিম্নগামী গতি চরম সংকটের মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বালক জাঁ-ক্রিস্তফ একটু একটু করিয়া বুঝিতে শিখিল, তাহার চারিদিকে কি হইতেছে।

সংসারে সে তখন আর একমাত্র সন্তান নয়। প্রত্যেক বৎসরে মেলশিয়র স্ত্রীকে একটি করিয়া নূতন সন্তান উপহার দিয়া আসিতেছিল, ভবিষ্যতে তাহাদের কি হইবে সে-সম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তাই ছিল না। দুইজন ইতিমধ্যেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। অবশিষ্ট আর দুইজনের মধ্যে একজনের বয়স তিন, অপরের চার। তাহাদের সম্বন্ধে মেলশিয়র কোনদিনই মাথা ঘামাইত না। যখন লুইসাকে বাহিরে যাইতে হইত, বাড়ীতে তখন তাহাদের জাঁ-ক্রিস্তফের জিম্মায় রাখিয়া যাইত। জাঁ-ক্রিস্তফের বয়স তখন ছয় বৎসর।

এই নূতন দায়িত্ব পালনের জন্য জাঁ-ক্রিস্তফকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত; কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মুক্ত মাঠের মধ্যে অপরূপ অপরাহ্নগুলি তাহাকে বিসর্জন দিতে হইত। কিন্তু আর একদিক দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত। সে যে দায়িত্ব-গ্রহণের যোগ্য বড় হইয়াছে, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রীতিমত গর্ব অনুভব করিত এবং যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সে তাহার কর্তব্য পালন করিত। নিজের খেলার সাজসরঞ্জাম দেখাইয়া যতদূর সম্ভব সে তাহার শাসনাধীন শিশুদের ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত; তাহার মাতাকে যে-ভাবে, যে-ভাষায় আদর করিতে সে শুনিয়াছিল, ঠিক সেইভাবে সে সর্ব-কনিষ্ঠের সহিত কথা বলিত। কখনও বা তাহার জননীর দেখা দেখি তাহাদের দুইজনকেই একসঙ্গে কোলে লইবার বৃথা চেষ্টা করিত। ভারে তাহার দেহ ঝুঁকিয়া পড়িত, দাঁতে দাঁত চাপিয়া শিশুদের আঁকড়াইয়া ধরিত, যাহাতে পড়িয়া না যায়। শিশুরাও কোলে চড়িয়া থাকিবার বায়না ধরিত; জাঁ-ক্রিস্তফ যখন অবসন্ন হইয়া নামাইয়া দিতে বাধ্য হইত, তখন তাহারা প্রতিবাদে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিত। কাঁদিতে আরম্ভ করিলে থামিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। তখন জাঁ-ক্রিস্তফ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িত। সারা গা তাহাদের ধূলায়, ময়লায় নোংরা হইয়া যাইত। মা না আসিলে তাহাদের পরিষ্কার করিয়া দিবে কে? কি করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার সেই বিভ্রান্তির

সুযোগ লইতে শিশুরা ভুলিত না। তখন রাগে ইচ্ছা করিত, গালে দুই চড় বসাইয়া দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞের মত ভাবিয়া লইত, তাহারা শিশু, তাহারা তো ভালমন্দ কিছু জানে না। সুতরাং তাহাকেই মহানুভব হইতে হইত, তাহারা সচ্ছন্দে চিমটি কাটিত, প্রহার করিত, যত রকমে পারে তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। গম্ভীরভাবে তাহাকে সমস্তই সহ্য করিতে হইত। দুই ভাইয়ের মধ্যে আর্ণেষ্টটি ছিল বেশী দুষ্টু। অত্যন্ত বায়নাদার ছেলে, তাই লুইসা জাঁ-ক্রিস্তফকে সাবধান করিয়া দিয়া যাইত, যেন সে অর্ণেষ্টের বায়নাতে প্রতিবাদ না করে। আর অন্যটি, রুডল্ফ, ঠিক বানরের মত ছিল হিংসুটে। জাঁ-ক্রিস্তফ যখন আর্ণেষ্টকে কোলে লইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিত তখন সে সেই সুযোগে তাহার পশ্চাতে যাহা খুশি তাহাই করিত ; খেলনা ভাঙিত, জল ছড়াইয়া ফেলিয়া দিত, জামা-ইজার নোংরা করিত, কাপ-ডিস টানিয়া তছনছ করিত!

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লুইসা যখন সেই বিপর্যয় কাণ্ড দেখিত, ভর্ৎসনা করিত না বটে, তবে প্রশংসাও করিত না; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিত: 'তুই দেখছি বাছা, কোন কাজের নস্!' জাঁ-ক্রিস্তফ মনে মনে দুঃখিতই হইত, অভিমানে অন্তর ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিত।

যখনি দুই-এক পয়সা বাড়তি উপার্জনের কোন সুযোগ মিলিত, যেমন কোন বিবাহ বা কোন ধর্ম-সংক্রান্ত উৎসবে রান্না-বান্না করা, লুইসা তাহা ছাড়িয়া দিত না। নিজের দম্ভে আঘাত লাগিবে বলিয়া মেলশিয়র এমন একটা ভঙ্গী করিত যে, যেন এসব ব্যাপারের সে কিছুই জানে না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত লুইসার এইসব ব্যাপার লইয়া সে মাথা ঘামাইত না। জীবনের দুঃখ-বেদনার সমস্যা সম্পর্কে জাঁ-ক্রিস্তফের কোন ধারণাই তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। পিতা-মাতার নিষেধ ছাড়া, জীবনের যে আর কোন নিষেধ থাকিতে পারে সে তাহা জানে না। তাহার পিতামাতাও তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় বিশেষ কোন বাধাই দিত না, তাহার খুশিমত অল্প-বিস্তর সে সব কিছুই করিতে পাইত। তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কোনরকমে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া, যাহাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত সব কাজ করিতে পারে। পথের প্রত্যেক বাঁকে যে বিঘ্ন দাঁড়াইয়া আছে, সে-সংবাদ তখন সে আদৌ জানিত না; সে জানিত, তাহার পিতা-মাতা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অন্য কাহারও ইচ্ছার দাসত্ব যে তাহাদের করিতে হয়,

সে-ধারণাই তাহার ছিল না। যেদিন সে প্রথম জানিতে পারিল যে, মনুষ্য-সমাজে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণী আদেশ করে, আর এক শ্রেণীকে সেই আদেশ মানিয়া চলিতে হয়, তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এবং চরম বেদনায় তাহার অন্তর ভাঙিয়া পড়িল যখন সে জানিতে পারিল যে তাহার পিতামাতা সেই দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এই অভিজ্ঞানই তাহার জীবনের সর্ব-প্রথম বেদনারূপে দেখা দিল।

একদিন অপরাহ্ণে ব্যাপারটা তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কতকগুলি পুরানো পোষাক কাটিয়া ছাটিয়া লুইসা জাঁ-ক্রিস্তফের জন্য একটা পোষাক তৈয়ারী করিয়াছিল। সেদিন সেই পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া জাঁ-ক্রিস্তফ জননীর নির্দেশ মত, যেখানে লুইসা কাজ করিত, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। একা একা। সেই অজানা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। সামনেই উঠানের এক-ধারে দ্বাররক্ষী পাহারা দিতেছিল। বালককে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহাকে থামিতে আদেশ করিল এবং গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে কেন এইভাবে বাড়ীর ভিতরে যাইতেছে। লজ্জায় জাঁ-ক্রিস্তফের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার জননীর নির্দেশ মত সে উত্তর দিল, সে ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে!

'ফ্র' কথাটার উপর জোর দিয়া দ্বাররক্ষী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল : 'ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে! তা ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে কি দরকার? ওহ্! বুঝেছি ...তোমার মা! তা ঐ নীচে দিয়ে যাও...সোজা গেলে রান্নাঘর পড়বে, সেখানে লুইসা আছে!'

আরক্তিম মুখে জাঁ-ক্রিস্তফ সেইদিকে আগাইয়া চলে। বাহিরের একজন লোক এই রকম তাচ্ছিল্যভরে যে তাহার জননীকে নাম ধরিয়া উল্লেখ করিল, ভাবিতেই সে মর্মাহত হইয়া পড়ে। তীব্র লাঞ্ছনার মত তাহা তাহার অন্তরে গিয়া বেঁধে। মনে হইল, তৎক্ষণাৎ যেন সে এখান হইতে তাহার সেই একান্ত-প্রিয় নির্জন নদীর ধারে, লতা-গুল্মের আড়ালে, যেখানে বসিয়া সে নিত্য নিজেকে গল্প শোনায়, সেখানে ছুটিয়া চলিয়া যায়।

রান্নাঘরে গিয়া পেঁছাইতেই, অন্য সব চাকরেরা স-রবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল। ঘরের পেছন দিকে, ষ্টোভের কাছে, লুইসা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া বিব্রতভাবে মৃদু হাসিয়া উঠিল। ছুটিয়া

সে লুইসার বসন-প্রান্ত জড়াইয়া ধরিল। একটা সাদা বহিরাবরণ পরিয়া হাতে কাঠের একটা খুন্তি লইয়া লুইসা রন্ধনকার্যে ব্যস্ত ছিল। পুত্রের লজ্জিত অধোবদন লক্ষ্য করিয়া লুইসা থুত্‌নি ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিল; হাত বাড়াইয়া সকলের সঙ্গে করমর্দন করিবার জন্য তাহাকে আগাইয়া দিল; জাঁ-ক্রিস্‌তফ তাহাতে আরো বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই তাহা পারিবে না। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া নিজের হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া কৌতূহলী চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে গিয়া, অপরের চোখে চোখ পড়িতেই আবার মুখ ঘুরাইয়া লইল। জননীর দিকে চাহিয়া দেখে, ব্যস্ত আর গম্ভীর; জননীর এ-মূর্তি সে দেখে নাই। বিভিন্ন ষ্টোভে বিভিন্ন রান্না হইতেছে, লুইসা অনবরত এক কড়ার নিকট হইতে আর এক কড়ার নিকট আগাইয়া যাইতেছে, চাখিয়া দেখিতেছে, যেখানে মশলার যা অভাব হইতেছে, হাঁকিয়া তাহা পাচকদের বলিয়া দিতেছে, তাহারাও গম্ভীরভাবে সেই নির্দেশমত কাজ করিতেছে। জননীর সেই কর্মব্যস্ত মূর্তি দেখিয়া বালকের আহত অন্তর কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। সকলেই তাহার জননীর কথা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেছে, তাহার কথার এতখানি মূল্য অপরে দিতেছে। সেই সুসজ্জিত সুরম্য গৃহে অপরূপ সব স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন-পত্রের মধ্যে তাহার জননী যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বালকের আহত অন্তর গর্বে ফুলিয়া ওঠে। জননীর মর্যাদা সম্বন্ধে এই স্পষ্ট প্রমাণে সে আশ্বস্ত হয়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা থামিয়া যায়। বাহির হইতে দরজা খুলিয়া গেল। সজ্জাভারে ঝলমল করিতে করিতে একজন মহিলা প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। যদিও তাঁহাকে আর তরুণী বলা চলে না, কিন্তু তরুণীর মতনই হালকা ফাঁপানো পোষাকে সুসজ্জিতা। পাছে কোন জিনিসের সঙ্গে ঠেকিয়া যায়, সেইজন্য তিনি নিজেই পোষাকের প্রান্তভাগ হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই ভাবেই তিনি উনুনের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, প্রত্যেক কড়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন এবং কোনোটা হইতে ইচ্ছামত কিছু কিছু চাখিয়াও দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ হাত তুলিয়া কি বলিতে যাইবেন, জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিস্মিত হইয়া দেখিল, পোষাকের অন্তরালে তাঁহার বাহু-

মূল পর্যন্ত নগ্ন দেখা যাইতেছে। জাঁ-ক্রিস্তফের চোখে কুৎসিত এবং অশোভনী বোধ হইল। তাহার জননীর সঙ্গে কি রকম রুক্ষ্ম শুষ্কভাবে মহিলাটি কথা বলিতেছেন! লুইসাই বা অতখানি নত কণ্ঠস্বরে উত্তর দিতেছে কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই জাঁ-ক্রিস্তফের অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। পাছে দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে এক কোণে লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন লাভই হয় না। হঠাৎ মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন: 'ছেলেটি কে?' লুইসা কোণ হইতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত করে। পাছে অভদ্রের মত হাত দিয়া সে মুখ ঢাকিয়া ফেলে, সেই আশঙ্কায় জননী আগে হইতেই তাহার হাত ধরিয়া থাকে। জাঁ-ক্রিস্তফের মনের মধ্যে তখন তীব্র বাসনা হইতেছিল যে সে ছুটিয়া পালাইয়া যায়, কিন্তু আপনা থেকেই সে বুঝিল, এ-যাত্রা বাধা দেওয়া উচিত হইবে না। বালকের ভীত মুখের দিকে চাহিয়া মহিলাটি প্রথমে মাতৃ-স্নেহে মৃদু হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের সেই স্নিগ্ধ হাসি মিলাইয়া গেল, স্নেহের বদলে কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল অনুকম্পা। অনুকম্পাভরে বালককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। কিন্তু বালক কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। এমন সময় হঠাৎ বালকের পোষাকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। লুইসাকে জিজ্ঞাসা করেন: 'পোষাকটা ঠিক হয়েছে তো?' লুইসা তাড়াতাড়ি জানায়: 'চমৎকার হয়েছে।' জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হইয়া যায়। পোষাকটা এত আঁট হইয়াছিল যে জাঁ-ক্রিস্তফের প্রতিমুহূর্তে মনে হইতেছিল সে কাঁদিয়া প্রতিবাদ করে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তাহার জননী নিশ্চিন্তভাবে বলিল, চমৎকার হইয়াছে! আর তাহার পোষাকের জন্য সেই মহিলাটিকে এইভাবে ধন্যবাদ দিবারই বা মানে কি?

জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এমন সময় দেখে, মহিলাটি তাহার হাত ধরিয়া তাঁহার সহিত তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। যাইবার সময় লুইসার দিকে ফিরিয়া বলিলেন: 'বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বাগানে খেলা করছে...সেখানে খেলা করুকগে!' অসহায়ভাবে জাঁ-ক্রিস্তফ জননীর দিকে ফিরিয়া চায়। কিন্তু মহিলাটির দিকে চাহিয়া লুইসা যেভাবে আনন্দে ও আগ্রহে হাসিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া জাঁ-ক্রিস্তফের মনে বিন্দুমাত্র আর সন্দেহ রহিল না, যে এই নূতন অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জননীর নিকট কোন সাহায্যই সে পাইবে না। বলির পশু যেমন যূপকাষ্ঠের দিকে আগাইয়া চলিতে

বাধ্য হয়, জাঁ-ক্রিস্‌তফ তেমনিভাবে সেই মহিলাকে অনুসরণ করিয়া চলে।

মহিলাটি জাঁ-ক্রিস্‌তফের হাত ধরিয়া গৃহ-সংলগ্ন এক বাগানে লইয়া আসিলেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ দেখিল, তাহারই সমবয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বিষণ্ণ বিরক্ত মুখে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন এই মাত্র তাহাদের মধ্যে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। জাঁ-ক্রিস্‌তফের আগমনে তাহারা যেন মনকে জাগাইয়া তুলিবার খোরাক পাইয়া গেল। আগাইয়া আসিয়া নবাগতকে ভাল করিয়া একবার দৃষ্টি দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইল। মহিলাটি তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া গেলেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ সেইখানেই নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, প্রস্তর-স্থির, চোখ তুলিয়া দেখিবার সাহস পর্যন্ত যেন তাহার নাই। একেবারে সামনে না আসিয়া সেই ছেলেটি আর মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লইল, তারপর ঘাড় নাড়িয়া পরস্পর কি যেন পরামর্শ করিল। অবশেষে তাহারা যেন মত স্থির করিয়া ফেলিল। আর একটু আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার বাবা কি করেন, ইত্যাদি। জাঁ-ক্রিস্‌তফ তেমনি পাথরের মতন দাঁড়াইয়া থাকে, কোন জবাব দিতে পারে না। এক অজানা আশঙ্কায় তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হয়; বিশেষ করিয়া সেই কুঞ্চিত-কেশ স্কার্টপরা ছোট মেয়েটির ভঙ্গী দেখিয়া তাহার অস্বস্তি আরো বেশী বোধ হইতে থাকে।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর জাঁ-ক্রিস্‌তফ বহু চেষ্টায় সাহস করিয়া নিজেকে সহজ করিয়া লয়। এমন সময় ছেলেটি সোজা তাহার সামনে আসিয়া হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার গায়ের কোটের উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিয়া ওঠে : 'আরে, এ যে আমার কোট!'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার গায়ের জামা যে অপরের হইতে পারে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে। ঘাড় নাড়িয়া তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া ছেলেটি বলে : 'আলবৎ, এটা আমার কোট...আমি জোর ক'রে বলতে পারি, আমার সেই নীল রঙের পুরানো ওয়েস্ট কোটটা, এক-জায়গায় একটা দাগ পর্যন্ত আছে... এই যে...'

এই বলিয়া অবলীলাক্রমে সেই দাগটির উপর আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া

দিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফের সমস্ত পোষাক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে হাসিয়া ওঠে: 'বারে, বেশ তো! তালি-দেওয়া পুরানা জুতো...চামড়ার? না, কাগজের? কিসের তৈরী?'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ রাগে লাল হইয়া উঠিল। মেয়েটি ঠোঁট ফুলাইয়া তাহার ভাইয়ের কানে কানে কি যেন বলিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ শুধু শুনিতে পাইল: 'আহা, গরীব যে...'

জাঁ-ক্রিস্‌তফের মনে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া ওঠে। এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর হইবে মনে করিয়া, রাগে রুদ্ধকণ্ঠে সে ঘোষণা করে, মেলশিয়র ক্রাফ্‌টের পুত্র সে, তাহার জননী শ্রীমতী লুইসা, তাহাদেরই পাচিকা! তাহার ধারণায় যে-কোন সম্ভ্রান্ত কাজের মতন, পাচিকার কাজও রীতিমত সম্ভ্রান্ত ও উল্লেখযোগ্য! এবং তাহার এই ধারণার মধ্যে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু যাহাদের জন্য সে এই কথার উত্থাপন করিল, তাহারা সে-সংবাদে যেন আরো মজা পাইয়া গেল, এই মাতৃ-পরিচয়ের দরুণ বিশেষ কোন সম্ভ্রমের চোখে তাহাকে দেখার কোন আভাসই তাহাদের দুইজনের মধ্যে দেখা গেল না। পরিবর্তে তাহাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনুকম্পার সুর এবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ছেলেটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: 'তা, তুমি নিজে কি হবে মনে করেছ, পাচক না কোচোয়ান?' জাঁ-ক্রিস্‌তফের মনে হয়, তাহার ভেতরটা যেন বরফের মতন হিম হইয়া যাইতেছে।

সাধারণত ধনীর ঘরের আদুরে দুলালরা তাহাদের সমবয়সী দরিদ্র বালকদের উপর অহেতুক উৎপাত করিতে এবং অবজ্ঞায় নিষ্ঠুর আঘাত হানিতে রীতিমত একটা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। জাঁ-ক্রিস্‌তফকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আরো যেন মজা পাইয়া গেল। তাহাকে ক্ষেপাইয়া উত্তক্ত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বিশেষ করিয়া সেই ছোট্ট মেয়েটি। সে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে, জাঁ-ক্রিস্‌তফ কিছুতেই দৌড়াইতে পারিবে না, ঐ রকম আঁট পোষাকে কেহ দৌড়াইতে পারে? সেই সঙ্গে তাহার দুষ্ট বুদ্ধি জাগিল, জাঁ-ক্রিস্‌তফকে সে লাফাইতে বাধ্য করিবে। কতকগুলি কাঠ পাশাপাশি রাখিয়া, সে জাঁ-ক্রিস্‌তফকে ধরিয়া বসিল, লাফাইয়া পার হইতে হইবে। দেখিবে সে কত বড় ওস্তাদ! জাঁ-ক্রিস্‌তফ জানিত সেই আঁট পোষাকে লাফানো তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাহাদের সামনে তাহা স্বীকার করিতে আত্মসম্মানে বাধিল। তাই

প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংহত করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খাইয়া সটান মাটিতে পড়িয়া গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজনে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল। জাঁ-ক্রিস্তফ এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার সে চেষ্টা করিবে। দুই চোখ জলে টলটল করিতেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিয়া মরিয়া হইয়া আবার লাফাইল, এবং কৃতকার্য হইল। কিন্তু ইহাতেও তাহারা শাস্তিদাতারা তৃপ্ত হইতে পারিল না, বলিল, তেমন উঁচু তো ছিল না! আরো কাঠ আনিয়া এবার তাহারা এমন উঁচু করিল যে তাহা সত্যই অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। জাঁ-ক্রিস্তফ বিদ্রোহী হইয়া এবার জানাইয়া দিল, না, সে কিছুতেই লাফাইবে না। মেয়েটি বলিয়া উঠিল : 'দুয়ো, ভীরু...এতো ভীরু?' এ-অভিযোগ সহ্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে জানিত যে, সে পারিবে না, পড়িয়া যাইবে, তবুও সে লাফাইল এবং পড়িয়াও গেল। কাঠে পা আটকাইয়া গেল, সমস্ত কাঠ-গুলি গড়াইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িল। হাত ছড়িয়া গেল, মাথায় রীতিমত আঘাত লাগিল, সর্বোপরি, প্যান্টটি ছিঁড়িয়া ফাঁসিয়া গেল। লজ্জায় সে অবশ হইয়া পড়িল...শুনিতে লাগিল, তাহাকে ঘিরিয়া তাহারা দুইজনে করতালি দিয়া আনন্দে নাচিতেছে। মর্মান্তিক বেদনায় সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বুঝিল, তাহারা তাহাকে অপদার্থ, তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া মজা উপভোগ করিতেছে। কিন্তু কেন? কেন? সেই মুহূর্তে তাহার মনে হইতেছিল যেন সে মরিয়া যায়! যে-মুহূর্তে বালক সর্ব-প্রথম জীবনে জানিতে পারে যে জগতে অন্যায় বলিয়া কিছু আছে, সে-মুহূর্তে চেতনার যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন সে ভোগ করে, জগতে তাহার তুলনা নাই। তখন তাহার ধারণা হয় যে সমগ্র জগৎ যেন তাহাকেই নিপীড়ন করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে এবং সে-নিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। কেহ নাই, কিছু নাই...

জাঁ-ক্রিস্তফ মাটি হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহারা ঠেলিয়া আবার তাহাকে ফেলিয়া দেয়। মেয়েটি লাথি ছোঁড়ে, গায়ে লাগে। আবার উঠিতে চেষ্টা করিতেই, তাহারা দুইজনে লাফাইয়া তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসে এবং মাটিতে মুখ রগড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। এরপর আর সে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না...সহ্যের অতিরিক্ত ব্যাপার! হাত ছড়িয়া গিয়াছে, অমন সুন্দর কোটটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে—লজ্জা, বেদনা, অবিচারের বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশ, সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাকে

ক্রোধে উন্মত্ত করিয়া তোলে। হামাগুড়ি দিয়া সে নিজেকে ঠেলিয়া কোনরকমে দাঁড় করায়, ক্ষেপা কুকুরের মতন শাস্তিদাতাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দুইজনকেই মাটিতে টানিয়া ফেলিয়া দেয়। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা প্রতি-আক্রমণ করিতেই সে রুখিয়া দাঁড়াইল, মাথা নীচু করিয়া মেয়েটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সজোরে একটা ঘুসিতে ছেলেটিকে একেবারে ফলবাগানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

আহত হইয়া এইবার তাহারা দুজনে চিৎকার করিয়া ওঠে। চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে ছোটে। দুম্‌দাম্‌ করিয়া দরজা খোলার আওয়াজ হইল, রাগে কাহারা যেন চিৎকার করিয়া উঠিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ দেখিল আলুলায়িত পোষাক কোনরকমে সামলাইয়া সেই ভদ্রমহিলা তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। সে পালাইবার কোন চেষ্টাই করে না। যাহা সে করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য মনে মনে সে অবশ্য ভীতই হইয়াছিল। অন্যায়...ইহার পূর্বে আর কখনও সে করে নাই। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার জন্য তাহার কোন ক্ষোভও ছিল না।

ভদ্রমহিলা তাহার উপর যেন বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং কোন কথা না বলিয়াই প্রহার করিতে লাগিলেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফের কানে শুধু আসে, তাঁহার ক্রুদ্ধ গর্জন...গালাগালির বন্যা। কোন কথা আলাদা করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া সে বুঝিতে পারে না। রাগে ভদ্রমহিলার সমস্ত কথা জড়াইয়া যায়। তাহার ক্ষুদ্র শত্রুরাও সেই সঙ্গে ভদ্রমহিলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার পরাভবের লজ্জা স্বচক্ষে উপভোগ করিবার জন্য। বাড়ীর ভৃত্যরাও আসিয়াছে। চারিদিক হইতে বিভিন্ন কণ্ঠের আওয়াজ উঠিতেছে। তাহার পরাভবকে যেন সম্পূর্ণ করিবার জন্যই লুইসাও আসিল, তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, লুইসাও কোন কিছু না জানিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাকে সমর্থন করা দূরে থাকুক, তাহাকেই ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষমা চাহিতে আদেশ করিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ ক্রোধে তাহা অস্বীকার করিল। ক্ষমা সে চাহিবে না। হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লুইসা তাহাকে ভদ্রমহিলা আর সেই দুটি শিশুর সামনে আনিয়া ফেলিল এবং হুকুম করিল, নতজানু হইয়া ক্ষমা চাহিতে। রাগে আস্ফালন করিতে করিতে জাঁ-ক্রিস্‌তফ লুইসার হাত কামড়াইয়া দিল। কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া চাকরদের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। চাকররা হাসিয়া উঠিল।

জাঁ-ক্রিস্তফ ছুটিতে লাগিল...তাহার বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করিয়া যেন দুলিতেছিল...রাগে এবং সেই সঙ্গে যে-সব চপেটাঘাত ও ঘুসি তাহার সর্ব অঙ্গে পড়িয়াছিল, তাহার দরুণ তখনও তাহার মুখ ও দেহ জ্বালা করিতেছিল। চেষ্টা করিয়া মন হইতে সমস্ত চিন্তা সরাইয়া দিয়া, সে দ্রুত আরো দ্রুত ছুটিতে লাগিল, পাছে রাস্তার মধ্যে সে না কাঁদিয়া ফেলে। কোনরকমে সে এখন নিজের ঘরটিতে গিয়া পৌঁছাইতে চায়, সেখানকার নির্জনতায় অন্তত প্রাণ খুলিয়া সে কাঁদিতে পারিবে। ভিতর হইতে যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়া উঠিয়াছে, এখুনি হয়ত সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে।

অবশেষে, ঘরে আসিয়া পৌঁছাইয়া পুরানো ভাঙা বিবর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়া ছুটিয়া জানলার তলায় তাহার অভ্যস্ত কোণটীতে দিয়া আশ্রয় লইল, যেখান হইতে বাহিরে নদীটি চোখে পড়ে। সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু-বন্যা বাহির হইয়া আসিল। কেন যে সে এইভাবে কাঁদিতেছে, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না, শুধু বুঝিল, তাহার চোখ ভরিয়া কান্না আসিতেছে। কান্নার প্রথম জোয়ার চলিয়া গেলেও সে থামিতে পারিল না; সে আবার কাঁদিয়া উঠিল...আজ কাঁদিতেই সে চায়...দুর্বার ক্ষোভে সে ঠিক করিল, নিজেকে এইভাবে কাঁদিয়াই সে যাতনা দিবে...যেন এইভাবে নিজেকে যাতনা দিয়াই সে অপর সকলকে শাস্তি দিতে পারিবে। অপরকে শাস্তি দিবার আর কোন উপায়ই তো তাহার জানা নাই! হঠাৎ মনে পড়িল, বাবা বাড়ী আসিলে মা নিশ্চয়ই সব কথা তাহাকে জানাইবে, নূতন করিয়া তখন আবার সুরু হইবে শাস্তি। সে স্থির করিল, পালাইয়া যাইবে; যেদিকে খুশি, যেখানে খুশি, আর কখন ফিরিয়া আসিবে না।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়াই একেবারে তাহার বাবার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল, মেলশিয়র তখন সিঁড়ি দিয়া উপরেই উঠিতেছিল।

মেলশিয়র জিজ্ঞাসা করে: 'এখানে কি হচ্ছিল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে আবার?'

উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

'মনে হচ্ছে একটা কিছু বদমায়েসী যেন করেছিস...কি ব্যাপার?'

তবুও জাঁ-ক্রিস্তফ কোন কথা বলে না।

মেলশিয়র আবার জিজ্ঞাসা করে: 'কি করেছিস্? চুপ করে রইলি যে? উত্তর দিবি কিনা বল্?'

এবার বালক কাঁদিয়া উঠিল। সে যত কাঁদে, মেলশিয়র তত চিৎকার করে। এমন সময় দেখা গেল লুইসা তাড়াতাড়ি সেইদিকেই আসিতেছে। লুইসা রাগিয়াই ছিল। জাঁ-ক্রিস্তফকে দেখিয়াই সে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা সুরু করিয়া দিল, মেলশিয়র তাহাতে ইন্ধন জোগাইল। রাগে সে বালককে নির্মম প্রহার করিতে সুরু করিয়া দিল, সে-প্রহারে হয়ত একটা ষাঁড় শুইয়া পড়িত। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া সমানে গাল দেয়, সমানে চিৎকার করিয়া চলে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বালককে ছাড়িয়া কখন তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে নিজেদের মধ্যে ক্রুদ্ধ ঝগড়া সুরু করিয়া দিয়াছে। জাঁ-ক্রিস্তফকে প্রহার করিবার সময়, মেলশিয়র সারাক্ষণ শুধু এই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিল, সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক, ঘরের বউ যদি বাহিরে কাজ করিতে যায়, তাহা হইলে এই রকম ব্যাপারই ঘটে ; বিশেষ করিয়া যেসব লোক মনে করে যে টাকার জোরে তাহারা সব কিছুই করিতে পারে, তাহাদের নিকট কাজ করিলে, ইহাই ঘটিবে। লুইসাও বালককে প্রহার করিবার সময় তারস্বরে ঘোষণা করিল, মেলশিয়র স্বামী হইলেও মানুষ নয়, পশু...কিছুতেই বালকের গায়ে তাহাকে সে হাত দিতে দিবে না...তাহারই প্রহারে বালকের সত্যিকারের আঘাত লাগিয়াছে। বস্তুত তখন জাঁ-ক্রিস্তফের নাক দিয়া ঈষৎ রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল...সেদিকে বালকের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপই ছিল না। লুইসা একটা ভিজা গামছা আনিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহার জন্য বালক মার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ হইবার কোনই তাগিদ বোধ করিল না, কেন না তখনও সমানে লুইসা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াই চলিয়াছিল। অবশেষে একটা ছোট্ট অন্ধকার কুঠরিতে বালককে ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার আহারও নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের ভিতর হইতে সে শুনিতে পাইল, স্বামী-স্ত্রী দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে চেঁচাইয়া সমানে গালাগাল দিতেছে। ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, তাহাদের দুইজনের মধ্যে কাহাকে বেশী ঘৃণা সে করে। হয়ত তাহার মাকেই বেশী ঘৃণা করে, কারণ, তাহার নিকট হইতে এই দুর্ব্যবহার সে কোনদিনই আশা করে নাই। সেদিনকার সেই দুর্দৈবে সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সারাদিন ধরিয়া একটার পর একটা

দুর্ভোগে তাহাকে ভুগিতে হইয়াছে, সেই ধনী শিশুদের অত্যাচার, সেই ভদ্রমহিলার অবিচার, এমনকি তাহার নিজের মা-বাপের অবিচার... কিন্তু এ-সবের ঊর্ধ্বে রক্ত-ঝরা তাজা ক্ষতের মত, তাহার মনে সুগভীর দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল, তাহার পিতা-মাতার লাঞ্ছনা। যে-পিতা-মাতা সম্পর্কে তাহার গর্বের অন্ত ছিল না, সে কিছুতেই বুঝিয়া পাইল না, কেন তাহারা ঐ নীচ জঘন্য লোকগুলোর কাছে নিজেদের এতখানি ছোট করিয়া রাখিয়াছে! অস্পষ্ট হইলেও জীবনে এই প্রথম সে প্রত্যক্ষভাবে দেখিল, এক বিচিত্র কাপুরুষতা। সমস্ত মন তাহার ধিক্কার দিয়া উঠিল। তাহার জগতে সব কিছু যেন উল্টাইয়া গেল, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে তাহার স্বাভাবিক যে গর্ব-বোধ ছিল, পিতা-মাতার সম্মান, যাহা তাহার নিকট একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে হইত, জীবন সম্বন্ধে তাহার অগাধ বিশ্বাস, অপরকে ভালবাসা এবং অপরের ভালবাসা পাওয়ার যে সহজ দাবী, প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন তাহার সহজাত নৈতিক চেতনা,—সমস্তই যেন একদিনে উল্টাইয়া গেল। যেন একটা পরিপূর্ণ প্রলয় হইয়া গেল। কোন্ এক অজ্ঞেয় অন্ধ পশু-শক্তি তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল, তাহার আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যেন কোন শক্তিই তাহার নাই। তাহার নিকট হইতে পালাইবার পথও সে জানে না। বন্ধ ঘরের মধ্যে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। মনে হইল যেন, মৃত্যু তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসহায় বিদ্রোহে তাহার সমস্ত দেহ সংকুচিত হইয়া যেন কাঠ হইয়া আসিল। রুদ্ধ-ঘরের দেয়ালের গায়ে হাতের মুঠা দিয়া, মাথা দিয়া, পা দিয়া আঘাত করিতে করিতে কখন আছাড় খাইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে সচকিত হইয়া লুইসা ও মেলশিয়র দুইজনেই ছুটিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া, দুইজনেই তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া কোলে লইবার চেষ্টা করে। তাহাদের দুইজনের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যায়, কে বেশী আদর দেখাইতে পারে। জামা খুলিয়া দিয়া লুইসা তাহাকে ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়, তাহার পাশে বসিয়া থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জাঁ-ক্রিস্তফ একটু সুস্থির হইল ততক্ষণ পর্যন্ত সেইভাবে শয্যার পাশে বসিয়া রহিল। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ একবিন্দুও টলিল না। তাহার উপর অযথা যে অবিচার বর্ষিত হইল, তাহা সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। লুইসাকে সেখান হইতে সরাইবার জন্য সে নিদ্রার ভান করিয়া রহিল। আজ তাহার নিকট

লুইসাও ছোট হইয়া গিয়াছে। তখনও পর্যন্ত সে ক্ষীণতমভাবেও জানিত না, শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং তাহাদের সকলকেই বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কি বেদনাই না তাহার জননীকে ভোগ করিতে হয়, এবং আজ তাহাকে এই যে ভর্ৎসনা করিতে হইল, তাহার জন্য কতখানি যন্ত্রণা যে এই নারী নিজেকে দিয়াছে, তাহার কোন ধারণাই জাঁ-ক্রিস্তফের ছিল না।

শিশুর দুই চোখে অবিশ্বাস্য কি গভীর অশ্রুর সঞ্চয় না থাকে! তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত যখন ঝরিয়া পড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন জাঁ-ক্রিস্তফ একটু যেন সুস্থির বোধ করিতে লাগিল। সে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাহার শিরা-উপশিরা এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে সে ঘুমাইতে পারিল না। অর্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে শুইয়া থাকে। মনের ভিতর একে একে ভাসিয়া চলে স্মৃতির ছায়াচিত্র। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাসিয়া ওঠে, উজ্জ্বল-চোখ সেই ছোট্ট মেয়েটি, ঈষৎ-উন্নত গর্বিত ছোট্ট নাক, কুঞ্চিত কেশের রাশি কাঁধের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, সেই ছোট্ট দুটি নগ্ন পা, অস্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গী। হঠাৎ সে কাঁপিয়া ওঠে, মনে হয়, যেন সেই বালিকার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট সে শুনিতে পাইতেছে। মনে পড়িয়া যায়, কি বোকার মতন ব্যবহার সে তাহার সামনে করিয়া আসিয়াছে এবং সেই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বন্য ঘৃণা সেই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনে জাগিয়া ওঠে। সেই বালিকাই আজ তাহাকে এই হীন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে বিন্দুমাত্র ক্ষমা সে করিবে না... এক দুর্বার বাসনা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতে থাকে, এমনি অপদস্থ তাহাকেও সে করিবে, এমনিভাবে একদিন তাহাকেও সে কাঁদাইবে। মনে মনে সন্ধান করে, কি উপায়ে সে-বাসনা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পায় না। সে-বালিকা যে তাহার সম্পর্কে একটুকু সচেতন হইবে এমন কোন গুণই তাহার নাই। নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিজের মনের মধ্যে নিজেকে ভাঙিয়া চুরিয়া বড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে থাকে জাঁ-ক্রিস্তফ। যাহা হইতে পারিলে, মেয়েটিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়, কল্পনায় নিজেকে সেইভাবে ভাবিয়া চলে। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঠিক তাহাই হইয়া যায়। সে যেন অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে...চারিদিকে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সেই খ্যাতির আকর্ষণে সেই বালিকা উপযাচক হইয়া তাহার ভালবাসা চাহিতেছে।

তারপর কি হইবে, তাহার কাহিনী সে সবিস্তারে নিজেকে শুনাইয়া চলে...এমনি অসংখ্য অসম্ভব কাহিনী নিত্য সে নিজেকে শোনাইত... তাহার নিকট সেই সব অসম্ভব কাহিনী বাস্তবের চেয়েও বাস্তব মনে হইত...

...তাহার ভালবাসা পাইবার জন্য মেয়েটি মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছে... কিন্তু সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মেয়েটির বাড়ীর সামনে দিয়া যখনি সে যায়, তখনই খোলা জানালার পর্দার আড়ালে মুখ লুকাইয়া মেয়েটি তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, জাঁ-ক্রিস্তফ তাহা জানে, কিন্তু এমনভাবে সে চলিয়া যায় যেন সে-সম্পর্কে সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই, আপনার মনে আনন্দে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সে চলিয়া যায়। তারপর একদিন সে দেশ ছাড়িয়া দূর দূরান্তরে বেড়াইতে বাহির হইল, ইচ্ছা করিয়াই মেয়েটির যন্ত্রণা বাড়াইবার জন্য। দূর দেশে নানা অসাধ্য সাধন সে করিল। গল্পের এই অংশে সে ঠাকুরদাদার মুখ হইতে যে-সব বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিল, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া জোরালো বীরত্বের অংশগুলি নিজের কীর্তির সঙ্গে জুড়িয়া দিল। সে যখন এইভাবে দূর দেশে একটার পর একটা বীরত্ব করিয়া চলিয়াছে, মেয়েটি তখন ঘরে বসিয়া তাহারই জন্য শোকে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটির মা, সেই উদ্ধত ভদ্রমহিলা আজ উপযাচিকা হইয়া তাহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া লিখিয়াছে, 'দুধের বাছা আমার মরতে বসেছে...আমার অনুরোধ, তুমি ফিরে এসো!' সে ফিরিয়া আসিল। মেয়েটি শয্যায় শুইয়া আছে। গোলাপ ফুলের মতন মুখ ম্লান বিবর্ণ হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। নীরবে মেয়েটি শুধু তাহার দিকে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়। কথা বলিবার শক্তি তাহার নাই, শুধু নীরবে তাহার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বন করে, চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। অবশেষে জাঁ-ক্রিস্তফ পরিপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার দৃষ্টিতে ফুটিয়া ওঠে অসীম করুণা আর স্নেহ। তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবার আদেশ করে, সেই সঙ্গে জানাইয়া দেয়, অতঃপর তাহাকে ভালবাসিবার অধিকার সে তাহাকে দিতে সম্মত আছে। গল্পের ঠিক এই সন্ধিক্ষণে, যখন সে ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটির সঙ্গে পুনর্মিলিত হইতেছে, তাহাদের সেই সময়কার অঙ্গ-ভঙ্গী এবং কথাবার্তা বারবার মনে মনে অভিনয় করিতে তাহার ভাল লাগে এবং সেই বহু-আকাঙ্খিত স্নিগ্ধতার আবেশে কখন

তাহার অজ্ঞাতে নিদ্রা আসিয়া অধিকার বিস্তার করিয়া বসে...সে ঘুমাইয়া পড়ে...ঘুমের মধ্যে কে যেন সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দিয়া যায়।

যখন সে আবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল তখন দিন হইয়া গিয়াছে...কিন্তু আজিকার এই দিন তাহার পূর্ববর্তীদের মতন আর যেন উজ্জ্বল বোধ হয় না, তেমন যেন আর হাল্কা বোধ হয় না। ইতি-মধ্যে তাহার জগতে এক মহা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। জাঁ-ক্রিস্তফ আজ জানে অবিচার মানে কি।

বাড়ীতে ইদানীং প্রায়ই দুর্দশার চরম অবস্থা প্রকট হইয়া ওঠে। ক্রমশ তাহা ঘন ঘন দেখা দিতে থাকে। অতি অল্প আয়োজনের মধ্যে তাহাদের সংসার চালাইতে হয়। জাঁ-ক্রিস্তফের চেয়ে এ-বিষয়ে বেশী সজাগ আর কেহই ছিল না। মেলশিয়র কিছুই চাহিয়া দেখিত না। যাহা কিছু জুটিত, তাহাকেই প্রথম পরিবেশন করা হইত এবং তাহার মাত্রায় কিছুই কম পড়িত না। তেমনি এলোমেলো যা-তা বকিত, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া ফাটিয়া পড়িত, ফিরিয়াও দেখিত না, তাহার কান্ড দেখিয়া তাহার স্ত্রী বাধ্য হইয়া জোর করিয়া কিভাবে নিজেকে সংযত করিতেছে। নিজের খাওয়া শেষ করিয়া যখন সে খাবারের ডিস তাহাদের দিকে সরাইয়া দিত, তখন তাহাতে অর্ধেকেরও কম খাবার পড়িয়া থাকিত। তাহা হইতে লুইসা ছেলেদের দুইটি করিয়া আলু গুণিয়া তুলিয়া দিত। ডিস যখন জাঁ-ক্রিস্তফের কাছে আসিত, তখন কখন কখন মাত্র তিনটি আলু পড়িয়া থাকিত। জাঁ-ক্রিস্তফ টেবিলে বসিবার আগেই লক্ষ্য করিয়া লইত। সে জানিত তাহার মার জন্য কেহই ভাবিত না। তাই তাহার কাছে ডিস আসিলে সে হিসাব করিয়া গুণিয়া দেখিয়া লইত। যে দিন দেখিত, মাত্র তিনটি আলু পড়িয়া আছে, সেদিন চেষ্টা করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইত, অন্যমনস্কভাবে জননীকে জানাইত: 'আমাকে শুধু একটা দাও, মা!'

লুইসা একটু যেন থতমত খাইয়া যায়।

'কেন সবাই যখন দুটো ক'রে নিয়েছে, তুইও দুটো নে!'

'না, লক্ষ্মীটি মা...একটা দাও!'

'কেন? তোর কি ক্ষিদে পায় নি রে!'

'না মা, ক্ষিদে নেই।'

কিন্তু লুইসাও একটার বেশী আর লইত না। দুইজনে অতি সন্তর্পণে তখন সেই একটি আলুকেই ছাড়াইতে আরম্ভ করিত, টুকরা টুকরা করিয়া কাটিত এবং যত আস্তে সম্ভব বসিয়া বসিয়া খাইত। লুইসা পুত্রের খাওয়া লক্ষ্য করিত, শেষ হইলে বলিয়া উঠিত: 'এই নে, আর একটা!'

'না, মা।'

'কেন? সত্যি অসুখ করেছে নাকি?'

'অসুখ করে নি তবে আমার পেট ভরে গিয়েছে।'

মেলশিয়র ধমকাইয়া উঠিত, অবাধ্য বলিয়া পুত্রকে ভর্ৎসনা করিত এবং সেই সঙ্গে অবশিষ্ট শেষ আলুটি নিজেই তুলিয়া খাইয়া ফেলিত। জাঁ-ক্রিস্তফ পিতার এই কায়দাটি বুঝিয়া ফেলিল। তাই ইদানীং শেষ আলুটি নিজের ডিসেই তুলিয়া লইত। আর্ণেষ্টের জন্যে রাখিয়া দিত। আর্ণেষ্টের ক্ষুধা যেন কিছুতেই মিটিত না। খাবার আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই জাঁ-ক্রিস্তফ লক্ষ্য করিত, সে এই সর্বশেষ আলুটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে সর্বদাই আড় চোখে চাহিয়া দেখিতেছে। জাঁ-ক্রিস্তফের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিয়া উঠিত: 'তুমি বুঝি ওটা আর খাবে না দাদা? আমাকে দাও না!'

সত্যই, জাঁ-ক্রিস্তফ তাহার পিতাকে ঘৃণা করিত, তীব্রভাবে ঘৃণা করিত, ঘৃণা করিত কারণ তাহাদের কথা মেলশিয়র ভাবিত না বলিয়া, পিতা হইয়া পুত্রদের খাবারের অংশ যে নির্বিবাদে খাইয়া ফেলিতেছে তাহার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। জাঁ-ক্রিস্তফ নিজে ক্ষুধার জ্বালায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং মনে হইত স্পষ্ট সে তাহার পিতাকে জানাইয়া দেয় যে, সে তাহাকে এইজন্য কতখানি ঘৃণা করিতেছে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগিত, সে বুঝিত, একথা বলিবার কোন অধিকার আজ তাহার নাই, কারণ, তাহার নিজের জীবিকা সে তো নিজে অর্জন করিতেছে না। যে রুটির টুকরা তাহাকে খাইতে হয়, তাহা তাহার পিতারই অর্জনের দান। সে তো নিজে অপদার্থ...অপরের স্কন্ধে সে যেন একটা বোঝা...সুতরাং এ সম্পর্কে কোন কথা বলিবার কোন অধিকারই তাহার নাই। হয়ত অন্য কোন দিন সে বলিতে পারিবে—যদি অন্য কোন দিন বলিয়া পরে কিছু থাকে! কিন্তু হায়! তাহার আগে হয়ত ক্ষুধায় তাহাকে মরিয়া যাইতে হইবে!...

এই জাতীয় স্বেচ্ছাকৃত উপবাসের ফলে তাহার বলিষ্ঠ দেহ মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিত। মনে হইত তাহার সর্ব-দেহ যেন কাঁপিতেছে, মাথার ভিতরে কে যেন আঘাত করিয়া চলিয়াছে। বুকের ভিতর যেন একটা গর্ত হইয়া গিয়াছে, সে-গর্ত ক্রমশই যেন বড় হইয়া চলিয়াছে, আর কে যেন সেই গর্তের মুখে স্ক্রু বসাইয়া প্যাঁচ দিতেছে। তবুও সে অভিযোগ করিত না। সর্বদাই সে অনুভব করিত, তাহার জননীর সজাগ দৃষ্টি তাহার উপর যেন সব সময়ই রহিয়াছে। তাই সে নিজেকে উদাসীন দেখাইতে চেষ্টা করিত। অন্তরের অদৃশ্য স্নেহ-বন্ধনী দিয়া লুইসা অস্পষ্ট বুঝিতে পারিত তাহার এই বালক-পুত্রটি হয়ত নিজেকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে, যাহাতে সংসারের অন্য সকলে অন্তত কিছুটা বেশী পায়। লুইসা মন হইতে সে-চিন্তা দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বারেবারে সেই চিন্তাই ফিরিয়া ফিরিয়া আসিত। ইহা সত্য কিনা, মাঝে মাঝে প্রবল ইচ্ছা যাইত, জাঁ-ক্রিস্‌তফকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। যদি জাঁ-ক্রিস্‌তফ বলে, হাঁ, সত্য, সত্যই সে সংসারে অপরের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে, তখন সে কি করিবে? কি করিতে পারে? লুইসা নিজে শিশুকাল হইতে এই ক্ষুধার যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন প্রতিকার করিবার কোন পথ নাই, তখন অভিযোগ করিয়াই বা কি লাভ, তাহার সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর স্বল্পে-তুষ্ট মন লইয়া লুইসা যে যন্ত্রণা পাইত, সে কোন দিন সন্দেহ করে নাই যে তাহার বালক-পুত্র তাহার অধিক যন্ত্রণা পাইতে পারে। কোন দিন কোন কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিত না, শুধু মাঝে মাঝে যখন ছেলেরা রাস্তায় খেলা করিত এবং মেলশিয়র তাহার ধান্ধায় বাহির হইয়া যাইত, বাড়ীতে সে আর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া কেহ আর থাকিত না, তখন তাহার হইয়া এটা-সেটা করিবার অছিলায় জাঁ-ক্রিস্‌তফকে বাড়ীতে থাকিবার জন্য সে বলিত। মার সঙ্গে থাকিয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফ মার কাজে নীরবে সাহায্য করিত। লুইসা নিজেকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিত না। হঠাৎ হাতের কাজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া লুইসা আবেগে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিত। যদিও তখন আর সে শিশুটি নয়, তবুও তাহাকে কোলে বসাইয়া প্রাণ ভরিয়া আদর করিত। জাঁ-ক্রিস্‌তফ দুই হাত দিয়া মার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিত... আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় মাতা-পুত্র সমানে অঝোরে কাঁদিয়া চলিত।

'ওরে, ওরে আমার বাছারে!'

'মা...মাগো...'

ইহার বেশী আর কোন কথা তাহারা বলিতে পারিত না। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে যেন সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইত।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝিতে পারিল, তাহার পিতা মদ খায়, মাতাল। প্রথম প্রথম মেলশিয়রের মাতলামি তবুও খানিকটা সীমার মধ্যে ছিল। তাহার মধ্যে বর্বরোচিত তখন কিছু ছিল না। শুধু অকারণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে আর কলরবে তাহা ধরা পড়িত। মূর্খের মতন যা-তা মন্তব্য করিত, টেবিল চাপড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার মনে গান গাহিয়া চলিত এবং কখন কখন লুইসা আর ছেলে-দের লইয়া নাচিবার খেয়াল মাথায় চাড়া দিয়া উঠিত। জাঁ-ক্রিস্তফ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহার মার মুখ কেমন যেন বিষণ্ণ হইয়া যাইত। দূরে সরিয়া আসিয়া লুইসা চেষ্টা করিত ঘাড় নীচু করিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাইতে। পারতপক্ষে স্বামীর মত্ত দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত...হঠাৎ কোন কুৎসিত কথা মেলশিয়র বলিয়া উঠিলে, লজ্জায় রক্তিম হইয়া লুইসা তাহাকে একান্তে শান্তভাবে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিত। আগে জাঁ-ক্রিস্তফ এ-সব কিছুই বুঝিত না। আনন্দের এতখানি তীব্র অভাব সে সারাদিন অনুভব করিত যে, পিতার এই কোলাহল-মুখর গৃহ-প্রত্যাবর্তন তাহার নিকট পরম বিচিত্র বলিয়াই মনে হইত। সারা দিনের বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে এই মত্ত কোলাহল তাহার নিকট বৈচিত্র্যের স্বাদ লইয়া আসিত। মেলশিয়রের উন্মাদ উক্তি আর ভাঁড়ামিতে সে প্রাণ খুলিয়া হাসিত, তাহার সহিত নাচিত, গাহিত... হঠাৎ লুইসা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে থামিতে আদেশ করিত, সে ক্ষুব্ধ হইয়াই পড়িত। যখন তাহার পিতা নিজে করিতেছে, তখন ইহার মধ্যে অন্যায় কি থাকিতে পারে? তাহার একান্ত সজাগ দৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে সে একবার যাহা দেখিত তাহা আর ভুলিত না। সেই দৃষ্টির আলোকে, যদিও সে তাহার পিতার আচরণে মাঝে মাঝে এমন কিছু জিনিস লক্ষ্য করিত যাহা তাহার সংস্কার-মুক্ত স্বাধীন শিশু-চিত্ত ঠিক অনুমোদন করিয়া উঠিতে পারিত না, তবুও সে তখন পর্যন্ত তাহার পিতাকে শ্রদ্ধাই করিত। শ্রদ্ধা করিতে পারে এমন একটা মানুষ শিশুর যে একান্ত প্রয়োজন! এ যে তার আত্ম-প্রেমেরই বিচিত্র প্রকাশের আর এক

রূপ। যখন কোন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহার বাসনা চরিতার্থ করিবার মত অথবা তাহার গর্বকে তৃপ্ত করিবার মত শক্তি বা সামর্থ তাহার আর নাই, তখন সে যদি শিশু হয়, তাহা হইলে সেই ব্যর্থ বাসনাকে সে তাহার পিতা-মাতার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে; যদি সে পিতা হয়, তাহা হইলে পুত্রের মধ্যেই তাহার সার্থকতা খোঁজে। তখন পিতা হইয়া ওঠে পুত্রের ঈপ্সিত আদর্শ, পুত্র হয় পিতার ব্যর্থ কামনার পরিপূর্তি। একের অভাব অপরের মধ্যে খোঁজে সার্থকতা। তখন নিজের সকল স্নেহ, প্রেম, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা—অপরের হাতে নির্বিবাদে তুলিয়া দিতে অন্তরে আনন্দই জাগে। তাই পিতার বিরুদ্ধে তাহার যাহা কিছু অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে, জাঁ-ক্রিস্তফ সমস্তই ভুলিয়া যায়; পিতাকে ভালবাসিবার বা শ্রদ্ধা করিবার কারণ খুঁজিয়া বাহির করার ব্যর্থ চেষ্টা আর করিতে হয় না। পিতার সেই সমুন্নত দেহ, বলিষ্ঠ বাহু, কণ্ঠস্বর, অট্টহাস্য, উল্লাস, সমস্ত কিছুই তাহার নিকট গর্বের বস্তু হইয়া ওঠে। অল্পবিস্তর বাড়াইয়া মেলশিয়র নিজের প্রশংসায় নিজেই যখন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত, জাঁ-ক্রিস্তফের ভাল লাগিত, রীতিমত গর্ব অনুভব করিত। পিতার সেই সব দম্ভ-উক্তিকে সে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিত এবং তাহার পিতামহের নিকট যে-সব প্রতিভাশালী পুরুষদের কাহিনী শুনিয়াছিল, মনে মনে সেই সব কাহিনীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া সে স্পষ্ট বিশ্বাস করিত, তাহার পিতাও সেই সব প্রতিভাধারীদেরই একজন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রায় সাতটা বাজে, বাড়ীতে সে একলাই ছিল। বৃদ্ধ মিচেলের সঙ্গে তাহার ভাইরা বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। লুইসা পিছনে নদীতে কাপড় কাচিতে ছিল। হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল, মেলশিয়র আবির্ভূত হইল। মাথার টুপি উড়িয়া গিয়াছে, চুল এলো-মেলো। নাচের ভঙ্গীতে টলিয়া পড়িয়া কোন রকমে দরজা পার হইয়া একটা চেয়ারে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। পরিচিত ভাঁড়ামির একটা নূতন কিছু ব্যাপার মনে করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ হাসিয়া উঠিল, তাহার দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু কাছে গিয়া যখন ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইল তখন তাহার সব হাসি শূন্যে মিলাইয়া গেল। দেখিল, চেয়ারের দুই দিক হইতে মেলশিয়রের দুই হাত এমনভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যেন তাহাতে জীবনের কোন স্পন্দন নাই; সোজা সামনের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু সেই চক্ষু দিয়া যেন কিছুই দেখিতে পাই-

তেছে না। সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং হাঁ করিয়াই আছে। মাঝে মাঝে তাহার ভিতর হইতে নিরর্থক হাসির একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ আসিতেছে। স্থির প্রস্তর মূর্তির মত জাঁ-ক্রিস্তফ সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। প্রথমে মনে করিয়াছিল, বুঝি এইভাবে তাহার পিতা নূতন কোন মজা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া যখন দেখিল যে একচুলও সে নড়িতেছে না, তখন ভীত হইয়া পড়িল।

'বাবা, বাবা,' সে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

উত্তরে মেলশিয়র শুধু নীরবে মুরগীর মত ঠোঁট নাড়িতে লাগিল। অসহায় আতঙ্কে জাঁ-ক্রিস্তফ পিতার দুই হাত ধরিয়া যতদূর তাহার শক্তিতে কুলাইল তাহাকে ধাক্কা দিয়া নাড়াইতে চেষ্টা করিল।

'বাবা, বাবা, শোন, কথা বল, তোমার পায়ে পড়ি, কথা বল!'

মেলশিয়রের দেহ কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল যেন তাহাতে হাড় কোথাও নাই; চেয়ার হইতে সোজা পড়িয়া যাইবার মতন হইল। মাথাটা জাঁ-ক্রিস্তফের বুকের উপর গিয়া পড়িল; পুত্রের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া বিরক্তভাবে অসংবদ্ধ কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল। ছুটিয়া ঘরের অপর কোণে শয্যার ধারে গিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ নতজানু হইয়া বিছানায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ ধরিয়া সেই অবস্থায় সে রহিল। একবার মনে হইল, চেয়ার শুদ্ধ মেলশিয়র যেন নড়িয়া উঠিল। দুই হাত দিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ নিজের দুই কান ঢাকিয়া ফেলিল, যাহাতে কোন শব্দ যেন তাহাকে শুনিতে না হয়। তাহার ভিতরে তখন কি যে হইতেছিল তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। একটা তুমুল আলোড়ন—রাগ, ভয়, শোক সব এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে...যেন, এইমাত্র কেহ মরিয়া গিয়াছে... তাহার একান্ত প্রিয়, একান্ত শ্রদ্ধেয় যেন কেউ এই মাত্র মরিয়া গেল।

আর কেহ নাই, বাহির হইতে কেহ আসিলও না, ঘরে শুধু তাহারা দুইজন। রাত্রি ঘন হইয়া আসে। যত মুহূর্ত চলিয়া যায়, জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় ততই বাড়িয়া চলে। না শুনিয়া উপায় নাই, কিন্তু তাহার কানে যে কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছাইতেছে, সে-কণ্ঠস্বর যেন সে চিনিতে পারিতেছে না...তাহার রক্ত হিম হইয়া আসে। চারিদিকের নিস্তব্ধতা যেন প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আরো ভয়াল করিয়া তোলে। সেই অর্থহীন বিকৃত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাটা যেন তাল দিয়া চলিয়াছে। আর সে সহ্য করিতে পারে না, সম্ভব হইলে সে উড়িয়া

পালাইয়া যায়। কিন্তু পালাইতে গেলে পিতার সামনে দিয়াই যাইতে হইবে, সেই চোখ দুইটি যদি তাহার চোখে পড়ে!—ভয়ে সে আরো আড়ষ্ট হইয়া যায়। যদি আবার সেই চোখের উপর তাহার চোখ পড়ে, নিশ্চয়ই সে মরিয়া যাইবে। তাই মাথা নীচু করিয়া হামাগুড়ি দিয়া দরজার কাছে যাইবার জন্য চেষ্টা করে। কোনরকমে নিঃশ্বাস আটকাইয়া শুধু মাটির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অগ্রসর হয়, মেলশিয়রের দিক হইতে সামান্য কিছু শব্দ আসিলেই থমকিয়া থামিয়া যায়। টেবিলের তলা দিয়া হঠাৎ চোখে পড়ে, মেলশিয়রের একটা পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মেলশিয়র উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে; অবশেষে টেবিলের গায়ে পিঠ লাগাইয়া কোন রকমে উঠিয়া বসে। চারিদিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে কোথায় আসিয়াছে এবং ক্রমশ যেন বুঝিতেও পারে। দেখে সামনে জাঁ-ক্রিস্তফ কাঁদিতেছে; তাহাকে কাছে ডাকে। জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হয় যেন সে ছুটিয়া সেখান হইতে পালাইয়া যায়, কিন্তু এক-পাও নড়িতে পারে না। কাছে আসিবার জন্য মেলশিয়র তাহাকে আবার ডাকে কিন্তু যখন দেখে বালক তেমনি দূরে দাঁড়াইয়া আছে, রাগে ধমক দিয়া ওঠে। বাধ্য হইয়াই জাঁ-ক্রিস্তফ আগাইয়া আসে, সর্বশরীর তাহার কাঁপিতে থাকে। মেলশিয়র তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া নিজের হাঁটুর উপর বসাইতে চেষ্টা করে। দুই হাতে দুই কান মর্দন করিয়া অবাধ্য পুত্রকে পিতৃ-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। পরমুহূর্তেই অন্য কি এক চিন্তাধারা তাহাকে পাইয়া বসে, বালকের সহিত নানারকমের বাচালতা করিতে সুরু করিয়া দেয়। পরমুহূর্তেই আবার কি খেয়াল হয়, বালককে তাহার হাতের উপর লাফাইয়া বসিতে আদেশ করে। হাসিয়া নিজেই লুটোপাটি খায়। তৎক্ষণাৎ আবার কি মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া ওঠে। বালকের প্রতি, নিজের প্রতি করুণায় উদ্বেল হইয়া ওঠে। এমন আকুলভাবে পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরে যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার মতন হয়, চুম্বনে আর অশ্রুতে তাহাকে সিক্ত করিয়া তোলে, দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে দোলা দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি সুরু করিয়া দেয়। ছুটিয়া পালাইবার কোন চেষ্টাই জাঁ-ক্রিস্তফ করে না, ভয়ে সে চলৎশক্তিহীন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। পিতার বুকে সেইভাবে নিষ্পেষিত হইয়া থাকিতে থাকিতে পিতার সুরাসিক্ত নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে আর হেঁচকিতে ক্রমশ সে বিরত ও বিরক্ত

হইয়া ওঠে। অব্যক্ত নিদারুণ অস্বস্তি তাহাকে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে থাকে। মনে হয়, ডাক ছাড়িয়া সে কাঁদে কিন্তু গলা দিয়া কোন স্বরই বাহির হয় না। কতক্ষণ যে সে এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বন্দী হইয়াছিল, তাহার কোন ধারণাই ছিল না ; মনে হইতেছিল যেন এক যুগ ধরিয়া সে এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।...এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল...হাতে এক ঝুড়ি কাচা পোষাক লইয়া লুইসা প্রবেশ করিল। সামনেই সেই দৃশ্য দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, ছুটিয়া জোর করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফকে মেলশিয়রের নিকট হইতে টানিয়া আনিল এবং গায়ের সমস্ত জোর দিয়া মেলশিয়রের হাত মুচড়াইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল : 'মাতাল...অপদার্থ মাতাল...।' রাগে লুইসার দুই চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে।

জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় হয়, এবার বুঝি মেলশিয়র তাহার মাকে মারিয়াই ফেলে। কিন্তু স্ত্রীর সেই ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়া মেলশিয়র কোন প্রত্যুত্তরই করিল না...পরিবর্তে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সামনে যে কোন আধার পায়, তাহাতেই মাথা ঠোকে, আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে, সত্যই সে অপদার্থ মাতাল, তাহারই জন্য সংসারে এই দুঃখ দৈন্য, তাহারই জন্য ছেলেপুলেরা পর্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সবই সত্য, অতএব তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। লুইসা রাগে ঘৃণায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। জাঁ-ক্রিস্তফকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া আদর করে, আদর করিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। বালক তখনও কাঁপিতেছিল, মার কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না। সহসা সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তাড়াতাড়ি জল আনিয়া লুইসা তাহার চোখ মুখ ধুইয়া দেয়। একান্ত স্নেহে তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে কত না আদর জানায়, অবশেষে বালকের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও কাঁদিতে থাকে। তারপর এক সময় মাতা ও পুত্র, দুইজনেই শান্ত হয়। লুইসা নতজানু হইয়া বসে, জাঁ-ক্রিস্তফকেও তাহার পাশে সেইভাবে বসায়। তরাপর অশ্রুসজল কণ্ঠে প্রার্থনা করে, ওগো ভগবান, এই কু-অভ্যাস হইতে তাহাকে মুক্ত কর...সে যেমন ভাল লোক, তেমনি ভাল লোক হইয়াই যেন থাকে। তারপর পুত্রকে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। জাঁ-ক্রিস্তফ মার হাত ধরিয়া থাকে, বলে, তেমনিভাবে তাহার বিছানার পাশে যেন সে বসিয়া থাকে। পুত্রের অনুরোধে

জননী তেমনিভাবে অনেক রাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে। হঠাৎ তাহার গায়ের সংস্পর্শে লুইসা বুঝিতে পারে, ঈষৎ জ্বরভাব হইয়াছে। মাতাল স্বামী মেঝেতে পড়িয়া তখনও নাক ডাকিতে থাকে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, একদিন স্কুলে তখন ক্লাস চলিতেছে, জাঁ-ক্রিস্তফ একমনে ঘরের দেয়ালে মাছিদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সহপাঠীদের সহিত দুষ্টুমি করিতেছিল, যাহাতে তাহারা বসিবার টুল হইতে পড়িয়া যায়। জাঁ-ক্রিস্তফের এই দুষ্টুমি আর চঞ্চলতার দরুণ ক্লাসের শিক্ষক তাহাকে দেখিতে পারিত না, বিশেষ করিয়া ক্লাসের পড়াশোনায় তাহার তেমন আগ্রহও ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত সেইদিন জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেই টুল হইতে পড়িয়া গেল। সেই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া শিক্ষক জাঁ-ক্রিস্তফকে একজাতীয় দুষ্ট লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া এক গল্প বলিলেন। সেই গল্প শুনিয়া তাহার সহপাঠীরা হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে সুরু করিল। জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, সামনের ডেস্ক হইতে কালির দোয়াতটা তুলিয়া সজোরে সামনে যে ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছিল, তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ক্লাসের শিক্ষক রাগিয়া উঠিয়া জাঁ-ক্রিস্তফকে রীতিমত প্রহার করিলেন। প্রহারের পর তাহাকে ক্লাসের সামনে "নীল্ডাউন" করিয়া রাখিলেন, অধিকন্তু শাস্তিস্বরূপ একটা অতি কঠিন "টাস্কের" ভার দিলেন।

একটা কথাও না বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বিবর্ণ মুখে সে বাড়ীতে ফিরিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে শান্তভাবেই ঘোষণা করিল, আর স্কুলে সে যাইবে না। কিন্তু সে-কথা বাড়ীতে কেহই কানে তুলিল না। পরের দিন সকাল বেলা, যখন লুইসা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিল যে স্কুলে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তখন অবিচলিতভাবেই সে জননীকে জানাইয়া দিল, সে-তো বলিয়াছে, স্কুলে আর সে যাইবে না। বৃথাই লুইসা অনুনয় করে, ধমক দেয়, ভয় দেখায়। কোন ফলই হয় না। ঘরের এক কোণে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, অটল, অচল। মেলশিয়র রাগিয়া উঠিয়া রীতিমত প্রহার করিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। প্রত্যেক প্রহারের পর, যখনই তাহাকে উঠিয়া স্কুলে যাইবার জন্য আদেশ করা হয়, তখুনি সে চিৎকার করিয়া ওঠে, 'না, না!' অবশেষে কৈফিয়ৎ তলব করা হইল কেন সে স্কুলে

যাইবে না, অন্তত তাহাও তো সে বলিবে! দাঁতে দাঁত দিয়া তবুও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অবশেষে মেলশিয়র তাহাকে সশরীরে টানিয়া লইয়া স্কুলে একেবারে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া আসিল। ক্লাসে নির্দিষ্ট টুলের উপর জোর করিয়া তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল ; হাতের কাছে সে যাহা কিছু পাইল, দোয়াত, কলম ভাঙিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। শিক্ষকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে প্রকাশ্যভাবে খাতা, বই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিল। শিক্ষক ক্ষেপিয়া উঠিলেন। একটা অন্ধকার ঘরে তাহাকে আটক করিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষক উঁকি মারিয়া দেখেন, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া গলায় ফাঁস লাগাইয়া সে দুইহাতে সজোরে টানিতেছে। শ্বাস রোধ করিয়া সে আত্মহত্যা করিবে।

বাধ্য হইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়।

অসুখ-বিসুখের কোন বালাই জাঁ-ক্রিস্তফের ছিল না। পিতা এবং পিতামহের কাছ হইতে সে উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের দৈহিক বলিষ্ঠতা ও স্বাচ্ছন্দ্য পুরাপুরি পাইয়াছিল। তাহাদের বংশে মোমের পুতুল কেহই ছিল না, দেহ সুস্থ না অসুস্থ, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না। তাহার পিতা বা পিতামহ কোনদিনই দৈহিক কারণে তাহাদের অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবন-ধারার কোন পরিবর্তনই করিত না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তাহাতে তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না ; গ্রীষ্মে বা শীতে সমানভাবেই বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইত ; অবিশ্রান্ত ধারা জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খালি মাথায়, খোলা বুকে, নির্বিকার চিত্তে তাহারা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইত ; কখনও বা এমনি বাহাদুরী দেখাইতে অথবা এমনি অন্যমনস্কভাবে, মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটিয়া আসা-যাওয়া করিত, কিন্তু তাহার জন্য বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিত না। পিতা এবং পিতামহ, দুইজনেই সেইজন্য বেচারা লুইসাকে করুণার চক্ষেই দেখিত। এই জাতীয় দৈহিক কষ্ট হয়ত মুখ বুঁজিয়া লুইসাকেও সহ্য করিতে হইত, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আর পারিত না। মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিত, পা ফুলিয়া যাইত, বুকের ভিতর স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিত। জাঁ-ক্রিস্তফও মার এই নীরব যাতনার কথা বুঝিত না ; কারণ দৈহিক অসুস্থতা যে কি, তাহার কোন বোধ তাহারও ছিল না। কোন কারণে পড়িয়া গেলে বা আহত হইলে, বা

কোন কিছুতে হাত-পা কাটিয়া বা পুড়িয়া গেলে, সে কাঁদিত না; যে বস্তুর দরুণ তাহার এই দুর্দশা, শুধু তাহারই উপর সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। পিতার নির্মমতা, খেলার সঙ্গী অথবা রাস্তার দুষ্ট ছেলে-দের দুর্ব্যবহার, তাহাকে আরো কঠিন করিয়াই তুলিতেছিল। আঘাত দিতে বা গ্রহণ করিতে এতটুকু ভয় সে করিত না, প্রায়ই যখন বাড়ী ফিরিত, দেখা যাইত হয় নাক ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, নতুবা কপাল কাটিয়া গিয়াছে। একবার রাস্তায় মারামারি করিবার সময়, তাহার মাথাকে পাথরের সঙ্গে যখন ঠুকিতেছিল, তখন নিঃশ্বাস রোধ করিয়া সে তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া ছাড়াইয়া আনিতে হইল। তাহার সহিত লোকে যেরূপ ব্যবহার করিবে, প্রত্যুত্তরে সে তাহার সহিত ঠিক সেই-রূপই ব্যবহার করিবে, ইহাই ছিল তাহার নিকটে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু, বিচিত্র ব্যাপার, সমস্ত বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও, বহু জিনিসে তাহার ভয় করিত, অবশ্য লোকের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে তাহার গর্বে বাধিত। কেহ জানিত না বটে, কিন্তু তাহার শৈশবে একটা সময় এমন গিয়াছে যখন সেই সব সংগোপন আতঙ্কের চেয়ে পীড়াদায়ক তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। প্রায় দুই তিন বৎসর কাল ধরিয়া গোপন ব্যাধির মতন এই আতঙ্ক ভিতরে ভিতরে তাহাকে তীব্রভাবে জর্জরিত করিয়াছে।

অন্ধকারে নাম-না-জানা রহস্যময় একটা-কি-যেন ঘুরিয়া বেড়ায়, ওৎ পাতিয়া থাকে অতর্কিতে তাহাকে বধ করিবার জন্য। প্রত্যেক শিশুর অন্তরের কোণে নামহীন সেই ভয়াবহ দৈত্য মহা-আতঙ্কের প্রতিমূর্তির মতন লুকাইয়া থাকে। যা কিছু বিচিত্র তাহার চোখে পড়ে, তাহার প্রত্যেকটি আড়ালে যেন সেই লুকাইয়া থাকে। শিশুর অন্তরের এই সংগোপন আতঙ্ক হয়ত কোন মৃত অতীতের জন্মান্তরের স্মৃতি, হয়তো বা যেদিন মাতৃগর্ভের ভয়াবহ নিদ্রা হইতে প্রথম জাগিয়া উঠিয়া পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলিয়া মানব-শিশু চারিদিকে যে-সব অপরিচিত দৃশ্যের বিভীষিকা দেখে, ইহা সেই জীবনের প্রথম মৌন আতঙ্কেরই পুনরাবৃত্তি।

তাহাদের বাড়ীর উপরের তলায় ছোট্ট একটা গুদাম ঘরের মতন ঘর ছিল। সেই ঘরের দরজাটা জাঁ-ক্রিস্তফের কাছে রীতিমত ভয়ের

বস্তু ছিল। দরজাটা খুলিলেই সামনে সিঁড়ি পড়িত, সর্বদাই তাহার মনে হইত দরজাটা কে যেন আধখানা খুলিয়া রাখিয়াছে। সেখান দিয়া যাইবার সময় তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিত, চোখ বন্ধ করিয়া লাফাইয়া পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত সেই আধ-ভেজান দরজার আড়ালে কে যেন লুকাইয়া আছে। দরজাটা যখন বন্ধ থাকিত, সে স্পষ্ট শুনিতে পাইত দরজার ওধারে কি যেন নড়িতেছে। অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়, কারণ, ঘরটার মধ্যে বড় বড় সব ইঁদুর ছিল। কিন্তু সে ভাল করিয়াই জানিত যে, দরজার অপরদিকে অন্ধকারে যে প্রাণীটি নড়িতেছে, সে ইঁদুর নয়, নিশ্চয় সেই ভয়াবহ দৈত্য, চলিতে গেলে তাহার হাড়ে হাড়ে শব্দ হয়, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতন তাহার সারা দেহ হইতে মাংস ঝুলিয়া আছে, ঘোড়ার মতন মাথা, গোল গোল জ্বলন্ত দুই চোখ, এলোমেলো চেহারা। জাঁ-ক্রিস্তফ প্রাণপণ চেষ্টা করিত, যাহাতে তাহার কথা মনে ভাবিতে না হয়, কিন্তু চেষ্টা করিতে গিয়া আরো বেশী করিয়াই তাহার কথা মনে পড়িত। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দেখিত, দরজাতে খিল লাগানো হইয়াছে কি না, সুনিশ্চিত হইয়া তবে পিছন ফিরিত। কিন্তু পুরাপুরি সুনিশ্চিত হইবার জন্য অন্তত দশবার তাহাকে ফিরিয়া দেখিয়া আসিতে হইত।

রাত্রিতে বাড়ীর বাহিরে তাহার ভয় করিত। কোন কোন দিন ঠাকুরদাদার ওখানে দেরী হইয়া যাইত, কিম্বা বাড়ীর কোন কাজে সন্ধ্যার পর তাহাকে ঠাকুরদাদার ওখানে যাইতে হইত। শহরের একটু বাহিরে, কলোন রোডের শেষ বাড়ীতে বৃদ্ধ ক্রাফ্ট বাস করিত। সেই বাড়ী আর শহরের প্রথম আলোকিত জানালার মধ্যে অনুমান প্রায় তিনশো গজ ব্যবধান ছিল, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হইত সে-ব্যবধান যেন তিন হাজার গজেরও বেশী হইবে। মাঝে মাঝে রাস্তা হঠাৎ বাঁকিয়া যাইত, তখন সামনে কিছুই আর দেখা যাইত না। সন্ধ্যার পর হইতেই পথঘাট নির্জন হইয়া যাইত, চোখের সামনে সমস্ত মাটি কালো হইয়া আসিত, মাথার উপরে আকাশ ঘনমসীবর্ণ দেখাইত। পথের দুইধারে যে সব ঝোপ ছিল, তাহা পার হইয়া যখন খাড়াই রাস্তার উপর আসিয়া পড়িত, তখনও পর্যন্ত সামনে চাহিয়া দেখিত, দূর দিগন্তরেখায় শুধু ক্ষীণ হলদে রঙের একটা আভা দেখা যাইতেছে, কিন্তু কোন আলো তাহা হইতে আসিতেছে না, রাত্রির অন্ধকারের চেয়ে তাহা যেন আরো বেশী বিভ্রান্তিকারক। দূর-দিগন্তে সেই আলোর আভাসটুকু শুধু

অন্ধকারকে আরো নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে, আলো নয় আলোর প্রেতাত্মা। মাথার উপরে আকাশ হইতে মেঘগুলি যেন মাটির দিকে ঝুলিয়া আসিত...দুধারে ঝোপ-ঝাড়, মনে হইত যেন অন্ধকার সহসা শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে...তাহার সঙ্গে যেন তাহারাও চলিতেছে। কোথাও বৃহৎ কোন বিটপী বিচিত্রমূর্তি বৃদ্ধের মতন গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তিতে পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করে, মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও যেন দ্রুততর হইয়া তাহার পিছু পিছু আগাইয়া আসিতেছে। পথের পাশে নালার ভিতর বামন-দেহ দৈত্যেরা অন্ধকারে লুকাইয়া রহিয়াছে। ঘাসের মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু কিসের যেন আলো জ্বলিতেছে, বাতাসে কাহারা যেন উড়িয়া চলিয়াছে, কোথা হইতে পতঙ্গের দল কর্কশ চিৎকার করিয়া উঠিল। সর্বক্ষণ একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্ক তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে যেন এক্ষুনি প্রকৃতির কোন বিচিত্র খেয়াল তাহার সামনে বীভৎস মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। বুকের ভিতর স্পন্দন দ্রুততর হইতে থাকে, সে ছুটিতে আরম্ভ করে।

যতক্ষণ না ঠাকুরদাদার বাড়ীর ভিতরের আলো তাহার চোখে পড়িত, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থির হইতে পারিত না। কিন্তু সকলের চেয়ে বিপদ হইত, যেদিন আসিয়া দেখিত বৃদ্ধ বাড়ীতে নাই। ইহার অপেক্ষা ভয়াবহ অবস্থা তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। এমন কি দিনের বেলাতে, শূন্য মাঠের মাঝখানে হারাইয়া-যাওয়া সেই সুপ্রাচীন ভগ্ন বাড়ীটার ভিতরে একলা থাকিতে ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত। অবশ্য ঠাকুরদাদা থাকিলে, তাহার ভয় করিত না। কিন্তু বৃদ্ধ মাঝে মাঝে তাহাকে একলা রাখিয়া কোন কিছু না বলিয়াই বাহিরে চলিয়া যাইত। তখনই হইত আসল বিপদ। নতুবা সেই বাড়ীটার সব কিছুর সহিতই তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে যাহা কিছু ছিল, সবই তাহার পরিচিত, অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাঠের তৈরী শাদা মস্ত বড় খাট, খাটের পাশে একটা ছোট্ট শেলফের উপর বড় সাইজের একখানা বাইবেল, তার পাশে ফ্রেমের উপর একরাশ কাগজের ফুল, সেই ফ্রেমের সঙ্গে আঁটা খানকতক ফটোগ্রাফ, বৃদ্ধের দুই পত্নী আর এগারোটি সন্তানের ছবি, ছেলেমেয়েদের ফটোর তলায় প্রত্যেকের জন্ম আর মৃত্যুর তারিখ বৃদ্ধের নিজের হাতে লেখা, দেয়ালের গায়ে মোজার্ট আর বিঠোফেনের রঙীণ ছবি, সেই সঙ্গে তাঁহাদের কোন

কোন সংগীত-রচনা ছবির মতন ফ্রেমে আঁটা—এ সমস্তই ছিল তাহার পরিচিত বন্ধুর মত। এক কোণে ছোট একটা পিয়ানো, আঁর এক কোণে বেহালার মতন একটা বৃহৎ আকারের তন্ত্রী; ঘরের মধ্যে স্তূপাকারে ইতস্তত ছড়ানো বই, পাইপ, জানালায় জিরেনিয়ামের ঝুরি—জাঁ-ক্রিস্‌তফের মনে হইত সে যেন চারিদিকে বন্ধুবেষ্টিতই হইয়া আছে। হয়ত পাশের ঘর হইতে শোনা যাইত, বৃদ্ধ নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, আপনার মনে কি সব মতলব ভাঁজিতেছে, নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলিতেছে, কখনও বা মূর্খ বলিয়া নিজেকেই নিজে গালা-গাল দিয়া উঠিতেছে, কখন বা বেশ গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া উঠিতেছে, পুরানো ধরণের কোন প্রেমসংগীত অথবা মার্চের সুরে মুখে মুখে সংগীত রচনা করিবার কসরৎ করিতেছে। নিরাপদ আশ্রয়, নিশ্চিন্ত অবকাশ। জাঁ-ক্রিস্‌তফ জানালার কাছে সুবৃহৎ আরাম-কেদারার মধ্যে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া একটা বই লইয়া ছবি দেখিতে বসিত, ছবির মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইত। বাহিরে ক্রমশ দিবা অবসান হইয়া আসিত, দুই চোখের পাতা ভারী ভারী বোধ হইত, বই হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া আপনার মনে আবছা সব স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়া দিত। সামনের রাস্তা দিয়া ভারী গাড়ীর চাকা শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইত, রাস্তার ওপারে মাঠে হয়ত তখনও পর্যন্ত একটা গরু চড়িয়া বেড়াই-তেছে; শহরের গির্জা হইতে সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, শান্ত তন্দ্রাতুর। স্বপ্ন-দেখা শিশুর মনে ছায়া-ছায়া কি সব বাসনা, অনাগত সুখের অস্পষ্ট পূর্বাভাস খেলা করিয়া বেড়ায়।

সহসা সেই স্বপ্নের খেলা হইতে জাঁ-ক্রিস্‌তফ জাগিয়া ওঠে, কি এক অজানা বেদনায় ভেতরটা ভার ভার লাগে। চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে...রাত্রি! কান পাতিয়া শোনে...নীরবতা! বৃদ্ধ হয়ত ঠিক সেই সময় বাহিরে চলিয়া যায়। জানিতে পারিয়া ভয়ে সে কাঁপিয়া ওঠে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করে। পথ নির্জন, শূন্য। সে-শূন্য অন্ধকারে সহসা সব কিছু যেন ভয়ংকর হইয়া উঠিতে থাকে। দোহাই ভগবান! সেটা যেন এই সময় না আসিয়া পড়ে! কে সে? তাহা সে বলিতে পারে না। শুধু জানে, সে ভয়ংকর। দরজাগুলি হয়ত ভাল করিয়া বন্ধ করা হয় নাই! কাঠের সিঁড়িতে যেন কাহার পায়ের শব্দ হইল! বালক লাফাইয়া উঠিল, আরাম কেদারাটা, দুখানা চেয়ার, আর একটা ছোট টেবিল, টানিয়া

এক সঙ্গে জড় করিয়া ঘরের কোণে লইয়া গেল। আত্মরক্ষার জন্য সেগুলি পর পর সাজাইল...আরাম-কেদারাটা একেবারে দেয়ালের গায়ে লাগাইল, তার ডান ধারে একখানা চেয়ার আর বাঁ ধারে আর একখানা চেয়ার, টেবিলটা তাহার সামনে রহিল। মধ্যস্থলে এক জোড়া চৌকি রাখিয়া তাহার উপর তাহার হাতের বইখানা এবং আরো কতকগুলি বই উঁচু করিয়া সাজাইয়া রাখিল; এইভাবে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিয়া সে স্বস্তির শ্বাস ফেলিতে পারিল; তাহার ধারণায়, কোন শত্রুই সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার নিকট আসিতে পারিবে না, অন্তত আসা উচিত হইবে না।

কিন্তু হায়! সে-শত্রু সামনের বই-এর ভিতর হইতেই হামাগুড়ি দিয়া বাহির হয়! বৃদ্ধ যেসব পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দু'একখানাতে এমন সব ছবি ছিল, যাহা বালকের মনকে তীব্র-ভাবে অকার্ষণ করিত, ভালও লাগিত, ভয়ও করিত। সাধু এন্টনীর প্রলোভনের বিচিত্র উদ্ভট আর ভয়ঙ্কর সব ছবি তাহাতে ছিল। কোন ছবিতে দেখা যাইত বোতলের ভিতর পাখীর কঙ্কাল রহিয়াছে, কোনটাতে ব্যাঙের পেট কাটিয়া গিয়া হাজার হাজার কৃমির মতন কিলবিল করি-তেছে, কোন ছবিতে শুধু একটা বৃহৎ মাথা পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে, কোনটিতে গাধারা ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে, কোন কোন ছবিতে ঘটি-বাটি বাসন-পত্র রীতিমত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া কিম্ভূতকিমাকার বৃদ্ধ মহিলার মতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই সব ছবি দেখিয়া জাঁ-ক্রিস্তফের রীতিমত ভয় করিত, কিন্তু হাতের কাছে কোন কিছু করিবার না থাকায়, বারবার সেই সব ছবিগুলিই খুলিয়া খুলিয়া দেখিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইসব ছবির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ সে মাথা তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া লুকাইয়া চারদিকে চাহিয়া দেখিত যদি সেই সব উদ্ভট মূর্তি আজ এই মুহূর্তে সজীব হইয়া তাহার সামনে উপস্থিত হয়! মনে হইত পর্দার ফাঁকের মধ্য হইতে যেন কি নড়িয়া উঠিল। একটা ডাক্তারী বই-এর ভিতর মানুষের চামড়া-ছাড়ানো একটা কঙ্কালের ছবি ছিল, সেই ছবিটিই সব চেয়ে বেশী ভয়ের কারণ। বই-এর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যখন সেই ছবির পাতার কাছে আসিত, তখন আপনা হইতে তাহার কাঁপন সুরু হইয়া যাইত। যেন তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্যই চিত্রকর সেই রক্তমাংসহীন বীভৎসতাকে আঁকিয়াছিলেন। প্রত্যেক শিশুর অন্তরে

যে সৃজনী-শক্তি থাকে, তাহার সাহায্যে জাঁ-ক্রিস্তফ সেইসব ছবির ক্ষুদ্র পরিসরকে বৃহৎ করিয়া গড়িয়া লইত। তাহার অন্তর কল্পনায় আর বাস্তবতায় এক হইয়া যাইত। কোন কোন দিন এই সব ছবির স্মৃতি তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিত যে, তাহার রাত্রির স্বপ্নে দিনের দেখা অন্য সব জীবন্ত জিনিসগুলির চেয়ে এইসব বীভৎস অবাস্তবতাই অধিকতর স্থান জুড়িয়া থাকিত।

ফলে, ঘুমাইতে তাহার ভয় করিত। মাসের পর মাস, তাহার রাত্রির নিদ্রা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে কণ্টকিত হইয়া থাকিত। ভাঁড়ার ঘরে পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনে হইত, নর্দমার নালার ভিতর দিয়া হয়ত সেই চর্মহীন কঙ্কালটি এক্ষুনি বাহির হইয়া আসিবে। ঘরে একলা বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সে যেন শুনিতে পাইত, বারান্ডা দিয়া কাহারা চলিয়া গেলু, তাড়াতাড়ি লাফাইয়া দরজার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইত, দরজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য হাতলের দিকে হাত বাড়াইত কিন্তু বাহিরের দিক হইতে হয়ত চাবি দেওয়া থাকিত, শত চেষ্টা করিয়াও আর হাতল ঘুরাইতে পারিত না, অসহায়ভাবে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া উঠিত। বাড়ীতে সকলের মধ্যে একসঙ্গে বসিয়া আছে, হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহাদের সকলের মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া গিয়াছে, যেন তাহারা উল্টাধরণে ওঠা-বসা করিতেছে। হয়ত চুপটি করিয়া একমনে পড়িয়া যাইতেছে, মনে হইল কে একজন লোক অদৃশ্য-ভাবে তাহার চারিদিকে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ভয়ে সেখান হইতে পালাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু মনে হয় তাহার পা কে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কাঁদিয়া উঠিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া থাকে, কে যেন বিশ্রীভাবে সমস্ত কণ্ঠটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙিগয়া যায়, মনে হয় যেন আর একটু হইলেই দম বন্ধ হইয়া যাইত, জাগিয়া উঠিবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে, সেই যন্ত্রণার হাত হইতে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না।

যে-ঘরে সে ঘুমাইত, সেটাকে ঘর না বলিয়া একটা গর্ত বলিলেই ঠিক হয়,—দরজা, জানলা কিছুই ছিল না। তাহার বাবা ও মা যে-ঘরে শুইত, সে-ঘর হইতে একটা পর্দা ঝুলাইয়া তাহার এই গর্তটিকে আলাদা করা হইয়াছিল। বন্ধ ঘরের পুরু ঘন বাতাসে দম বন্ধ হইয়া আসিত। তাহার ছোট ভাই, তাহার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুইত, প্রয়োজন হইলেই ঘুমের মধ্যে তাহাকে লাথি ছুঁড়িয়া মারিত। মাথার

ভিতর মাঝে মাঝে কেমন যেন জ্বালা করিত, দিনের বেলা যে সব ছোটখাট্টো অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হইত, রাত্রিবেলা তাহারা যেন শতগুণে বর্ধিত হইয়া তাহার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত, এবং প্রতিদিন এই একই যন্ত্রণা নিয়মিতভাবে তাহাকে ভোগ করিতে হইত। এই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তাহার স্নায়ু এতখানি উত্তেজিত হইয়া থাকিত যে, সে ভুল বকিতে আরম্ভ করিত এবং তখন একটুখানি কিছু ব্যাঘাত ঘটিলেই ভয়ংকর বেদনাদায়ক মনে হইত। তক্তপোষে সামান্য শব্দ হইলেই সে ভয়ে চমকাইয়া উঠিত। মেলশিয়রের নাক ডাকার আওয়াজ হাজারগুণ তীব্র হইয়া তাহার কানে লাগিত, মনে হইত যেন রাক্ষুসে আওয়াজ, সেই সুপ্ত দেহের ভিতর হইতে যেন কোন দৈত্য গর্জন করিতেছে। ত্রিযামা রাত্রির সুদীর্ঘ অন্ধকার যেন তাহার বুকে চাপিয়া বসিত, মনে হইত যেন সে-অন্ধকার অনাদিকাল হইতেই এমনি রহিয়াছে, এমনিই রহিবে ; যেন মাসের পর মাস সে সেই অন্ধকারে শুইয়া আছে। জোর করিয়া নিশ্বাস লইতে চেষ্টা করিত, বিছানা হইতে দেহকে খানিকটা তুলিয়া উঠিয়া বসিত, জামার হাতা দিয়া ঘর্মাক্ত মুখ মুছিয়া লইত। কখনও বা হাতের ধাক্কায় ছোট ভাই রুডলফকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু নিদ্রার মধ্যে উত্যক্ত হইয়া রুডলফ সমস্ত চাদরটা তাহার দিকে টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িত।

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রণায় সে বিছানায় জাগিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিত, কখন পর্দার নীচে প্রভাতী আলোর প্রথম ক্ষীণ আভা আসিয়া দেখা দেয়। অদূরাগত ঊষার ম্লান আলোর কম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা তাহার মনের শান্তি ফিরিয়া আসিত। সে স্পষ্ট অনুভব করিত, পাশের ঘরের জানালার ভিতর দিয়া ঊষার আলো একটু একটু করিয়া প্রবেশ করিতেছে, যদিও তখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে কোন কিছু স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইত না। আলোর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাত্রির বিকার বন্ধ হইয়া যাইত, স্নায়ুতে রক্তের ধারা আবার শান্ত শীতল হইয়া আসিত, বন্যা-উপপ্লুত নদী আবার তাহার স্বাভাবিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করিত। সারা দেহ এক স্নিগ্ধ উত্তাপের স্পর্শে সচকিত হইয়া উঠিত, রাত্রির নিদ্রাহীনতার দরুণ চোখ তখনও জ্বালা করিতে থাকিলেও আপনা হইতে তাহা সুখে বুঁজিয়া আসিত।

তাই সন্ধ্যা হইলেই সে আপনা হইতে সজাগ হইয়া উঠিত, নিদ্রার লগ্ন যতই আগাইয়া আসিত, ততই তাহার শঙ্কা বাড়িতে থাকিত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই সে আর দুঃস্বপ্নের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিবে না, সারা রাত্রি তাহার অপেক্ষায় যদি জাগিয়া থাকিতে হয়, সে জাগিয়াই থাকিবে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মনে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু শয্যায় শায়িত হইয়া বেশী-ক্ষণ আর সে জাগিয়া থাকিতে পারে না, কখন্ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া ঘুমইয়া পড়ে, সেই অবসরে আবার একে একে ফিরিয়া আসে সেই সব কায়াহীন ভয়ঙ্করের দল...

রাত্রি! অধিকাংশ শিশুর কাছেই অতি-বাঞ্ছিত, মনোরম...কাহারও কাহারও কাছে ভয়ঙ্করী, বিভীষিকাময়ী! ...ঘুমাইতে তাহার ভয় করে। জাগিয়া থাকিলেও নিস্তার নাই। ঘুমন্ত কি জাগ্রত, দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মূর্তি প্রেতচরেরা তাহাকে ঘিরিয়া একে একে জমা হইতে থাকে, তাহারই মস্তিষ্কের সৃষ্ট সব প্রেতমূর্তি...শৈশবের আধ-আলো আধ-ছায়া চেতনার অস্পষ্ট-লোক ভয়ের জীবাণুতে ভরিয়া ওঠে।

কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই একদা এই সব কল্পিত ভয়ের ছায়া-মূর্তি নিশ্চিহ্নে মিলাইয়া যাইবে...তাহার স্থলে জাগিয়া উঠিবে সেই মহা-ভয়—প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই অটল অধিষ্ঠিত যাহার আসন, যাহাকে ভুলাইবার জন্য, যাহাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য মানুষের জ্ঞানের কত না ব্যর্থ প্রয়াস...মৃত্যু তার নাম।

একদিন আলমারি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, জাঁ-ক্রিস্তফের নজরে পড়িল, একটা খুব ছোট্ট ফ্রক, আর একটা ডোরা-কাটা বনেট। সেই অপ্রত্যাশিত সন্ধানে উল্লসিত হইয়া লুইসার নিকট সেই দুইটি জিনিস সে যখন উপস্থিত করিল, দেখিল, জননী খুশি হওয়া দূরে থাক্ উল্টা মুখ ভার করিয়া যেখানকার জিনিস সেখানে অবিলম্বে রাখিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিল। জাঁ-ক্রিস্তফ কিন্তু সেই আদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল এবং কেন এই আদেশ করা হইল, তাহা জানিতে চাহিল। জননী বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না দিয়া তাহার হাত হইতে জিনিস দুইটি টানিয়া কাড়িয়া লইয়া সেল্ফের উঁচু থাকে রাখিয়া দিল, যাহাতে জাঁ-ক্রিস্তফ তাহার নাগাল না পায়। জাঁ-ক্রিস্তফের কৌতূহল বাড়িয়াই উঠিল, জননীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে

উত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে লুইসা জানাইতে বাধ্য হইল, তাহার জন্মের আগে তাহার একটি ভাই জন্মিয়াছিল, এবং তাহার আসিবার আগেই সে মরিয়া গিয়াছে। জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হইয়া গেল, তাহার কথা তো কাহারও মুখে সে শোনে নাই! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জননীর নিকট হইতে এই সম্পর্কে আরো কিছু সংবাদ আদায় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখিল, তাহার প্রশ্নে মা যেন আরো বিব্রত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রশ্নে প্রশ্নে মা শুধু এইটুকু জানাইল, তাহারও নাম জাঁ-ক্রিস্তফ ছিল, তবে সে নাকি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল। জাঁ-ক্রিস্তফ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু লুইসা সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকু জানাইল, সে এখন স্বর্গে আছে এবং সেখানে থাকিয়া তাহাদের সকলের জন্য সে প্রার্থনা করিতেছে। ইহার বেশী কিছু আর জাঁ-ক্রিস্তফ জননীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিল না। লুইসা ধমক দিয়া উঠিল: 'থাম, বাজে আর বকতে হবে না, কাজ করতে দে আমাকে!'

একমনে লুইসা সেলাই করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হইল, মা যেন মনে মনে কি ভাবিতেছে। কিছুক্ষণ পরে লুইসা চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, জাঁ-ক্রিস্তফ কোথায় কি করিতেছে, দেখিল, এক কোণে সে বসিয়া আপনার মনে কি যেন ভাবিতেছে। লুইসা হাসিয়া তাহাকে বলিল: 'যা, বাইরে গিয়ে খেলা করগে যা!'

এই একটুখানি কথাবার্তা জাঁ-ক্রিস্তফের মনে কিন্তু গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তাহার আগে এই বাড়ীতে আর একটি শিশু আসিয়াছিল, তাহারই মতন সে-ও লুইসাকে মা বলিত, তাহারই মতন তাহারও নাম জাঁ-ক্রিস্তফ ছিল, ঠিক তাহারই মতন আর একজন... এখন সে নাই, সে মরিয়া গিয়াছে! মরিয়া গিয়াছে, কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝে, মরিয়া যাওয়া একটা রীতিমত ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার। জাঁ-ক্রিস্তফ আরো অবাক হইয়া যায়, যখন ভাবে সেই শিশুটির সম্বন্ধে তাহারা কেউ তো কোন কথাই বলে না...তাহার কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে...সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। যদি সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে এমনি করিয়া তাহাকেও সকলে ভুলিয়া যাইবে! সারাদিন এই এক ভাবনা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল, সন্ধ্যার সময় খাবার-টেবিলে যখন সকলে বসিয়া এটা-সেটা লইয়া কথা বলিতেছে, তখনও পর্যন্ত জাঁ-ক্রিস্তফ নিজের

মনে মনে সেই এক কথাই ভাবিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে সে চলিয়া গেলে তাহারা এমনি হাসিবে, খাইবে, আনন্দ করিবে? সে কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহার জননী এতদূর স্বার্থপর যে সে মরিয়া গেলেও সে এমনিভাবে হাসিবে! ভাবিতে ভাবিতে তাহার কান্না পায়। নিজের জন্য যেন নিজেই খানিকটা কাঁদিয়া লয়...সেই সঙ্গে তাহার মনে একরাশ প্রশ্ন মাথা তুলিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। মনে পড়িয়া যায়, কি কঠিনভাবে লুইসা তাহাকে এই সব প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু একদিন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য বিছানায় শুইয়াছে, লুইসা স্নেহ-চুম্বন দিবার জন্য আসিয়াছে, সে সহসা প্রশ্ন করিয়া উঠিল: 'মা, সে কি এই বিছানাতেই শুতো?'

বেচারা লুইসা সেই অকস্মাৎ প্রশ্নে কাঁপিয়া ওঠে। চেষ্টা করিয়া উদাসীন কণ্ঠে বলে: 'কে?'

জাঁ-ক্রিস্তফ চুপি চুপি উত্তর দেয়: 'সেই যে-ছোট্ট ছেলেটা মরে গিয়েছে!' জননী দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। বলে: 'চুপ কর, চুপ কর! ঘুমো!'

লুইসার কণ্ঠস্বর কান্নায় কাঁপিতেছিল। জাঁ-ক্রিস্তফের মাথা জননীর বুকের সঙ্গে লাগিয়াছিল, সে শুনিতে পাইতেছিল, লুইসার বুকের ভিতর কি দ্রুত স্পন্দন চলিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর লুইসা বলে: 'তার কথা আর কোনদিন মুখে আনিস না, বুঝলি? ঘুমোও সোনা!...না বাবা, এ বিছানায় সে শুতো না!'

লুইসা পুত্রকে চুম্বন করে।

হঠাৎ জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হয় লুইসার দুই গণ্ড যেন অশ্রুজলে ভিজিয়া গিয়াছে। সে ভাল করিয়া দেখে। তাহার অনুমান সত্য। এতক্ষণ পরে সে যেন মনে শান্তি পায়। খানিকটা তৃপ্ত বোধ করে। তাহা হইলে, সে মরিয়া গেলে, তাহার মা এমনি কাঁদিবে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাহার আবার সন্দেহ জাগে, পাশের ঘর হইতে শুনিতে পায়, তাহার জননী একান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবেই কথা বলিতেছে। তাহা হইলে কোন্‌টা সত্য? এই একটু আগে যাহা অনুভব করিয়াছে, না, এখন যাহা শুনিতেছে? বহুক্ষণ ধরিয়া বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ভাবিতে থাকে। এ প্রশ্নের কি উত্তর? সে চায়

জননীকে বেদনাতুর দেখিতে। অবশ্য, জননীর দুঃখে যে তাহারও দুঃখ হয় না তাহা নয়, তবুও...সে যদি কোন রকমে জানিতে পারিত,...তাহা হইলে অনেক দুঃখের মধ্যেও তাহার অনেকখানি ভাল লাগিত। সে বুঝিতে পারিত, সে যতখানি নিজেকে একলা মনে করে, সত্যই ততখানি একলা সে নয়। একই বেদনায় তাহারা মাতা-পুত্রে পরমাত্মীয় হইয়া আছে। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরের দিন সে-সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তার মনে থাকে না।

কয়েক সপ্তাহ পরে...রাস্তার যে সব ছেলের সঙ্গে সে খেলা করিত, একদিন তাহাদের মধ্যে একটি ছেলে আসিবার নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল না...কে একজন খবর দিল যে তাহার অসুখ করিয়াছে। দিনের পর দিন তাহার অনুপস্থিতি কেহ আর লক্ষ্য করিত না। অসুখ হইয়াছে, তাই আসে না। সহজ ব্যাপার। একদিন সন্ধ্যার পর জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিছানায় শুইয়া আছে। সেদিন একটু সকাল-সকালই সে শুইয়াছে, তাহার বিছানা হইতে সামনের ঘরের আলো তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ মনে হইল, কে যেন দরজায় কড়া নাড়িল। হয়ত কোন প্রতিবেশী, গল্প করিতে আসিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে পাশের ঘরে কান রাখিয়া সে অভ্যাসমত নিজেকে নিজেই গল্প শুনাইতে লাগিল। পাশের ঘরের সব কথাবার্তা তাহার কানে স্পষ্ট পোঁছাইতে ছিল না। হঠাৎ তাহার কানে আসিল, প্রতিবেশীটি বলিতেছে: 'সে মরে গিয়েছে!' জাঁ-ক্রিস্‌তফের রক্ত চলাচল যেন হঠাৎ বন্ধ হইয়া আসে, সে বুঝিতে পারে, কে মরিয়াছে! নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে কান পাতিয়া থাকে। তাহার বাবা-মা হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া ওঠে। মেলশিয়র ভারী গলায় তাহাকেই ডাকিয়া বলে: ক্রিস্‌তফ, শুনেছিস্? বেচারা ফ্রিজ্ মারা গেল!'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ হঠাৎ কোন কিছুই উত্তর দিতে পারে না। চেষ্টা করে। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলে: 'হাঁ, বাবা!' কে যেন দড়ি দিয়া তাহার সমস্ত বুকটাকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে।

পাশের ঘর থেকে মেলশিয়র ব্যঙ্গের সুরে বলে: 'হাঁ বাবা! শুধু এইটুকু? এই হলো জবাব? শুনে তোর একটুও দুঃখ হলো না রে?'

কিন্তু লুইসা চিনিত জাঁ-ক্রিস্‌তফকে। তাই মেলশিয়রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া উঠিল: 'আচ্ছা, থামো! ওকে ঘুমোতে দাও তো এখন!'

চাপা গলায় স্বামী স্ত্রী কথা বলিতে থাকে, জাঁ-ক্রিস্‌তফ কান খাড়া

করিয়া সব শুনিতে পায়—কি ভাবে ফ্রিজের অসুখ হইয়াছিল, টায়ফয়েড, ঠাণ্ডা জলের বাথ্, বিকার...ফ্রিজের মা-বাবার দুঃখ...

ক্রমশ নিশ্বাস লইতে তাহার ভীষণ কষ্ট হইতে থাকে, গলার ভিতর কি যেন একটা আটকাইয়া রহিয়াছে। বাবা মা'র কথাবার্তা হইতে সে বুঝিতে পারে যে, যে-অসুখে ফ্রিজ মারা গিয়াছে, সেটা নাকি ভয়ানক ছোঁয়াছে, তার মানে, তাহারও সেই অসুখ হইতে পারে এবং ফ্রিজ যে-ভাবে কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, সে-ও সেইভাবে মরিয়া যাইতে পারে। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া আসে। মনে পড়ে, যেদিন ফ্রিজ অসুস্থ হইয়া খেলিতে আসে নাই, ঠিক তাহার আগের দিন সে তাহার সহিত করমর্দন করিয়াছিল এবং সেইদিন তাহার বাড়ীর পাশ দিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল। পাছে কোন কথা বলিতে হয় সেই ভয়ে সে বিছানায় চুপটি করিয়া শুইয়া রহিল, কোন শব্দ করিল না; এমন কি, প্রতিবেশীটি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, মেলশিয়র যখন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল: 'ক্রিস্তফ, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?' সে কোন সাড়াই দিল না। শুনিতে পাইল মেলশিয়র তাহার মাকে বলিতেছে: 'ছেলেটার প্রাণ বলে কোন পদার্থ নেই, বুঝলে!'

লুইসা কোন প্রত্যুত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে ধীরে পর্দাটা তুলিয়া সে একবার জাঁ-ক্রিস্তফের বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিল। মার সাড়া পাইয়াই সে চোখ বন্ধ করিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস লইতে লাগিল, ঘুমাইবার সময় তাহার ছোট ভাইদের যে-ভাবে নিঃশ্বাস লইতে সে দেখিয়াছে। লুইসা পা-টিপিয়া নিঃসাড়ে সরিয়া গেল। জাঁ-ক্রিস্তফের মনে তখন দুরন্ত ইচ্ছা হইতেছিল, কিছুক্ষণ মাকে তাহার কাছে আটকাইয়া রাখে, তাহাকে ডাকিয়া জানায়, কতখানি ভয় সে পাইয়াছে। তাহার দুরন্ত বাসনা হইতেছিল যে সে-ভয়ের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য, অন্তত কিছু সান্ত্বনা দিবার জন্য, তাহার পাশে বসে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া পাছে তাহারা হাসিয়া ওঠে, তাহাকে ভীরু মনে করে, এই আশঙ্কায় সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, সে ভাল করিয়াই জানিত, তাহারা যে সব কথা বলিবে, তাহাতে তাহার কোন লাভই হইবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জাগিয়া বিছানায় ছটফট করিতে থাকে, তাহার মনে হয় যেন সেই কালব্যাধি তাহাকে সত্যই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের কথাবার্তায় রোগীর যে-সব যন্ত্রণার লক্ষণের কথা সে শুনিয়াছিল, একে একে নিজের অঙ্গে সেই সব যন্ত্রণা যেন অনুভব

করিতে থাকে; ক্রমশ চরম ভয়ে ভাবিতে সুরু করিয়া দেয়: 'এই হয়তো শেষ...ফ্রিজ মারা গিয়েছে আমিও মরে যাবো... হয়ত মরে যাচ্ছি...!' কল্পনায় আর বাস্তবে এমনভাবে জড়াইয়া এক হইয়া গিয়াছিল যে, সেই বিভীষিকার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল, মৃদুকণ্ঠে মাকে ডাকিয়া উঠিল; কিন্তু তাহারা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জোর করিয়া ডাকিয়া তুলিতে সাহসে আর কুলাইল না।

সেই ঘটনার পর হইতে তাহার সমগ্র শৈশব মৃত্যুর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া যায়! সামান্য কিছু হইলেই সে মনে করিত নিশ্চই কোন কঠিন অসুখ হইয়াছে, অনেক সময় তাহার জন্য কোন অসুখ হইবারও প্রয়োজন হইত না। স্নায়ুগ্রস্ত লোকের মতন কখনো বিষণ্ণ হইয়া থাকিত, কখনও বা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। কল্পনায় সে হাজার রকম দুঃখবেদনার সৃষ্টি করিত এবং প্রত্যেকটি দুঃখের আড়ালে মনে করিত তাহার জীবন-অপহরণকারী সেই দৈত্যটি লুকাইয়া আছে। কতবার মার সামনে বসিয়াই সে মনে মনে সেই কল্পিত যন্ত্রণার দুঃসহ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত অথচ মা তাহার কিছুই জানিত না। তাহার মনের মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র ভাবনা এক সঙ্গে এলোমেলোভাবে ভিড় করিয়া থাকিত, সে ভয়ও পাইত, সেই সঙ্গে আবার সেই ভয়কে সংগোপনে রাখিবার সাহসও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। অপরের করুণাপ্রার্থী হইতে তাহার গর্বে বাধিত, নিজে যে ভয় পাইয়াছে, তাহার দরুণ লজ্জাও বোধ করিত; জননীর প্রতি এমন একটা সজাগ মমতাবোধ ছিল যে সব সময় নিজের ব্যাপার লইয়া জননীকে উত্যক্ত করিতেও তাহার কুণ্ঠায় বাধিত। অথচ মনের সেইসব দুর্ভাবনা বন্ধও করিতে পারিত না...'এবার নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে খুব কঠিন অসুখ...বোধ হয় ডিপ্‌থিরিয়া'...সম্প্রতি কোথা হইতে ডিপ্‌থিরিয়ার কথা শুনিয়া থাকিবে...'দোহাই ভগবান! এবারটি যেন না হয়...'

ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট ধর্মভাবও জাগিয়া উঠিতেছিল। মার মুখ হইতে যাহা শুনিত, পুরাপুরি তাহা বিশ্বাস করিয়া লইতেও পারিত না। প্রায়ই শুনিত, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নাকি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীতে যদি পুণ্যকাজ করিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর সেই আত্মা নন্দনকাননে প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু এই নন্দনকাননে যাত্রার ব্যাপারটা শুনিতে

ভাল লাগিলেও মনে আতঙ্কেরই সৃষ্টি হইত। মার কাছে সে শুনিত, ভগবান নাকি তাঁর অসীম করুণায় কোন কোন মানবশিশুকে ঘুমের মধ্যেই তাঁহার নিকট টানিয়া লন এবং সে-সব শিশুর তখন আর কোনই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই শ্রেণীর শিশুদের তথাকথিত সৌভাগ্যে তাহার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা জাগিত না। ঘুমাইবার সময় এই কথা মনে পড়িলেই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত, যদি আজ রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে ভগবান তাহার উপর দিয়াই তাঁহার সেই খেয়াল চরিতার্থ করিয়া বসেন! এই শয্যার স্নিগ্ধ উত্তাপ হইতে হঠাৎ তাহাকে যদি মহাশূন্যের ভিতর দিয়া ভগবানের কাছে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেটা খুব প্রীতিদায়ক ভ্রমণ হইবে না। মনে মনে সে ভগবানকে প্রকাণ্ড আর এক সূর্যের মতন কল্পনা করিয়া লাইয়াছিল, বজ্রের মতন যাহার কণ্ঠস্বর। সে-উত্তাপ সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? নিশ্চয়ই তাহার চোখ, মুখ, কান...আত্মাও জ্বলিয়া যাইবে! আর একটা মস্ত বড় কথা, ভগবান শাস্তি দিতেও পারেন, কে জানে?...তাহা ছাড়া, সে শুনিয়াছে আরো অনেক যন্ত্রণার ব্যাপার নাকি আছে, সেগুলির সঠিক পরিচয় যদিও তাহার জানা নাই, তবে যতটুকু শুনিয়াছে তাহা হইতে তাহাদের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহই থাকে না এবং সকলের চেয়ে বিপদের কথা, সেগুলির হাত হইতে নাকি কেহই রেহাই পায়ও না...একটা কাঠের বাক্সের ভিতর দেহটাকে বন্ধ করিয়া রাখিবে...গর্ত করিয়া মাটির তলায় নামাইয়া দিবে ...দোহাই ভগবান! কি যাতনা! সে কি অসহ্য কষ্ট!

কিন্তু তবুও, বাঁচিয়া থাকার মধ্যেও তো বিশেষ কোন আনন্দের কারণ নাই! বাঁচিয়া থাকিলেই ক্ষুধা পায়, মাতাল হইয়া পিতা বাড়ী ফিরিতেছে দেখিতে হয়, পাড়ার অন্য ছেলেদের হাতে নানারকমের নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, বড়রা তাচ্ছিল্য করিয়া যখন তখন অপমান করে, মনের কথা কেহই বুঝিতে চায় না, এমন কি নিজের মাও নয়। সবাই তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভালো তো কেহই বাসে না। একলা, সম্পূর্ণ একলা সে থাকে...কেহ তাহা ভাবিয়াও দেখে না। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত আর এক চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে। সেই জন্যই, হাঁ, সেই জন্যই তো সে বাঁচিয়া থাকিবে, লোকে যাহাতে তাহাকে ভ্রূক্ষেপ করিয়া চলে, তাহাই সে দেখিবে! মনের মধ্যে একটা তীব্র আক্রোশ—একটা রহস্যময় প্রাণ-শক্তি তাহাকে উদ্বেল করিয়া তোলে।

বিচিত্র সে-শক্তি! আপাতত তাহার কোন ক্রিয়া নাই। এখনো যেন তাহা বহু দূরে, যেন অবরুদ্ধ, আবৃত, অচল পড়িয়া আছে; আজ সে বুঝিতে পারে না, কি তাহার দাবী, কী বা সে দিবে। কিন্তু তাহার মধ্যে সে আজ তাহাকে অনুভব করিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তাহার নাই: ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য সে-শক্তি তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। হয়ত আগামী কাল সুরু হইবে তাহার বিজয়-অভিযান। সমস্ত অন্তর আলোড়িত করিয়া দুরন্ত এক দুর্বার বাসনা জাগিয়া ওঠে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে হইবে, যাহা দুঃসাধ্য, তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে! উল্লাসে চিৎকার করিয়া ওঠে, 'উঃ! যখন আমার বয়স হবে...' কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লয়: 'আঠারো...হাঁ...আঠারো...' কখন কখন ভাবিয়া বয়সটা একুশে টানিয়া আনে, সেইটেই শেষ সীমা। পৃথিবী-জয়ের পক্ষে একুশ বছরই যথেষ্ট। যে সব বীরপুরুষদের সে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে, তাহাদের কথা স্মরণ করে, নেপোলিয়াঁ...তার চেয়েও দূর-কালে, আলেকজান্দার দি গ্রেট...নিশ্চয়ই সে তাহাদের সমকক্ষ কীর্তি অর্জন করিবে, কোন সন্দেহ তাহাতে নাই, যদি সে কোন রকমে আর দশ বছর...না হয় বারো বছর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ত্রিশ বৎসর বয়সে যাহারা কিছু না করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের জন্য জাঁ-ক্রিস্তফের কোন সমবেদনা নাই। তাহারা বৃদ্ধ...দীর্ঘ জীবন তাহারা পাইয়াছে, তাহাতেও যদি তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে না পারিয়া থাকে, তাহা তাহাদেরই দোষ। কিন্তু এখনই যদি তাহাকে মরিয়া যাইতে হয়!... সর্বনাশ! চিরকাল লোকের মনে সে ছোট্ট শিশুটি হইয়াই থাকিবে, যে-শিশুকে যে-খুশি সে ধমক দিতে পারে! ইহার অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি হইতে পারে! ভাবিতে ভাবিতে অসহ্য রাগে আর দুঃখে কাঁদিয়া ওঠে, যেন সে সত্যই মরিয়া যাইতেছে!

এই মৃত্যু-ঘন ভয়ার্ত ছায়ার মধ্যেই, তিমিরঘন রাত্রির প্রেত-কণ্টকিত অসহায় বেদনার মধ্যেই, মহাশূন্যের নিঃসীম আঁধারে শুকতারার মতন, একদিন তাহার অন্তর-আকাশে সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠিল আলোর শিখা, যে-আলোতে তাহার সমগ্র অনাগত জীবন আলোকিত হইয়া থাকিবে: দিব্য সঙ্গীত...

বৃদ্ধ ক্রাফট তাঁহার পৌত্রদের একটা পুরানো পিয়ানো উপহার দিয়াছিলেন। বৃদ্ধের এক পুরাতন মক্কেল এই জরাজীর্ণ যন্ত্রটি গুরু-

দক্ষিণাস্বরূপ দান করে। বৃদ্ধ তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া তাহার উপর তাহার যন্ত্রবিদ্যার কসরৎ প্রয়োগ করিয়া একরকম চলনসই করিয়া তোলে। কিন্তু বৃদ্ধের উপহারটি বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইল না। লুইসা আপত্তি তোলে, ইতিমধ্যেই তাহার ছোট্টঘরে একান্ত স্থানাভাব, তাহার মধ্যে সেই জীর্ণ পিয়ানোর স্থান হইবে কিভাবে? মেলশিয়রও স্পষ্ট ঘোষণা করিল, বৃদ্ধ অকারণেই উহার জন্য খাটিয়া মরিয়াছে, উহা আর বাজনা নয়, স্রেফ জ্বালানি কাঠ। একমাত্র জাঁ-ক্রিস্তফই খুশি হইল, তাহার মনে হইল, পিয়ানোটা যেন যাদুকরের মায়া-যন্ত্র, তাহার ভিতর আশ্চর্য সব কাহিনী লুকাইয়া আছে, রূপকথার কাহিনীর মতন, 'আরব-রজনীর সহস্র কাহিনী'র মতন, যেসব কাহিনী সে তাহার পিতামহের মুখে শুনিয়াছে, তাহাদের মতন কত না বিচিত্র কাহিনী সেই যন্ত্রটির ভিতর ঘুমাইয়া আছে। পিয়ানোটি যেদিন প্রথম বাড়ীতে আসে, সেদিন তাহার বাবা একবার বাজাইয়া দেখিয়াছিল। বর্ষার এক পশলা বৃষ্টির পর দমকা হাওয়ার তাড়নে সিক্ত শাখা থেকে যেভাবে টুপ টাপ করিয়া বৃষ্টির বিন্দু ঝরিয়া পড়ে, তেমনি ধারা সেই পিয়ানোর ভিতর হইতে মেলশিয়রের অঙ্গুলি স্পর্শে যেন বিন্দু বিন্দু আনন্দ ঝরিয়া পড়িল। বালক আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল: 'আঁকুর!'—'আবার!' মেলশিয়র কিন্তু অবজ্ঞাভরে পিয়ানো বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল: 'অপদার্থ!' জাঁ-ক্রিস্তফ আর অনুরোধ করিল না বটে কিন্তু সেই দিন হইতে যন্ত্রটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন দেখিত কাছে ভিতে কেহ নাই, পিয়ানোর ডালাটা তুলিয়া অতি সন্তর্পণে একটা চাবি টিপিয়া ধরিত, যেন কোন বৃহৎ প্রাণীর জীবন্ত অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। মনে হইত, সেই যন্ত্রের ভিতরে যে সব প্রাণী বন্দী হইয়া আছে, তাহাদের সকলকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। কখন বা তাড়াতাড়িতে এত জোরে টিপিয়া বসিত যে শব্দ শুনিয়া মা ধমক দিয়া উঠিত: 'বলি, আবার গোলমাল করছিস্? সব জিনিস তোর না ছুঁলেই নয়!' কখন বা তাড়াতাড়িতে ডালাটা নামাইবার সময় আঙ্গুল চিপটাইয়া যাইত, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি করিয়া আপনার মনে আহত আঙ্গুল চুষিতে আরম্ভ করিত।...

যন্ত্রটি আসার পর হইতে, সে সর্বদাই সুযোগ খুঁজিত, কখন সে বাড়ীতে একলা থাকিতে পাইবে। যখন তাহার মা কোন কাজে শহরে যাইত কিম্বা কাহারও সহিত দেখা করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টার মতন

বাড়ী হইতে বাহির হইত, তখন বালকের আনন্দের অবধি থাকিত না। কান খাঁড়া করিয়া শুনিত, মা সিঁড়ি দিয়া নামিল, দরজা পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল, ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল। এখন বাড়ীতে সে একা। একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া পিয়ানোর সামনে গিয়া বসে, ডালা খুলিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। চাবির ঘরগুলো তাহার কাঁধ বরাবর থাকে, কোন রকমে তাহাতেই তাহার কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু বাজাইবার আগে, কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া সে যেন নিজেকে সংবরণ করিয়া লয়। যখন লোকজন থাকে, তখনও সে ইচ্ছা করিলে বাজাইতে পারে, অবশ্য যদি বিশেষ গোলমাল না হয়। কিন্তু লোকজনের সামনে তাহার লজ্জা করে, বাজাইতে পারে না। তা ছাড়া, বাজাইবার সময় তাহারা গল্প করে, ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে তাহার ব্যাঘাত জন্মায়, আনন্দ কাটিয়া যায়। তাই যখন সে একা থাকে, তাহার এত ভাল লাগে! পিয়ানোর সামনে বসিয়া কয়েক মুহূর্ত সে যেন নিজের নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার নিঃশ্বাসের শব্দটুকু যেন চারিপাশের নীরবতাকে ক্ষুণ্ণ না করে। পিয়ানোর দিকে হাত তুলিতেই সহসা তাহার সমগ্র দেহ কি এক সুতীব্র উত্তেজনায় কাঁপিতে থাকে, যেন এই মুহূর্তেই তাহার হাতের বন্দুক হইতে গুলি ছুটিয়া বাহির হইবে! চাবিতে আঙ্গুল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া ওঠে। একটা চাবি একটুখানি টিপিবার পর সে আঙ্গুল তুলিয়া লয়, তারপর ধীরে ধীরে আর একটা চাবির উপর রাখে। দ্বিতীয় চাবিটার ভিতর হইতে কি রকম শব্দ বাহির হইবে? প্রথম চাবিটার শব্দের মতন? না, আর একটা আওয়াজ? আগে হইতে সে কিছুই অনুমান করিতে পারে না। একটার পর একটা চাবি টিপিয়া যায়, নানারকমের বিচিত্র আওয়াজ জাগিয়া ওঠে, কোনটা তীব্র, কোনটা উচ্চ, কোনটা গর্জমান, কোনটা বা ঘণ্টার মত মৃদু টুং টাং করিয়া শোনে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে-শব্দ ক্ষীণ হইয়া নিঃশেষে মিলাইয়া যায়, ততক্ষণ কান পাতিয়া থাকে। দূরাগত ঘণ্টা ধ্বনির মত বাতাসে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, কখনো দূর হইতে বাতাসে আগাইয়া আসে, কখন বা দূরে মিলাইয়া যায়। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে মনে হয় দূর হইতে যেন অন্য আলাদা সব আওয়াজ, পতঙ্গের আওয়াজের মতন, তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। বালকের মনে হয় যেন সদাজাগ্রত সেই সব শব্দ চলিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে ডাকিয়া যাইতেছে, দূরে,

বহু দূরে, যে অজানা রহস্যলোকে গিয়া তাহারা অবশেষে নিঃশেষে ডুবিয়া হারাইয়া যাইবে, সেইখানে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছে,... ...হায়! হারাইয়া যায় সুর...তাই কি? তবে, কোথা হইতে আসিতেছে এই গুঞ্জন?...যেন ক্ষুদ্র পতঙ্গের অতি ক্ষুদ্র পক্ষ-বিতাড়নের শব্দ...কি বিচিত্র! কি অপরূপ! জাঁ-ক্রিস্‌তফের স্পষ্ট ধারণা হয়, ইহারাই সেই রূপকথার অশরীরী প্রাণী, দেহ নাই অথচ যাহারা আছে। কিন্তু কি করিয়া তাহাদের এত অনুগত করিয়াছে মানুষ? কি উপায়ে তাহাদের এই পুরানো বাক্সের ভিতর বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে? সব চেয়ে অদ্ভুত লাগে, যখন দুইটা চাবির উপর এক সঙ্গে আঙগুল গিয়া পড়ে, তখন যে কি বাহির হইয়া আসিবে, তাহা আগে হইতে অনুমান করা তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়ে। হয়ত দুজনার মধ্যে শত্রুতা ছিল ...জাগিয়া উঠিয়া একজন আর একজনের উপর ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া ওঠে, ঝগড়া করিতে সুরু করিয়া দেয়, ঘৃণায় দুইজনে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে করিতে পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া যায়। জাঁ-ক্রিস্‌তফের মন বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় ভরিয়া ওঠে, সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, সেই পুরানো বাক্সের ভিতর অসংখ্য দৈত্য-দানব শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে, সে স্পষ্ট শুনিতে পায়, বন্ধন-শৃঙ্খলের গায়ে দাঁত বসাইয়া তাহারা রাগে গর্জন করিতেছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পে সে শুনিয়াছিল, সলোমন এমনি এক দৈত্যকে বোতলের ভিতর ছিপি আঁটিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল; সেই বন্দী দৈত্য বোতল ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেমন ছটফট করিত, জাঁ-ক্রিস্‌তফের মনে হয়, এই বাক্সের ভিতর বন্দী দৈত্যেরাও তেমনি তাহাদের কারাগার ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। মাঝে মাঝে আবার কোন কোন দৈত্য এমন আওয়াজ করিয়া ওঠে, মনে হয় যেন তাহারা খোসামোদ করিতেছে, তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তবু সংশয় জাগে মনে, বুঝি তাহারা সুযোগ পাইলেই দংশন করিবে। জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিতে চেষ্টা করে কিন্তু বুঝিতে পারে না, তাহারা কি চায়, তবে এইটুকু বুঝিতে পারে, তাহারা যেন তাহাকে লোভ দেখাইতেছে, তাহাকে অকারণে উতলা করিয়া তুলিয়াছে, সে লজ্জিত হইয়া ওঠে। আবার কোন কোন সময় এমন সব সুর বাহির হইয়া আসে, যেন তাহারা পরস্পরকে একান্তভাবে ভালবাসে, জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে যেন মিশিয়া থাকে। মানুষ যেমন ভালবাসিয়া আলিঙ্গন করে, তেমনিধারা তাহারাও যেন তাহাকে

আলিঙ্গন করে, সুন্দর...সুমধুর। তাহারা ভালজাতের দৈত্য, দয়ালু, জাঁ-ক্রিস্‌তফ স্পষ্ট দেখিতে পায়, মুখে তাহাদের আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি ...কোন্ কুটিলতার রেখা নাই সেখানে...জাঁ-ক্রিস্‌তফকে তাহারা ভালবাসে...জাঁ-ক্রিস্‌তফও তাহাদের ভালবাসে। তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে জাঁ-ক্রিস্‌তফের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে, বারবার তাহাদেরই সে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহারাই তাহার বন্ধু...অন্তরের একান্ত প্রিয় বন্ধু, দেখা দিয়া কোথায় তাহারা আবার হারাইয়া যায়?

এই ভাবে বালক সুরের তরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্পষ্ট অনুভব করে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে অপেক্ষা করিয়া আছে শত শত অশরীর মূর্তি, কেহ বা ভালবাসিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য ডাকে, কেহ বা ডাকে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্য...

একদিন এই অবস্থার মধ্যে মেলশিয়র তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পিতার ভরাট গলার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাঁ-ক্রিস্‌তফ আসন ছাড়িয়া ভয়ে লাফাইয়া উঠিল। অন্যায় কার্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, অতএব এখুনি সুরু হইবে প্রহার, এই আশঙ্কায় দুই হাত তুলিয়া প্রহারকে এড়াইবার ভঙ্গী করিয়া ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেলশিয়র ধমকাইল না তো, বরঞ্চ তাহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।

সস্নেহে বালকের মাথায় মৃদু করস্পর্শ বুলাইতে বুলাইতে পিয়ানোর দিকে আঙুল দেখাইয়া মেলশিয়র জিজ্ঞাসা করিল : 'ভাল লাগে? তাহলে বল, তোকে বাজাতে শিখিয়ে দিতে পারি! শিখতে ইচ্ছে যায়?'

আনন্দ-উল্লসিত চিত্তে জাঁ-ক্রিস্‌তফ অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া ওঠে : 'হাঁ!' তখন পিতা পুত্রে দুইজনে পিয়ানোর কাছে আগাইয়া গিয়া বসে, জাঁ-ক্রিস্‌তফ একরাশ বই থাকের পর থাক সাজাইয়া বসিবার উচ্চাসন করিয়া লয়...নিবিড় মনঃসংযোগে পিতার নিকট হইতে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। সেই প্রথম সে জানিল, যাদুযন্ত্রের ভিতরে যে-সব শব্দময়ী অপ্সরীরা বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকের একটা করিয়া স্বতন্ত্র নাম আছে এবং চীনা নামের মতন সেই সব নাম একটা মাত্রা বা একটা অক্ষরেই সম্পূর্ণ। পরম বিস্ময়ের সহিত এই সংবাদকে সে গ্রহণ করে। রূপকথায় রাজার কুমারীদের যেমন সব গালভরা মিষ্টিনাম থাকে, ইহাদেরও নিশ্চয় সেইরকম নাম আছে, ইহাই ছিল তাহার দৃঢ় ধারণা।

তাহা ছাড়া, আর একটা ব্যাপারেও সে কিঞ্চিৎ আশাহত হইল, এই সব শব্দময়ী অপ্সরীদের কথা বলিবার সময় তাহার পিতা এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইল যে, তাহা জাঁ-ক্রিস্‌তফের আদৌ মনঃপূত হইল না। মেলশিয়র যখন আলাদা আলাদা ভাবে তাহাদের এক এক-জনকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, জাঁ-ক্রিস্‌তফের কানে কেমন যেন খাপছাড়া, হাল্কা, প্রাণহীন মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেলশিয়র যন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, এই সব সুর স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসে না, তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, জাঁ-ক্রিস্‌তফ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। যখন মেলশিয়র বাজাইয়া বুঝাইয়া দিল, তখন এই সব বিচ্ছিন্ন সুর এক নিমেষে শিক্ষিত সৈনিকের মতন যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল, রাজার আদেশে রণযাত্রী সৈনিকের মতন একসঙ্গে সমানতালে পা ফেলিয়া চলিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ মহাখুশি হইয়া উঠিল, যখন শুনিল, ইহারা প্রত্যেকেই খুশিমত পালা করিয়া রাজা সাজিয়া বসিতে পারে, এবং অন্য সকলে ঠিক সমানভাবেই তখন সেই রাজাকে মানিয়া চলিবে এবং এই সুদীর্ঘ পর্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলকেই প্রয়োজন হইলে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে পারা যায়। যে আদেশে এই অসংখ্য সুর-সৈনিকের দল সাড়া দিয়া ওঠে, আজ এই মুহূর্তে যদি সে সেই আদেশ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে! তাহার ইঙ্গিতে তাহারা যাত্রা করিয়া চলিবে...কিন্তু...হঠাৎ সে বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। ইহাদের সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া সে যে-সব কল্পনা করিয়া সুখ পাইত, আজ মেলশিয়রের কথায় তাহার সেই কল্পনার কাম্য-বন অদৃশ্য হইয়া গেল। যাক্, তাহার পরিবর্তে সে যাহা পাইল, তাহাই বা কম সুখের কি? তবে, পরিশ্রম করিতে হইবে...সে বুঝিল রীতিমত তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিতে তাহার আনন্দই হইল, কই, বিন্দু-মাত্র তো ক্লান্তি বোধ হইতেছে না? সকলের চেয়ে অবাক হইয়া গেল, পিতার ধৈর্য দেখিয়া। একই পর্দা শতবার করিয়া মেলশিয়র দেখাইয়া দেয়, শতবার করিয়া একই জায়গা হইতে সুরু করে, মেলশিয়রের বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ক্ষেদ নাই। জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেন তাহার পিতা এইভাবে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিতেছে ...তাহা হইলে, তাহার পিতা সত্যই তাহাকে ভালবাসে? তাহার ভাবিতে ভাল লাগে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া পিতার নির্দেশকে গ্রহণ করে।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া ওঠে। একমুহূর্তও যে আর আলস্যকে প্রশ্রয় দিবে না।

যদি সে জানিত, সেই মুহূর্তে তাহার পিতা মনে মনে তাহার সম্বন্ধে কি পরিকল্পনা করিতেছিল, তাহা হইলে হয়ত নিজেকে এতখানি শান্ত করিয়া রাখিতে পারিত না।

সেইদিন হইতে মেলশিয়র তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইতে সুরু করিল, সেখানে সপ্তাহে তিনদিন করিয়া বাড়ীর ভিতরে তাহারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গীতের কসরৎ করিত। মেলশিয়র সেই দলে মোহড়ার বেহালা বাজাইত, বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল বাজাইত চেলো। মাত্র আর দুইটি প্রাণী সেই দলে ছিল, একজন ব্যাঙ্কের কেরাণী, আর একজন শিলার স্ট্রীটের বুড়ো ঘড়িওয়ালা। বৈকাল পাঁচটা হইতে তাহারা সুরু করিত, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সমানে চালাইত। এক-একটা গৎ বাজাইবার পর কিছুক্ষণ তাহারা বিরাম দিত, অর্থাৎ সেই অবকাশে বিয়ার চলিত। যখন যাহার খুশি প্রতিবেশীরা আসিত, যাইত, দেয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে শুনিত, মাথা দুলাইয়া অথবা মেঝেতে পা ঠুকিয়া তাল দিত, সারা ঘর তাহাদের তামাকের ধোঁয়ায় ভারী হইয়া উঠিত। পাতার পর পাতা, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত, তাহারা বাজাইয়া চলিত, এতটুকু ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা যাইত না। একমনে যে যাহার যন্ত্র বাজাইয়া চলিত, কেহ কোন কথা বলিত না, তাহাদের মুখের গম্ভীর চেহারা হইতে আদৌ বোঝা যাইত না, তাহারা যাহা বাজাইতেছে, তাহাতে সত্যই তাহারা আনন্দ পাইতেছে কি না। একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসে যেন তাহারা নিখুঁতভাবে শুধু সঙ্গীতের ব্যায়াম করিয়া চলিয়াছে। যে জাতি জগতের মধ্যে সঙ্গীতে সব চেয়ে প্রতিভাশালী, সে-জাতির মধ্যে এই জাতীয় মধ্যস্তরের শিক্ষিত পটুত্ব খুব বিরল ব্যাপার নয়। বলিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষুধার মতন, এ ক্ষুধা খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে না, পর্যাপ্ত খাদ্য পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহাদের সঙ্গীতের ক্ষুধাও ছিল অনুরূপ বলিষ্ঠ, সঙ্গীতের অন্তরের সৌন্দর্য লইয়া ইহারা মাথা ঘামাইত না, ইহাদের নিকট সব সঙ্গীতই ছিল সমান; বিঠোফেন ও ব্রাহ্‌ম্‌সের মধ্যে কোন তফাৎই ইহাদের নিকট ধরা পড়িত না; প্রত্যেক অমর সুর-স্রষ্টার সব রচনাই যে সমান আবেদনের নয়, তাহা ইহারা বুঝিত না— ; প্রাণহীন একটা কনসার্টের গৎ

আর একটা জীবন্ত সোনাটা, তাহাদের আবেদনের কোন পার্থক্যই ইহাদের অন্তরে ধরা পড়িত না।

পিয়ানোর পেছনে একটা নিরালা কোণ জাঁ-ক্রিস্‌তফ নিজের জন্য বাছিয়া লইয়াছিল, সেখানেই সে একলা চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিত। সেখানে তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্য আর কেহই যাইতে পারিত না, যাইতে হইলে রীতিমত হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইবে। আধ-অন্ধকারে তাহাকে স্পষ্ট চোখেও পড়িত না। তাহার আশে-পাশে কয়েক হাত মাত্র জায়গা ছিল, ইচ্ছা হইলে কোনরকমে সে সেখানে গড়াইতে পারিত মাত্র। তামাকের ধোঁয়ায় আর ধূলায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিত, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিত না, পরম ধৈর্যে উৎকর্ণ হইয়া সংগীত শুনিয়া চলিত, মাঝে মাঝে পিয়ানোর পেছনের পুরানো ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর ধূলিসিক্ত আঙগুল চালাইয়া দিয়া ছিদ্রকে দীর্ঘতর করিবার চেষ্টা করিত। যে-সব সঙ্গীত তাহার কানে আসিয়া বাজিত, তাহার সব কিছুই যে তাহার ভাল লাগিত, তাহা নয় কিন্তু কোন সংগীতেই তাহার বিরক্তি ছিল না; তাহা ছাড়া সংগীত সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন সিদ্ধান্তই গড়িয়া তুলিতে সে চাহিত না, কারণ, সে জানিত, তদনুরূপ বিদ্যা তাহার আজ নাই। তাই, সমস্তই সে স্বীকার করিয়া লইত। তবে, কোন কোন সঙ্গীতের সময় সে ঘুমাইয়া পড়িত, কোন কোন সংগীত আবার তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিত। কেন যে এই প্রভাবের পার্থক্য ঘটিত, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তবে, তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার চেতনা ঠিক আসল সংগীতের জায়গাতেই তাহাকে জাগাইয়া তুলিত। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সে-সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হইয়া সে আপনার খেয়ালে কখনো মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিত, কখনও নাক বাঁকাইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিত, কখন বা জিভ বাহির করিয়া বাদকদের ব্যঙ্গ করিত; কখনো চোখ অনুরাগে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া উঠিত, কখন বা ঝিমাইয়া পড়িত; হাত পা ছুঁড়িয়া চঞ্চল হইয়া উঠিত, সাধ যাইত, এই মুহূর্তেই কদম কদম পা ফেলিয়া রণ-যাত্রায় বাহির হয়, বিশ্বকে পায়ের তলায় আনিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সময় সময় সে এতদূর চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, পিয়ানোর ওপর হইতে বাদক তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিত। অন্ধকার কোণ হইতে সহসা সে দেখিতে পাইত, একটি মাথা পিয়ানোর উপর হইতে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তিক্ত-

কণ্ঠে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে : 'বলি শুনছো ছোকরা, পাগল হয়ে গেলে নাকি? পিয়ানোর ঘাড়ের ওপর এসেছ কেন? সরে যাও... নইলে কান ছিঁড়ে দেবো!'

সেই অকস্মাৎ তীব্র ভর্ৎসনায় জাঁ-ক্রিস্তফের সমস্ত সুর কাটিয়া যাইত, মনে মনে ভীষণ রাগিয়া উঠিত। বা-রে, সে একা একা নিজের মনের আনন্দে নিজে আছে, সে-আনন্দে তাহারা ব্যাঘাত দিবার কে? সে তো কাহারও কোন ক্ষতি করিতেছে না! সব সময় সবাই তাহাকেই ভর্ৎসনা করিবে? কেন? তাহার পিতাও সেই ভর্ৎসনায় যোগদান করে। সবাই মিলিয়া অনুযোগ করে, সে নাকি অনবরত গোলমাল করিতেছে, গোলমাল করিবেই তো, সংগীত বালকের ভাল লাগে না! সেই নিরীহ ভদ্রসন্তানদের যদি সেই সময় কেহ জানাইয়া দিত যে, সেই ঘরের মধ্যে যত লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে একমাত্র সেই ক্ষুদ্র বালকই প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সংগীতের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না।

যদি তাহাকে শান্ত দেখিবারই তাহাদের বাসনা থাকে, তাহা হইলে কেন তাহারা এমন সংগীত বাজায়, যাহা শুনিলে তাহার মনে আপনা হইতেই যুদ্ধে ছুটিয়া চলিয়া যাইবার বাসনা জাগে? চঞ্চল না হইয়া, তখন সে কি করিয়া থাকিবে? সে-সংগীতের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনিতে পাইত, রণোন্মাদ অশ্বের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, তরবারির সহিত তরবারির সংঘাতে ঝন্‌ঝনা জাগিয়া উঠিতেছে, সে স্পষ্ট শুনিতে পায় আহতের আর্তনাদ, বিজয়ীর জয়োল্লাস, জয়-গৌরবের শঙ্খধ্বনি! সেই সব শুনিয়া, তাহারা আশা করে যে, তাহাদের মতন শুধু ঘাড় নাড়িয়া আর পা ঠুকিয়া তাল দিয়াই সে শান্ত হইয়া থাকিবে? সেই যদি তাহাদের সাধ হয়, তাহা হইলে তাহারা কেন শুধু নিস্তেজ ঘুমের বাজনাই বাজায় না? তাহাদের সামনের সংগীতের বইতে তো পাতার পর পাতায় বহু সংগীত লেখা আছে, সে-সংগীত শুধু কলরবই করিয়া চলে; কোন কথাই বলে না। কিছুক্ষণ আগেই, বুড়ো ঘড়িওয়ালা সেই রকমই একটা সংগীত বাজাইল, গোল্ডমার্কের সৃষ্টি...বাজনার পর বৃদ্ধ সগর্বে শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া নিজেই মন্তব্য করিয়াছিল : 'চমৎকার...ভারী মিষ্টি...কোন রকম কর্কশতা নেই...সব কোণগুলো সুন্দরভাবে মোড়া...সুগোল...' বালক তো তখন চুপ করিয়াই ছিল। তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল। কি বাজনা হইতেছে, তাহা সে জানিত না, স্পষ্ট

করিয়া সব শুনিতেও পায় নাই, তবে তাহার ভাল লাগিতেছিল, সে আবেশে চোখ বুঁজিয়া ঘুমের দেশে স্বপ্নের সন্ধানে চলিয়াছিল।

এমনি প্রায়ই সে স্বপ্নের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িত। তাহার স্বপ্নের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ছিল না, কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগও থাকিত না। অসম্পূর্ণ, আবছা সব ছবি। কচিৎ কখনো কোন ছবি সম্পূর্ণ মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিত। তাহার মা কেক্ তৈরী করিতেছে, হাতের আঙ্গুলে রস জড়াইয়া গিয়াছে, একটা ছুরি দিয়া তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে; আগের দিন রাত্রিতে বাড়ীর পাশে নদীর জলে যে ইঁদুরটাকে সাঁতার কাটিতে দেখিয়াছিল; সেই শুকনো উইলোর ডালটা, যাহা লইয়া সে চাবুক তৈরী করিতেছিল... এই জাতীয় সব টুকরা টুকরা জিনিসের ছবি...সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, এই গান শুনিবার সময়ই তাহারা কেন তাহার মনে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দেয়! অনেক সময় এই সব দিবাস্বপ্নে সে স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাইত না, অথচ অনুভব করিত যেন অসংখ্য বিচিত্র বস্তু তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের অস্তিত্ব সে শুধু অনুভব করিতে পারিত, কিন্তু প্রকাশ করিয়া তাহাদের কোন পরিচয়ই দিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা তাহার চিত্তে বিষাদ জাগাইয়া তুলিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সে-বিষাদের মধ্যে সে কোন বেদনাই বোধ করিত না, যেমন বেদনা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জীবনে তাহাকে ভোগ করিতে হইত। আবার কোন কোনটা অকারণে তাহাকে উল্লসিত করিয়া তুলিত, এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাহাকে ভরাইয়া দিত। তখন জাঁ-ক্রিস্তফ আপনার মনে বলিয়া উঠিত: 'এই তো, এই তো আমি চাই...' কিন্তু সেই "এই তো" যে কি পদার্থ, তাহার কোন সঠিক ধারণাই সে করিয়া উঠিত পারিত না। কিন্তু সে যাই হোক, সে বুঝিত, সেই রকম বলিতে তাহার ভাল লাগিয়াছে, তাই সে বলিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গীতের মধ্যে তাহার কানে আসিয়া লাগিত সমুদ্রের গর্জন, সে স্পষ্ট অনুভব করিত, সমুদ্রের খুব নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার আর সমুদ্রের মাঝখানে শুধু রহিয়াছে কতকগুলি বালির পাহাড়। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ জানিত না, কি সে-সমুদ্র, আর কেনই বা সে-সমুদ্র তাহার এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, কি বা সে চায় তাহার কাছে। সে স্পষ্ট অনুভব করিত, এখনি সেই সমুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া মাঝখানের বালির আড়াল ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিবে...তখন...তখন

কি হইবে?...ভালই হইবে, আনন্দে সে সাগরকে ডাকিয়া লইবে। তখন শুধু রাতদিন কান পাতিয়া তাহার কলসংগীত সে শুনিবে, তাহার একান্ত নিকটে থাকিয়া সেই মহাসংগীতের সুরে সুরে সে ঘুমাইয়া পড়িবে, সে-ঘুমের মধ্যে তাহার ছোট্ট জীবনের ছোট ছোট সব বেদনা আর লাঞ্ছনা ডুবিয়া নিঃশেষে তলাইয়া যাইবে।

সাধারণত চলনসই মাঝারি গোছের সংগীতই তাহার মধ্যে এই স্বপ্নের নেশা জাগাইয়া তুলিত। এই জাতীয় সংগীতের অপদার্থ রচয়িতাদের মাথায় অর্থ-উপার্জনের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই থাকে না; প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করিয়া কোন রকমে একটা সুরের সংগে আর একটা সুরকে গাঁথিয়া তুলিয়া তাহারা তাহাদের জীবনের শূন্যতাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে...কখনও বা শুধু স্বতন্ত্র হইবার মোহে প্রচলিত পন্থার বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু এই সব সুর-শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত এমন একটা স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তি থাকে যে, মূর্খ অপদার্থ লোকের হাতের স্পর্শে জাগিয়া উঠিলেও, যে কোন সরল সহজ অন্তরে সুবিশাল ঝঞ্ঝা জাগাইয়া তুলিতে পারে। সত্যি-কারের সংগীত-প্রতিভাধরেরা মানুষের অন্তরে যে-স্বপ্ন জাগাইয়া তোলেন, সে-স্বপ্নের উপর থাকে তাঁহাদেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাঁহাদের সৃষ্ট সুর কঠিন স্বামিনীর মতন শ্রোতার অন্তরকে করে নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু অপদার্থ লোকের হাতের সংগীত শ্রোতার মনে যে-স্বপ্ন জাগাইয়া তোলে, সে-স্বপ্নের উপর শ্রোতারই থাকে পূর্ণ আধিপত্য, সে তখন নিজের খুশিমত নিজের স্বপ্ন ভাঙিতে গড়িতে পারে, সেখানে থাকে নিজের মতন করিয়া স্বপ্ন দেখিবার অবাধ স্বাধীনতা। তাই জাঁ-ক্রিস্-তফ তাহার পিতার সেই সংগীত-আসরে নিজের স্বপ্নের নেশায় নিজে মশগুল হইয়া থাকিত...তাই পিয়ানোর আড়ালে, অন্ধকার কোণায়, সে অবাধে নিজেকে ভুলিয়া বসিয়া থাকিত, সে যে সেখানে আছে, ঘরের লোকেরাও তাহা ভুলিয়া যাইত। অবশেষে একসময় তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিত, দেখিত তাহার অংগ বাহিয়া পিপীলিকার দল আগাইয়া চলিয়াছে...তাহার মনে পড়িয়া যাইত, সে একজন অসহায় ক্ষুদ্র বালক মাত্র...নোংরা নখ...নোংরা ধূলামাখা পোষাক...অন্ধকার এককোণে নিজের দুই পা দুই হাত দিয়া ধরিয়া কোন রকমে বসিয়া আছে...

পিয়ানোর পর্দাগুলি এত উঁচুতে ছিল যে নাগাল পাইতে তাহাকে

রীতিমত কসরৎ করিতে হইত। থাকের পর থাক বই সাজাইয়া সে উচ্চাসন করিয়া লইত। একদিন যখন সেইভাবে সে আপনার মনে পিয়ানো বাজাইয়া চলিয়াছিল, নিঃশব্দে কখন যে মেলশিয়র ঘরে ঢুকিয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই। ঘরে ঢুকিয়াই পুত্রের বাজনা শুনিয়া মেলশিয়র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, পুত্রের অজ্ঞাতে কয়েক মিনিট তাহার বাজনা শুনিল, হঠাৎ তাহার মনে বিদ্যুৎ-ঝলকে এক মহাসম্ভাবনার আশা জাগিয়া উঠিল : 'আশ্চর্য! এ যে দেখছি, জন্ম-গুণী...রীতিমত একটা প্রতিভা!...তাই তো...ঠিক হয়েছে ...ইস্...একথা আগে মনে হয় নি কেন? সংসারের আর ভাবনা কি?'

মেলশিয়র পুত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল, সে তাহার জননীর ধারা অনুযায়ী ছোটখাট একটা চাষাই হইবে। আজ তাহার সে-ভ্রান্তি এক নিমেষে দূর হইয়া গেল।

'চেষ্টা ক'রে দেখতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! যদি শিখিয়ে নিতে পারি, তাহলে সংসারের দুর্ভাবনা এক নিমেষে দূর হয়ে যাবে। ওকে নিয়ে সারা জার্মানী ঘুরে বেড়াবো...জার্মানী কেন, জার্মানীর বাইরেও যে-কোন দেশে যেতে পারবো! পয়সা রোজগারও হবে... রীতিমত একটা উন্নত জীবনও যাপন করা হবে!' মেলশিয়রের একটা গুণ ছিল, যাহা কিছুই করুক না কেন, তাহার মধ্যে একটা উন্নত জীবনের লক্ষণ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইত...অন্তত সে তাহা ভাবিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

মনে মনে নিজের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, খাওয়ার টেবিলে শেষ-গ্রাস মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বালককে সোজা পিয়ানোর সামনে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইয়া দিল। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বালকের চোখ শ্রান্তি ও ঘুমে আপনা হইতে বুঁজিয়া আসিল, ততক্ষণ পর্যন্ত সমানে তাহার তালিম চলিল। তার পরের দিন উপর্যুপরি তিনবার তাহাকে লইয়া বসিল। তার পরের দিনও তাহাই করিল।

তারপর, প্রতিদিন...ঠিক একইভাবে অবিচ্ছেদ চলে সঙ্গীতের গলদ্ঘর্ম ব্যায়াম। জাঁ-ক্রিস্তফ অচিরেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে...সঙ্গীত শিক্ষার নামে মৃত্যু-বিভীষিকা পাইয়া বসে...অবশেষে আর সহ্য করিতে পারে না বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহাকে যে-শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল, তাহার কোন সার্থকতাই সে খুঁজিয়া পাইল না; কি করিয়া যত দ্রুত

সম্ভব পর্দার উপর দিয়া আঙ্গুল চালাইতে পারা যায়, শুধু তাহারই কসরৎ। ইহার মধ্যে কোথায় সঙ্গীত, কোথায় আনন্দ আর সৌন্দর্য, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। সমস্ত স্নায়ু অবসন্ন হইয়া আসে। কোথায় গেল তাহার কল্পনার সুর-অপ্সরীরা? কোথায় বা সেই বন্দী দানবের দল, যাহারা অসহ্য আক্রোশে নিজেদের বন্ধন-শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চায়? নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল তাহার সুবিপুল স্বপ্ন-সাম্রাজ্য। শুধু সেই পর্দা মুখস্থ করা আর আঙ্গুল চালানোর কসরৎ...একঘেয়ে, বিরক্তিকর, প্রাণহীন...জাঁ-ক্রিস্তফ তাহা কানেই তুলিত না। অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে চাহিয়া থাকিত। তিরস্কৃত হইলে, মুখ ভার করিয়া শুনিবার ভান করিত মাত্র। মেলশিয়র গালা-গাল দিয়া উঠিত, বালক ভ্রূক্ষেপ করিত না। পিতা রাগে মুখ-বিকৃতি করিলে সে-ও তাচ্ছিল্যভরে মুখ-বিকৃতি করিয়া থাকিত। একদিন মেলশিয়র পুত্র-সম্বন্ধে তাহার পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করিতেছিল, সেই দিন বালক পিতার সমস্ত আগ্রহের হেতুর সন্ধান পাইল, চরম বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সার্কাসের দল যেমন করিয়া জন্তুর খেলা দেখায়, তেমনি করিয়া তাহার পিতা তাহাকে লইয়া খেলা দেখাইয়া বেড়াইবে, প্রচুর অর্থ আসিবে, তাহারই জন্য এই সঙ্গীত-শিক্ষার এত আগ্রহ...তাহারই জন্য এত সাধ্য-সাধনা! সঙ্গীত-শিক্ষার এমনি তাগাদা যে, একবার সে তাহার প্রিয়বন্ধু সেই গৃহান্তরালবর্তী নদীর ধারে গিয়া বসিবারও অনুমতি পাইত না। কেন তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এমন করিয়া লাগিয়াছে? মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। তাহার আত্মগর্বে নিদারুণ আঘাত লাগে। তাহার সমস্ত স্বাধীনতা তাহারা কাড়িয়া লইতেছে। সে স্থির করিল, সে আর পর্দায় হাত দিবে না, দিলেও এমন বিশ্রীভাবে দিবে যাহাতে তাহার পিতা আপনা হইতেই বিরূপ হইয়া ওঠে।

অবশ্য, এই বিদ্রোহের ভাব বজায় রাখা তাহার পক্ষে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। কিন্তু যত কষ্টই হোক্, সে কিছুতেই নিজের স্বাধীনতা হারাইবে না।

মনে মনে সেই সংকল্প স্থির করিয়া, পরের দিনই সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য মেলশিয়র তাহাকে ডাকিল, সে তাহার সংগোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁকা পথ ধরিল। ইচ্ছা করিয়াই ভুল পর্দায় আঙ্গুল চালাইতে লাগিল, অন্যমনস্কভাব দেখাইয়া একটার পর একটা ভুল

করিতে লাগিল। মেলশিয়র ধমক দেয়, ধমক গর্জনে পরিণত হয়, অবশেষে গর্জন প্রহারে রূপান্তরিত হয়। হাতের কাছেই একটা ভারী রুল ছিল। প্রত্যেকবার ভুল পর্দায় আঙগুল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আঙগুলের উপর সবেগে রুলের আঘাত আসিয়া পড়ে। বালকের কানের কাছে মুখ আনিয়া মেলশিয়র ভীম-গর্জনে চিৎকার করিয়া ওঠে। সে-চিৎকারে বালকের কানে তালা লাগিয়া যায়। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া কান্নাকে রোধ করিতে চেষ্টা করে, কাঁদিয়া সে দুর্বলতা প্রকাশ করিবে না, কিছুতেই নয়। আজ সে পণ করিয়াছে, কিছুতেই ঠিক মত বাজাইবে না। নিজের জিদ বজায় রাখিয়া সমানে যাহা খুশি বাজাইয়া চলে; পর্দার দিকে না চাহিয়া মেলশিয়রের হাতের দিকে চাহিয়া থাকে, প্রহারের জন্য হাত উঠিতে দেখিলেই মাথা ঘুরাইয়া সরাইয়া লয়। মেলশিয়রও জিদ ধরিয়া বসিল, যদি দুইদিন দুইরাত্রি এমনি বসিয়া থাকিতে হয়, সে বসিয়া থাকিবে, যতক্ষণ জাঁ-ক্রিস্তফ প্রত্যেকটি পর্দায় ঠিক মত হাত না দিতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে রেহাই দিবে না। ক্রমশ মেলশিয়র যখন বুঝিতে পারিল, বালক ইচ্ছা করিয়াই সেইরকম বেয়াদপী করিতেছে, ইচ্ছা করিয়াই ভুল বাজাইতেছে, রাগে প্রহারের মাত্রা বাড়িয়া গেল। ঘন ঘন হাতের আঙগুলের উপর রুলের আঘাত পড়িতে লাগিল, আঙগুল অবশ হইয়া আসিল। ভিতরের চাপা কান্না বাহিরে আপনা হইতে উছলিয়া পড়ে। তবুও জোরে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল না জাঁ-ক্রিস্তফ। নীরবে গুমরাইতে লাগিল। উদ্বেলিত অশ্রু আর কান্নাকে ঢোক গিলিয়া জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অবশেষে বুঝিতে পারে, এই পন্থা অনুসরণ করিয়া কোন সুবিধাই হইবে না, স্পষ্ট বেপরোয়া বিদ্রোহই ঘোষণা করিতে হইবে। পিয়ানো হইতে হাত তুলিয়া লইল, সে আর বাজাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল, এবার আর রুলের আঘাত নয়, প্রহারের ঝড় নামিবে। ভয়ে সর্ব-দেহ থর থর কাঁপিয়া উঠিল। তবুও স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করিল: 'বাবা, আমি আর বাজাবো না!'

উত্তেজনায় আর রাগে মেলশিয়রের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, গর্জন করিয়া ওঠে: 'কি...কি বল্লি?—'

বালকের দুই হাত ধরিয়া এমনভাবে ঝাঁকানি দিল যে, আর একটু হইলে হাত ভাঙিগয়াই যাইত।

ক্রিস্‌তফের সারা দেহ থর থর কাঁপিতে থাকে। তবুও, পিতার উদ্যত প্রহারকে এড়াইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া বলে: 'আমি আর বাজাবো না...এরকমভাবে মার খেতে আমি পারবো না, কিছুতেই না ...তা ছাড়া...'

কথা শেষ করিতে পারে না। প্রচণ্ড এক আঘাতে তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যায়। মেলশিয়র গর্জন করে: 'ওঃ, মার খেতে তুমি পারবে না...না?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রহারের বর্ষণ সুরু হয়। নিরুদ্ধ নিশ্বাসের ভিতর হইতেই ক্রিস্‌তফ আর্তনাদ করে: 'তা ছাড়া...গান আমি ভালবাসি না...একটুও ভালবাসি না!'

আঘাতের ধাক্কায় চেয়ার হইতে বালক ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেলশিয়র তাহাকে টানিয়া আনিয়া আবার চেয়ারে জোর করিয়া বসাইয়া দিল। হাত টানিয়া লইয়া পর্দার উপর সজোরে ঠুকিয়া ধরিল: 'তোকে বাজাতেই হবে!'

তেমনি তীব্রকণ্ঠে জাঁ-ক্রিস্‌তফ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: 'না, না, কিছুতেই নয়!'

অবশেষে মেলশিয়রকে হার মানিতে হইল। প্রহার করিতে করিতে চেয়ার হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া ধাক্কা দিয়া দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিল। জানাইয়া দিল, সারাদিন একটা দানাও মুখে দিতে পাইবে না... সারাদিন কেন, সারা মাস তাহাকে না খাওয়াইয়া রাখিবে...যতক্ষণ না সে ভালমানুষের মত সমস্ত গৎগুলি ভাল করিয়া বাজাইতে শিখিতেছে, ততক্ষণ তাহাকে উপবাস করিয়াই থাকিতে হইবে! সজোরে একটা লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া, তাহার মুখের সামনেই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রহারের প্রত্যক্ষ ফল কাটাইয়া উঠিয়া ক্রিস্‌তফ দেখিল, সেই পুরাতন জরাজীর্ণ অন্ধকার সিঁড়ির তলায় সে পড়িয়া আছে। দেয়ালের উপরে আলোক-বাতায়নের ভাঙ্গা কাঁচের ভিতর দিয়া এক ঝলক জলো হিমেল হাওয়া গায়ে আসিয়া লাগিল। ভিজা পুরানো দেয়াল চোঁয়াইয়া বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ সিঁড়ির এক ধাপ উপরে উঠিয়া বসিল। রাগে আর আবেগে উন্মাদের মতন তাহার ভিতরটা টলিতেছিল। চাপা গলায় পিতাকে গালাগালি দিয়া উঠিল: 'পশু! পশু! হ্যাঁ, তুমি একটা আস্ত বুনো পশু! ...যাচ্ছেতাই...পিশাচ...আমি দুচক্ষে

তোমাকে ঘেন্না করি...সত্যি ঘেন্না করি...তুমি মরে গেলে আমি খুশি হই...হ্যাঁ, খুশি হই!'

সমস্ত বুকটা ভিতর হইতে ফুলিয়া উঠিতে থাকে। অসহায়ভাবে সামনের নোংরা সিঁড়িগুলির দিকে চাহিয়া থাকে...দেখে মাথার উপরে দেয়ালে মাকড়সার জাল বাতাসে দুলিতেছে। অসীম বেদনায় নিজেকে মনে হয় সম্পূর্ণ একাকী যেন কোথাও তাহার কেহ নাই। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ভাঙ্গা জানালার ফাঁকের উপর নজর পড়ে, সেখান দিয়া যদি লাফাইয়া পড়ে? সেখান দিয়া যদি না সম্ভব হয়, সিঁড়ির উপর হইতে কিম্বা জানালা দিয়া তো সে লাফাইয়া পড়িতে পারে! ...তাহাদের জব্দ করিবার জন্য যদি সে আত্মহত্যাই করে, তখন...তখন নিশ্চয়ই তাহারা বুক চাপড়াইতে থাকিবে! উপর হইতে নীচে সবেগে সে লাফাইয়া পড়িল। সে স্পষ্ট শুনিতে পায়, উপরের দরজা কাহারা যেন সশব্দে খুলিয়া ফেলিল... চারদিক হইতে কাতর আর্তনাদ উঠিতেছে...পড়ে গিয়েছে! কি সর্বনাশ! কি হবে? নীচে চারদিকে পায়ের আওয়াজ হইতেছে...এইবার তাহার জননী আর তাহার পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া তাহার দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহার জননী কাঁদিতেছে: 'তোমারই দোষ...তোমারই দোষে ছেলেটা আত্মহত্যা করলো...তুমিই...হাঁ তুমিই ওকে মেরে ফেলেছো!' তাহার পিতা সে-কথার কোন জবাব না দিয়া, তাহার মৃত-দেহের পাশে নতজানু হইয়া পাথরে মাথা ঠুকিতেছে আর কাঁদিতেছে: 'উঃ, কি পাপিষ্ঠ আমি ...কি ঘোর পাপিষ্ঠ আমি!' সেই কাতর কান্না দেখিয়া, তাহার সঞ্চিত বেদনার ভার যেন কমিয়া আসিতে থাকে...সে প্রায় আর একটু হইলেই তাহাদের ক্ষমা করিয়াও ফেলিত, কিন্তু ক্ষমা কেন তাহাদের?—এই শাস্তি তো তাহাদের প্রাপ্য...সে আবার আপনার মনে তাহার কল্পিত প্রতিশোধের চিত্র আঁকিয়া চলে...

সমস্ত কাহিনী যখন নিঃশেষে বোনা শেষ হইয়া গেল, তখন জাঁ-ক্রিস্তফ দেখে, কখন সিঁড়ির নীচে হইতে সে সিঁড়ির উপর ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখান হইতে সিঁড়ির নীচের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু লাফাইয়া আত্মহত্যা করিবার বাসনা তাহার আর নাই! বরঞ্চ, সেকথা ভাবিতেই ভয়ে তাহার দেহ ঈষৎ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে এবং যদি কোন ক্রমে পড়িয়াই বা যায়, তাহার জন্য ধার হইতে সরিয়াই দাঁড়ায়। হঠাৎ তাহার মনে হয়, সে যেন খাঁচায় বন্দী পাখী...

খাঁচার গায়ে মাথা ঠুকিয়া মরা ছাড়া তাহার আর করিবার কিছুই নাই। সেই চিন্তার সঙ্গে চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়ে। সে কাঁদিয়াই চলে। কাঁদে আর ধূলি-মলিন হাত দিয়া চোখ মুছিতে থাকে। ধূলায় আর চোখের জলে সমস্ত মুখ ময়লা হইয়া যায়। কিছুতেই সে-কান্না থামে না। কাঁদে আর চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, যদি সেইভাবে অন্তত কান্না ভুলিয়া থাকিবার মত কিছু দেখিতে পায়। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে মাকড়সার জালের দিকে নজর পড়ে, মাকড়সাটা জালে চলাফেরা সুরু করিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সেই দৃশ্যে তাহার কান্না থামিয়া যায়। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই, আবার কাঁদিতে সুরু করে। তবে কান্নার পেছনে যেন পূর্বেকার আবেগ আর তেমনভাবে অনুভব করে না। নিজের কান্নার আওয়াজ কান পাতিয়া শোনে, অসাড়ের মতন কাঁদিয়াই চলে। কিছুক্ষণ পরে নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, কেনই বা সে এত কাঁদিতেছে! সিঁড়ি হইতে সরিয়া গিয়া জানালার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া একমনে মাকড়সার দিকে চাহিয়া থাকে। কুৎসিৎ লাগে অথচ সেদিক হইতে দৃষ্টিও ফিরাইতে পারে না।

জানালার নীচে বাহিরে বহিয়া চলে রাইন নদী...বাড়ীর দেয়ালের গায়ে তরঙ্গের স্পর্শ দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে নদী। উপরে আকাশ, নীচে নদী, সে যেন মাঝখানে ঝুলিয়া আছে। জানলার গরাদে মুখ লাগাইয়া সে বাহিরের নদীর দিকে চাহিয়া দেখে...সহসা মনে হয়, আজ নূতন করিয়া সেই পরিচিত নদীকে দেখিতেছে যেন। বেদনার বিশেষ সার্থকতা সেইখানেই, বেদনার স্পর্শে মানুষের ইন্দ্রিয় পায় নূতন তীক্ষ্ণতা, নূতন চেতনা। পুরাতন স্মৃতির প্রাঙ্গণে ধৌত করিয়া দিয়া, অশ্রু আনিয়া দেয় দৃষ্টিতে নূতন সজীবতা। গৃহ-প্রান্তবর্তী সেই নদী বালকের আশৈশব বন্ধু। কোনদিন বালক তাহাকে নদী বলিয়া দেখে নাই, তাহার নিকট সে-নদী ছিল জীবন্ত প্রাণী...অপরূপ, অদ্ভুত এক জীবন্ত সত্ত্বা তাহার আশেপাশে যে-সব প্রাণীর ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের অপেক্ষা শতগুণ শক্তিমান, শতগুণ জীবন্ত, অনির্বচনীয় মহা-প্রবল! আজ যেন তাহাকে আরো বিচিত্র বলিয়া তাহার মনে হয়। আরো ভাল করিয়া তাহাকে দেখবার জন্য বালক গরাদের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। কোথায় চলিয়াছে সে? নিত্য কল কল শব্দে কি কথা সে বলিয়া চলিয়াছে? কি সে চায়? তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, সে মুক্ত, বন্ধনহীন যে-পথে চলিয়াছে, সে-পথ

সম্বন্ধে এতটুকু ভ্রান্তি তাহার নাই...কেহ তাহার গতি রোধ করিতে পারে না...দুর্নিবার, চিরমুক্ত। সারাদিন, সারারাত, বৃষ্টিই আসুক আর সূর্যই উঠুক, যে-গৃহের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে আনন্দই থাকুক কিম্বা বেদনাই পুঞ্জীভূত হোক, তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না, যেন সুখ বা দুঃখ বলিয়া কোন কিছুই সে জানে না, জানিবার প্রয়োজন নাই তাহার...আপনার গতির আনন্দে আপনি মত্ত হইয়াই বহিয়া চলিয়াছে। হায়! যদি ঐ নদীর মতন অবাধে প্রান্তর বাহিয়া, অমনি নৃত্য-চপল ছন্দে তীরবর্তী উইলোদের সরস করিয়া, রঙগীণ-উপলখণ্ডের অথবা অমলিন বালুশয্যার উপর দিয়া, অমনি কলোচ্ছ্বাসে সে বহিয়া যাইতে পারিত! কোন ভাবনা নাই, কোন বেদনা নাই, কোন বাধা নাই, চির-মুক্ত, নিত্য-প্রবহমান!...

উপরের বাতায়ন হইতে বালক লোভাতুর আকুল দৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া থাকে সর্ব-অন্তঃকরণ দিয়া শুনিতে চেষ্টা করে...মনে হয় যেন সেই নদীর চলমান জলধারার সঙ্গে সে-ও ভাসিয়া চলিয়াছে... তাহার গতির সহিত সে যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে...

চোখ বুঁজিয়া দেখে, চারিদিকে রঙের খেলা...সবুজ, নীল, হলদে... নানা রঙের সব ছায়া আর সূর্যকিরণ পরস্পর পরস্পরকে ধরিবার জন্য যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছে...দেখিতে দেখিতে সেই সব অদৃশ্য ছায়াবর্ণ কল্পনায় কায়া ধরিয়া উঠিতে থাকে...দূর-প্রসারী প্রান্তর...ঘন-সবুজ শস্যে ভরিয়া আছে...নবোদ্ভিন্ন তৃণ আর বনলতার গন্ধ লইয়া মৃদু বাতাস শস্যক্ষেত্রকে আন্দোলিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ফুল...অজস্র, অফুরন্ত...ভায়োলেট, পপি, নানান্ রঙের নানান্ বনফুল। কি সুন্দর! কি অপরূপ! তাহাদের সুবাস যেন নাকে আসিয়া লাগে। ফুলের গন্ধে ভরিয়া বাতাস ভরপুর। ঐ ঘন সবুজ ঘাসের শয্যায় যদি শুইয়া থাকিতে পায় ক্রিস্তফ! পালে-পার্বণে উৎসবের দিনে তাহার পিতা রাইন-দেশের সুরা পরিবেশন করিত, সে-সুরা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেমন মধুর আবেশ লাগিত, আজ সহসা এই বাতায়নে স্বপ্নের খেলা খেলিতে খেলিতে তেমনি আবেশ তাহাকে ধীরে ধীরে পাইয়া বসে...তাহার ভাল লাগে।...তেমনি বহিয়া চলে নদী...কিন্তু পরিবর্তিত হইয়া যায় নদী-পারের দৃশ্য...কল্পনায় জাগিয়া ওঠে আর এক নূতন দেশ, নূতন গ্রাম...তীরে নতুন সব গাছ...অসংখ্য ডাল-পালা নদীর জলে নুইয়া পড়িয়াছে...ছোট ছোট হাতের মতন গাছের সবুজ

ডালগুলি যেন নদীর জলে হাত ডুবাইয়া খেলা করিতেছে...গাছের ফাঁক দিয়া নদীর জলে গ্রামের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে...নদী-জল-ধৌত সমাধি-ক্ষেত্রের ছোট ছোট শাদা ক্রসগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে...ক্রমশ গ্রামকে ছাড়াইয়া দূরে তাহার দৃষ্টি চলিয়া যায়...সমুন্নতশির পাহাড়, একটার পর একটা দাঁড়াইয়া আছে...গভীর অন্ধকার গুহা...গুহা-মুখকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ঘন সাইপ্রাস-লতার বন...তাহার একপার্শ্বে পাইনের জঙ্গল...জঙ্গলের ভিতর ভগ্ন জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাসাদ...জাঁ-ক্রিস্তফ তাহাদের ছাড়াইয়া আরো দূরে চলিয়া যায়...আবার দেখা দেয় সেই মুক্ত প্রান্তর, ঘন সবুজ শস্য, উড়ন্ত পক্ষীর দল...এবং সেই চিরপরিচিত সূর্য...

বিপুল নীল দেহ লইয়া ধীরে রাইন বহিয়া চলিয়াছে, যেন ছেদহীন একটি মাত্র চিন্তার ধারা...কোন তরঙ্গ নাই, কোন বিক্ষোভ নাই, শান্ত, স্নেহ-মসৃণ। জাঁ-ক্রিস্তফ দুই চোখ বন্ধ করিয়া থাকে; চোখে দেখার অপেক্ষা, সে কান পাতিয়া আরো অন্তরঙ্গভাবে নদীকে ধরিবে। সেই নিরবচ্ছিন্ন মর্মর-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ পাত্রের মতন ভরিয়া ওঠে মন। আচ্ছন্ন অবশ হইয়া আসে চেতনা। কেহ কি জানে, কোথায় বহিয়া চলিয়াছে এই অনাদি স্বপ্নের অনন্ত ধারা?...জাঁ-ক্রিস্তফ ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারে না...তবে বুঝিতে পারে, সে-স্বপ্ন-ধারা প্রবল আকর্ষণে তাহাকেও টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্তরের সুগভীর আলোড়নকে আড়ালে রাখিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অজস্র জলের অবারিত আকুল গতি, অতি দ্রুত ছন্দে। এবং সেই ছন্দকে আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে সঙ্গীত, অবলম্বনদন্ডকে আশ্রয় করিয়া যেমন জাগিয়া ওঠে আঙুর-লতা...জাঁ-ক্রিস্তফ কান পাতিয়া শোনে সে-সঙ্গীত, নদীর জল-মর্মরে শোনে পিয়ানোর মধুর আলাপ, বেহালার করুণ কান্না, বাঁশীর কোমল সুগোল আমন্ত্রণ।...কখন অদৃশ্য হইয়া যায় নদীকূল...সঙ্গে সঙ্গে নদীও হইয়া যায় অদৃশ্য...ভাসিয়া আসে এক মায়াময় ছায়াময় সুকোমল গোধূলি-লোক...অস্থির আবেগে কাঁপিতে থাকে জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তর ...সেই গোধূলি-আলোকে তাহার চোখের সামনে কাহাদের মুখ ভাসিয়া ওঠে? মাথায় একরাশ বাদামি রঙের চুল...ছোট্ট একটি মেয়ে...দুষ্টুমি-ভরা আঁখি, তাহাকে ডাকিতেছে, অতি ধীরে চুপি চুপি...ম্লান বিবর্ণ-মুখ একটি বালক দুটি সকরুণ নীল চোখ তুলিয়া যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে...আশেপাশে আরো অনেক মুখ...কেহ হাসিতেছে

...কেহ বা বিচিত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে...সে-দৃষ্টিতে সে কুণ্ঠিত, লজ্জিত হইয়া পড়ে...

...তাহাদের পাশেই ফুটিয়া ওঠে আর একটি নারী-মুখ, সুন্দর ম্লান, ঘন কালো কেশগুচ্ছ...দৃঢ় সন্নিবদ্ধ অধর...দীর্ঘ আয়ত চক্ষু... এত দীর্ঘ যে মুখের আর সব বৈশিষ্ট্য তাহাতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে... কি গভীর আকুলতায় জাঁ-ক্রিস্তফের দিকে চাহিয়া আছে...সে-আকুলতা যেন তাহার মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করিয়া যায়...তাহারই পাশে, জাগিয়া ওঠে আবার আর একটি মুখ...সকলের চেয়ে যেন প্রিয়...ঈষৎ-ভিন্ন অধর...দুই স্বচ্ছ সুনীল নয়ন তুলিয়া তাহারই দিকে হাসিয়া চাহিয়া আছে...সে-হাসির স্নিগ্ধ কারুণ্যে জাঁ-ক্রিস্তফের দেহ-মন স্নিগ্ধ হইয়া ওঠে...নিমেষে জাগাইয়া তোলে কি এক অনির্বচনীয় মাধুরী...কি মাধুরী আছে ভালবাসায়!...ওগো, অমনি করিয়া তুমি আবার হাস! অমনি হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া থাক! চলিয়া যাইও না! ওগো, যাইও না!...হায়! কোথায় চলিয়া গেলে?...কিন্তু অন্তর ভরিয়া রাখিয়া গেলে একি অবিস্মরণীয় মাধুরী...দুঃখ, বেদনা, কোন ক্ষুদ্রতার সামান্য ভার, নাই, নাই, কোথাও কিছু গ্লানি আর পড়িয়া নাই! শুধু আছে স্বপ্ন, বাতাসের মত বিদেহী স্বপ্ন...

এ কি সব ঘটিয়া গেল? কোথা হইতে শিশুর অন্তরে জাগিয়া উঠিল এই মধুর বেদনার স্বপ্ন-মিছিল? কোনদিন পৃথিবীতে সে তো তাহাদের কাহাকেও দেখে নাই...অথচ মনে হয়, সে যেন তাহাদের ভাল করিয়াই জানে, চেনে। কোথা হইতে তাহারা আসিল? সৃষ্টির কোন্ বিস্মৃত গহ্বরের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে? একদা যাহা ছিল, তাহারই সংবাদ কি ইহারা বহন করিয়া আনিল? না, একদা যাহা হইবে, তাহারই সংবাদ পূর্বাহ্নে দিয়া গেল?

অবশেষে খেলা শেষ হইয়া আসে, একটি একটি করিয়া সব স্বপ্ন-কাহিনী ফুরাইয়া যায়...আবার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, জোয়ারে দুকূলপ্লাবী গৃহান্তরালবর্তী সেই পরিচিত নদী...তরল গাম্ভীর্যে ধীরে, এত ধীরে বহিয়া চলিয়াছে, মনে হইতেছে যেন স্থির অচঞ্চল। এবং দূরে, বহু দূরে, দিগন্তরেখার কোলে ইস্পাত-নীল আলোর মত চোখে পড়ে জলময় একটা কম্পমান রেখা...সাগর, মহাসাগর...। তাহারই উদ্দেশ্য নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীরই জন্য সাগর যেন আগাইয়া আসিয়াছে। সাগরের বুকে জাগিয়াছে কামনার তরঙ্গ। সাগর যে

নদীকেই চায়।...সেই মিলনের সংগীত বাতাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, জল-তরঙ্গে বাজে উন্মাদ নৃত্যের ছন্দ—সে-ছন্দ যেন বিজয়ীর মতন বিশ্বকে দেয় দোলা...

...মুক্ত বিহঙ্গমের মতন উধাও মহাশূন্যে ছুটিয়া চলে মুক্ত মন... তার আলোক-মত্ত সংগীতে ভরিয়া যায় শূন্য দিগঙ্গন...আনন্দ...আনন্দ ...আনন্দ ছাড়া আর কিছু নাই বিশ্ব-ভুবনে!...ওগো মহানন্দ, অনন্ত, অপার!...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়। নিঃশব্দে নামিয়া আসে সন্ধ্যা। সামনের সোপানাবলী অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যায়। বাহিরে নদীজলে ধীরে পড়িতে থাকে একটি দুটি করিয়া বৃষ্টির বিন্দু, নদীজলে ক্ষণিকের মত বৃত্ত আঁকিয়া নদীজলেই অদৃশ্য হইয়া যায়। মাঝে মাঝে আধ-অন্ধকারে স্রোতজলে ভাসিয়া আসে ভগ্ন বৃক্ষ-শাখা, স্রোতজলে নীরবে আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। সামনে মৃত্যু-জাল বিস্তার করিয়া শিকারের আশায় যে মাকড়সাটি বসিয়াছিল, নিরাশ হইয়া দূরে জালের প্রত্যন্ত দেশে সরিয়া যায়। ম্লান, বিবর্ণ মুখ ধূলায় মলিন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্তরে তাহার ধীরে ধীরে সমুদিত হইতেছে আনন্দের সূর্য। তাহারই স্নিগ্ধ উত্তাপে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়ে।

[তিন]

অবশেষে তাহাকে হার মানিতেই হয়। দুরন্ত প্রতিবাদ আর দুর্দান্ত প্রতিরোধ সত্বেও, প্রহারই জয়ী হইল, তাহার সমস্ত অনিচ্ছা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল! প্রতিদিন সকালে তিন ঘণ্টা এবং প্রতি-দিন সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা করিয়া পিয়ানোর সামনে তাহাকে বসিতে হইত। আনন্দের, স্বপ্নের উৎস পরিণত হইল নির্যাতনের যন্ত্রে। ক্লান্তিতে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিত, তবুও মনকে সজাগ করিয়া রাখিতে হইত, দুই গন্ড ভাসাইয়া অশ্রু-বিন্দু গড়াইয়া পড়িত, সমানে সেই শাদা আর কালো পর্দাগুলির উপর ছোট্ট দুটি হাত চালাইয়া যাইতে হইত... শ্রান্তিতে, হিমে আঙ্গুল অবশ হইয়া আসিত কিন্তু থামিবার উপায় ছিল না ; থামিলেই কিম্বা ভুল পর্দায় আঙ্গুল পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উদ্যত রুল সবেগে আসিয়া পড়িত...রুলের আঘাতের চেয়েও কঠিন

লাগিত নির্দয় শিক্ষকের ক্রূর কুৎসিত ভর্ৎসনা। বালকের মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিত, বোধহয় সে সত্যই সঙ্গীতকে ঘৃণা করে। অথচ সমস্ত শ্রান্তির পিছনে কোথা হইতে একটা আকুল আগ্রহও সে অনুভব করিত ; মেলশিয়রের প্রহার-ভয়ের সহিত যাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এই সংগোপন আগ্রহের পিছনে ছিল তাহার ঠাকুরদার কতকগুলি কথা। তাহাকে সেইভাবে কাঁদিতে দেখিয়া একদিন বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল, সঙ্গীত হইল চিরসুন্দর, সাধনার বস্তু, আজ সে সেই সঙ্গীতের জন্য যে দুঃখ বেদনা পাইতেছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, একদিন জীবনের পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে তাহার পরিপূরণ হইয়া যাইবে। বৃদ্ধ কোন দিন জাঁ-ক্রিস্তফকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিত না। যখনই তাহার সহিত আলাপ করিত, তখনই তাহাকে পুরা মানুষ হিসাবেই ধরিয়া লইত তাহার জন্য জাঁ-ক্রিস্তফ মনে মনে এই বৃদ্ধকে পরম শ্রদ্ধার চোখেই দেখিত। তাই বৃদ্ধের এই সহজ স্বচ্ছ আশ্বাসের বাণী সংগোপনে জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া ছিল। নিজের সম্বন্ধে যে সুমহান ধারণা সে নীরবে অন্তরে পোষণ করিত, বৃদ্ধের এই আশ্বাসে সে তাহার পূর্ণ সমর্থন পাইল।

জার্মানির অন্য সব শহরের মতন তাহাদের শহরেও একটা থিয়েটর ছিল, যেখানে অপেরা, কমেডি, ছোট ছোট নাটক, বড় নাটক, প্রহসন সব কিছুই অভিনীত হইত। প্রত্যেক সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত অভিনয় চলিত। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল প্রত্যেকটি অভিনয় দেখিতেন, রঙ্গমঞ্চের প্রত্যেক অভিনয়ে ছিল সমান আগ্রহ। একদিন তিনি সঙ্গে করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফকে লইয়া গিয়াছিলেন। অভিনয়ের কয়েকদিন আগে, বৃদ্ধ কথায় কথায় ক্রিস্তফকে নাটকটির বিষয় সম্পর্কে গল্প বলিয়া শোনান। জাঁ-ক্রিস্তফ সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, তবে এইটুকু বুঝিল যে, রঙ্গমঞ্চে একটা ভয়ংকর কিছু সে দেখিতে পাইবে এবং দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুলও হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে কিন্তু একটা অস্পষ্ট ভয়ও তাহাকে পাইয়া বসিল, কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করিল না। ঠাকুরদার মুখে শুনিল, যে নাটকটি তাহারা দেখিতে যাইবে, তাহার মধ্যে একটা ভয়ংকর ঝড়ের ব্যাপার আছে, রঙ্গমঞ্চের উপর তুমুল ঝড় দেখা দিবে। জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় হইল, অত কাছাকাছি যদি ঝড়ের

বিদ্যুৎ তাহার গায়ে আসিয়া লাগে! একটা বড় রকমের যুদ্ধও নাকি হইবে; সে-যুদ্ধে সে কি জড়াইয়া পড়িবে? অভিনয়ে যাইবার আগের-দিন রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া আগামী দিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তীব্র আতঙ্ক তাহাকে পাইয়া বসিল, না জানি কি ভয়ংকর বিপদের মধ্যেই না গিয়া পড়িবে! পরের দিন সকালে সে মনে মনে প্রার্থনা করিল, যদি কোন কারণে তাহার ঠাকুরদার থিয়েটরে যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে, ভালই হয়। কিন্তু অপরাহ্নে যখন থিয়েটরে যাইবার লগ্ন আসন্ন হইয়া উঠিল, অথচ ঠাকুরদার দেখা নাই, তখন সে, আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠিল। বারেবারে জানালায় গিয়া মুখ বাড়াইয়া পথে চাহিয়া দেখে। অবশেষে বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা থিয়েটরের জন্য পথে বাহির হইয়া পড়িল। জাঁ-ক্রিস্-তফের বুক ঘন ঘন কাঁপিয়া ওঠে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসে, সমস্ত জিভ আড়ষ্ট বোধ হয়, একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারে না।

এতদিন ধরিয়া বাড়ীতে যে রহস্যলোকের কথা সে শুধু গল্পতেই শুনিয়াছে, আজ সেই রহস্যলোকের ভিতরে সে প্রথম প্রবেশ করিবে। দেখিতে দেখিতে তাহারা তাহার দ্বার-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাছে ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে জাঁ-ক্রিস্‌তফ প্রাণপণ জোরে ঠাকুরদার হাত ধরিয়া রহিল। থিয়েটরের দরজার সামনে বৃদ্ধের সহিত কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর দেখা হইল এবং তাহারা হাসিয়া কি সব বলাবলি করিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, ভাবিয়া পায় না, এ হেন ভীষণ সময়ে ইহারা কি করিয়া অমন হাসিয়া কথা বলিয়া চলিয়াছে!

অর্কেষ্ট্রার পেছনে প্রথম সারিতে বৃদ্ধ তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। সামনের রেলিঙের উপর ভর দিয়া তিনি অর্কেষ্ট্রাদলের একজন বাদকের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। সেখানে বৃদ্ধের অসীম প্রতিপত্তি, সংগীতজ্ঞ হিসাবে সবাই বৃদ্ধকে সমীহ করিয়া চলে, বৃদ্ধের কথা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে। বৃদ্ধ তাহা ভাল করিয়াই জানিত এবং তাহার সুযোগ লইতে কোন দ্বিধা করিত না। জাঁ-ক্রিস্‌তফ কান পাতিয়া থাকে, কিন্তু কিছুই যেন স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় না। কয়েক মুহূর্ত পরে যে-সব ভয়ংকর ঘটনা ঘটিবে বলিয়া তাহার ঠাকুরদার মুখে শুনিয়াছিল, তাহারই সম্ভাবনার আশংকায় তাহার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সেই রঙ্গ-

মঞ্চের অপরূপ সজ্জাসমারোহ, প্রেক্ষাগৃহের সেই সুবিপুল বৈভব দেখিয়া সে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। চারদিকে সেই বিপুল জন-সমারোহ দেখিয়া সে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। সাহস করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পারে না, মনে হয় যেন সেই অসংখ্য লোকের দৃষ্টি তাহারই উপর পড়িয়া আছে। মাথার টুপিটা দুই জানুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া স্থির বদ্ধ দৃষ্টিতে সামনের আলোক-উজ্জ্বল রহস্য যবনিকার দিকে চাহিয়া থাকে।

এমন সময় পর পর তিনটি ঘণ্টা-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। ঠাকুরদা ভাল করিয়া নাক মুছিয়া লইয়া পকেট হইতে নাটকের সঙ্গীত-লিপির পুস্তিকাটি বাহির করেন। অপেরা দেখিবার সময়, বৃদ্ধ সর্বদাই আগে নাটকের সঙ্গীত-লিপিটি সংগ্রহ করিয়া লইতেন এবং নিষ্ঠাসহকারে লাইনের পর লাইন মিলাইয়া দেখিতেন এবং তাহাতেই এমন মশগুল হইয়া থাকিতেন যে রঙ্গমঞ্চে কি ঘটিতেছে, তাহা অনেক সময় চাহিয়া দেখিতেন না। অর্কেষ্ট্রা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গীতের আরম্ভে জাঁ-ক্রিস্তফ যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। এই শব্দের জগৎ তাহার নিকট অতি সুপরিচিত, সে এই পৃথিবীরই বাসিন্দা, তাই সেই সঙ্গীতের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া পায়।

ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হইল। পেষ্টবোর্ড দিয়া তৈরী গাছ আর নির্জীব অরণ্য-প্রাণী রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। বালক বিমুগ্ধ আনন্দে চাহিয়া দেখে, কিন্তু বিস্মিত হইবার মতন কিছুই দেখিতে পায় না! নাটকটির ঘটনাস্থল হইল, প্রাচ্য-জগতের কোন দেশ। পূর্বাঞ্চলের বিচিত্র দৃশ্য-সংস্থান সম্বন্ধে বালকের কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহা ছাড়া, যে কাব্যের উপর নির্ভর করিয়া অপেরাটি রচিত হইয়াছিল, তাহার অবাস্তব বিষয় বস্তুর মধ্যে মানবীয় রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই জাঁ-ক্রিস্তফ প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, চরিত্রগুলিকে আলাদা করিয়া চিনিতে পারে না, একজনকে চিনিতে গিয়া অপরজনকে ভুল করিয়া বসে, বারবার ঠাকুরদার জামার কোণ টানিয়া অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে, সেই সব প্রশ্ন হইতে জাঁ-মিচেল স্পষ্ট বুঝিতে পারে, বালক কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আদৌ খারাপ লাগিতেছিল না, একটা তীব্র কৌতূহল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সঙ্গীতাংশ হইতে সে আপনার মনে একটা স্বতন্ত্র স্বপ্ন-জগৎ রচনা করিয়া লইয়াছিল, যাহার সহিত

চোখের সামনের রঙ্গমঞ্চের জগতের কোনই সম্পর্ক ছিল না। তাই পদে পদে রঙ্গমঞ্চের বাস্তবতার সহিত তাহার স্বপ্ন-ঘটনার সংঘর্ষ বাধিয়া যায়, তাহার অনুমানের বিপরীত এমন একটা কিছু ঘটিয়া বসে, যাহাতে তাহার স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া যায়, নূতন করিয়া তখন আবার গড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাতে সে বিশেষ কিছু ক্ষুণ্ণও হয় না। রঙ্গমঞ্চে তাহার চোখের সামনে যে-সব চরিত্র আসে যায়, তাহাদের মধ্য হইতে সে নিজের পছন্দমত কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়াছে, এবং নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু তাহাদের গতিবিধি এবং পরিণতি লক্ষ্য করিয়া চলে। বিশেষ করিয়া একটি সুন্দরী নারী, তাহার বয়স সে ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না, একরাশ দীর্ঘ কেশ, আয়ত দুই চক্ষু, নগ্ন পদ...তাহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। নাটক বা অভিনয়ের মধ্যে যে-সব অস্বাভাবিক ত্রুটি পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, বালকের রসবোধে তাহা আদৌ আঘাত করে না। তাহার শিশু-চেতনায় অভিনেতাদের কুৎসিত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুই ধরা পড়ে না। বৃহৎ-উদর, মাংসল অভিনেতাদের নিরর্থক অঙ্গ-ভঙ্গী, সারিবদ্ধ কোরাসের মধ্যে নানা সাইজের দেহের বীভৎস বৈষম্য, বেমানান পরচুলার অসামঞ্জস্য, নায়িকার মুখে অতিরিক্ত মেক-আপের কড়া পেনসিলের দাগ, কিছুই তাহার চোখে পড়ে না। প্রথম প্রণয়-মুগ্ধ পুরুষ যেমন কামনার তীব্রতার মধ্যে প্রণয়িনীর ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুই দেখিতে পায় না, তেমনি জাঁ-ক্রিস্তফের চোখে অভিনয়ের কোন ত্রুটিই ধরা পড়ে না। শিশুর অন্তরে যে স্বাভাবিক মায়াশক্তি থাকে, যাহার সাহায্যে সে বাস্তবকে নিমেষে তাহার মনের রঙে রাঙাইয়া লইতে পারে, সেই অপরূপ শক্তির সহায়ে জাঁ-ক্রিস্তফ রঙ্গমঞ্চের সমস্ত বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি আর বৈষম্যকে নিজের মনের মতন করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লয়।

সঙ্গীতই এই অসাধ্যসাধনে তাহার সকলের চেয়ে বেশী সহায়ক। রঙ্গমঞ্চের সমস্ত দৃশ্যের উপর তাহা যেন আবছায়া এক মায়া রচনা করিয়া দিল, যাহার স্পর্শে সব কিছুই সুন্দর সুমধুর ও বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। সব কিছুকেই ভালবাসিবার এক দুরন্ত সাধ অন্তরে জাগাইয়া তুলিল এই সঙ্গীত এবং সম্মুখের বাস্তবতাকে আড়াল করিয়া দিয়া যে শূন্যতাকে সৃষ্টি করিল, নিজের সৃজিত ভালবাসার ছায়ামূর্তি দিয়া তাহাকে আবার ভরাইয়া তুলিল। নিজের অন্তরের সেই আবেগের আকুলতায় বালক যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে নাটকের

কথাবার্তা বা অভিনেতাদের অঙ্গ-ভঙ্গী তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলে, তাহার স্বর যেন কাটিয়া যায়, তখন চোখ বন্ধ করিয়া থাকে, সাহস করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে না। ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না সেইভাবে থাকা ঠিক হইতেছে কি না, তাই ক্ষণে ক্ষণে লজ্জিত বিবর্ণ হইয়া ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, শঙ্কিত হইয়া ওঠে, পাছে তাহার সেই যন্ত্রণার ব্যাপার লোকের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। সাধারণ অপেরায় সচরাচর চতুর্থ অঙ্কে সেই অনিবার্য হৃদয়-বিদারক লগ্ন দেখা দেয়, যেখানে গায়ককে রঙ্গমঞ্চে কাঁদাইয়া ভুলাইয়া দিবার এবং নায়িকাকে তারস্বরে মর্ম-বেদনা নিবেদন করিবার জন্য চিৎকারের সুযোগ দেওয়া হয়। এই নাটকটিতেও ক্রমশ সেই হৃদয়বিদারক লগ্ন আগাইয়া আসিল। ক্রিস্তফের অন্তর বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুই হাত দিয়া জোর করিয়া কণ্ঠ রোধ করিয়া রহিল, চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল, হাত-পা হিম হইয়া আসিল। ঠাকুরদা পাশেই বসিয়াছিলেন, আশ্চর্য! তাঁহার মধ্যে কিন্তু কোন ভাবান্তরই সে লক্ষ্য করিল না।

এমন সময় অভিনয় শেষ হইয়া গেল, হঠাৎ সেইভাবে কেন যে শেষ হইয়া গেল তাহা জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আবার ধীরে যবনিকা পড়িল। শ্রোতারা সব উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বপ্ন-সৌধ ভাঙিয়া গেল।

রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া দুইজন শিশু আবার ঘরমুখো পথ ধরিল—একজন বৃদ্ধ, আর একজন বালক। অপরূপ রাত্রি! অন্ধকার টলমল করিতেছে জ্যোৎস্নার প্লাবনে! কেহ কোন কথা বলিল না। উভয়েই স্মৃতিতে রোমন্থন করিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধই জিজ্ঞাসা করিল: 'কিরে, কেমন লাগলো?'

জাঁ-ক্রিস্তফ হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না। তখনও পর্যন্ত সে মনে মনে তাহার আবেগের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। কোন রকমে চেষ্টা করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে সে বলিল: 'খুব ভাল!'

বৃদ্ধ খুশি হইল। কিছুক্ষণ পরে যেন আপনার মনেই বলিয়া উঠিল: 'চমৎকার জিনিস...এই সঙ্গীত আর সুরের সৃষ্টি! ঐরকম অপূর্ব সঙ্গীত, অপরূপ স্বপ্ন সৃষ্টি করা, তার চেয়ে গৌরবের আর কি থাকতে পারে?'

বৃদ্ধের কথায় বালকের অন্তর সহসা উচ্চকিত হইয়া ওঠে। সত্যই

তো! যে বিস্ময় সে এইমাত্র দেখিয়া আসিল, তাহা মানুষই তৈয়ারী করিয়াছে! এ কথা তো একবারও তাহার মনে হয় নাই! যেন আপনা হইতেই হইয়াছে, প্রকৃতির গাছপালা যেমন হইয়া থাকে, ইহাই সে ধরিয়া লইয়াছিল। তাহারই মতন একজন মানুষ এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে ...একদিন সে-ও তো এমনি করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে! সে-ও তো একদিন সংগীতে, সুরে এই ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারে! জীবনে যদি কোন দিন সে তাহা করিতে পারে, অন্তত একদিনের জন্যও! তারপর...তারপর যাহা খুশি, তাহাই হউক...মরিতেও যদি হয়, দুঃখ কি!

আবেগ-আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে দাদুকে : 'দাদু, কে এই সব তৈরী করেছে? সে কে?'

বৃদ্ধ উত্তরে জানায় বার্লিনে ম্যারি হাস্‌লার নামে একজন জার্মান শিল্পী আছেন, তাঁহারি সৃষ্টি। হাস্‌লারের সঙ্গে বৃদ্ধের একবার আলাপ-পরিচয়ও হইয়াছিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ উৎকর্ণ হইয়া শোনে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে: 'আর তুমি?'

বৃদ্ধ কাঁপিয়া ওঠে। বলে : 'আমি...আমি কি?'

'তুমিও ঐরকম সৃষ্টি করেছ?'

ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বৃদ্ধ জবাব দেয় : 'নিশ্চয়ই!' তারপর নীরব হইয়া যায়। নীরবে কয়েক পা অগ্রসর হইবার পর, আপনা হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বৃদ্ধের বক্ষ আলোড়িত করিয়া বাহির হইয়া আসে। বালক অজ্ঞাতে তাঁহার জীবনের এক বৃহৎ বেদনাকে জাগাইয়া দিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের জন্য অপেরা ও সংগীত রচনা করিবার বহু বাসনা বহুকাল ধরিয়া বৃদ্ধ অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু অনুকূল প্রেরণার অভাবে কোন দিনই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও পর্যন্ত তাহার ডেস্কে দুই-এক অঙ্কের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আছে, কিন্তু সেই রচনার সার্থকতা সম্পর্কে তাহার এতটুকুও ভ্রান্তি নাই যে বিচারের জন্য বাহিরে কাহাকেও সে তাহা দেখাইবে।

নীরবেই দুইজনে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে আর কোন কথা কেহ আর উচ্চারণ করিল না। রাত্রিতে দুইজনেই ঘুমাইতে পারিল না। ব্যর্থতার বেদনায় বৃদ্ধের অন্তর ভারাতুর হইয়া থাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাইবেলখানি বুকে তুলিয়া লয়। ওধারে জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিছানায় শুইয়া বারবার করিয়া সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাকে মনের

মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে আনিতে চেষ্টা করে। এইভাবে রোমন্থন করিতে করিতে সেই নগ্নপদ তরুণীর মূর্তি জাগিয়া ওঠে। তন্দ্রায় চোখ বুঁজিয়া আসিতে আসিতে সহসা কানে আসিয়া যেন বাজে সন্ধ্যায় শ্রুত সঙ্গীতের একটা কলি...অতি সুস্পষ্ট ...যেন তাহার সামনেই কেহ বাজাইতেছে। সারা দেহ উচ্চকিত হইয়া ওঠে। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া সে লাফাইয়া বালিশের উপরেই উঠিয়া বসে। মাথায় ভ্রমর-গুঞ্জনের মতন সেই সঙ্গীতের কলি ঘুরিতে থাকে। আপনার মনে বলিয়া ওঠে: 'একদিন আমিও এইরকম সঙ্গীত রচনা করবো! সত্যি, রচনা করতে পারবো কি?'

সেইদিন থেকে বালকের সর্বোত্তম কামনা হইল, আবার একদিন থিয়েটরে যাওয়া! মেলশিয়র তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল, যদি সে মন দিয়া তাহার নির্দিষ্ট সঙ্গীত-পাঠ শেষ করিতে পারে, তাহা হইলে পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে সামনের সপ্তাহে থিয়েটরে যাইতে দেওয়া হইবে। বালক উল্লসিত হইয়া নবীন নিষ্ঠায় পিয়ানো বাজাইতে সুরু করিয়া দেয়। তাহার একমাত্র চিন্তা, কখন আবার সে থিয়েটরে গিয়া বসিতে পারিবে। সপ্তাহের প্রথম কয়েকদিন শুধু গত-অভিনয়ের কথাই তাহার চিন্তার রাজ্যে ঘুরিতে লাগিল, সপ্তাহের শেষের দিকে সে-চিন্তা চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে আসিল, নূতন বই এবার কি দেখিবে! যদি থিয়েটরের দিন সে অসুস্থ হইয়া পড়ে, যদি কোন অসুখ হয়! সে-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইত যেন তিন চার রকমের অসুখের লক্ষণ তাহার দেহের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কিছুতেই তাহা প্রকাশ করা চলিবে না। অবশেষে যখন সেই বহু-আকাঙ্খিত দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল, সকাল বেলা সে কোন খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারিল না। সারা দিন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। পঞ্চাশবার করিয়া ঘড়িতে সময় দেখে, সন্ধ্যা বুঝি আজ আর আসিবে না! অবশেষে টিকিট-ঘর খুলিবার প্রায় একঘণ্টা আগেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, টিকিটের অভাবে যদি সীট্ না পায়! টিকিট-ঘর খুলিতেই টিকিট কিনিয়া বসিয়া আছে। একটা নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। ঠাকুরদার মুখে সে গল্প শুনিয়াছিল, দুই-একবার নাকি তেমন লোক হয় নাই বলিয়া অভিনয় আর হয়ই নাই, কর্তৃপক্ষ টিকিটের দাম ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি সেই রকমই হয়! তাই উদগ্রীব হইয়া প্রবেশ-পথের দিকে

চাহিয়া থাকে, একজন দুইজন করিয়া মনে মনে গুণিতে আরম্ভ করিয়া দেয়: 'তেইশ...এইবার চব্বিশ...পঁচিশ...উঁহু...পঁচিশ জনে কি আর থিয়েটর হয়! কই, আর যে কেউ আসে না! নাঃ, আজ আর তাহ'লে লোক হচ্ছে না!' এমন সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল, উপরের বক্সে এবং ড্রেস্-সার্কেলে কয়েকজন রীতিমত সম্ভ্রান্তবেশী লোক আসিয়া বসিল। তাহাদের দেখিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হয় বালক। নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করে: 'এরকম সম্ভ্রান্ত লোকদের নিশ্চয়ই থিয়েটর না দেখে ফিরে যেতে বলতে পারে না। অন্তত ওঁদের দেখাবার জন্যে থিয়েটার করতেই হবে!' কিন্তু সে-যুক্তিও খুব অকাট্য বলিয়া তাহার মনে হয় না। এক ভরসা যদি অর্কেষ্ট্রা বাজাইবার জায়গায় বাদকরা আসিয়া বসে! তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোঝা যাইবে যে থিয়েটর হইবে! কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, তাহার ঠাকুরদা বলিয়াছিলেন: একদিন এইরকম অবস্থা—বাদকরা আসিয়া বসিল, যথারীতি যবনিকাও উত্তোলিত হইল, কিন্তু থিয়েটরের কর্তৃপক্ষরা আসিয়া জানাইল, অনিবার্যকারণে আজ প্রোগ্রামের পরিবর্তন করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছে। ঈগল-পাখীর দৃষ্টি লইয়া সে সামনের অর্কেষ্ট্রায় যেখানে বেহালা-বাদকের স্টাণ্ডের উপর আজকের সংগীতের অনুলিপি লেখা ছিল, তাহা পড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করে। হাঁ, ঠিকই আছে, প্রোগ্রাম ঠিকই আছে। কিন্তু দু'মিনিট যাইতে না যাইতে, তাহার মনে হয়, হয়ত ভুল দেখিয়া থাকিবে, তাই আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চেষ্টা করে। না, সে ভুল দেখে নাই! কিন্তু সংগীত-পরিচালক তো এখনও আসে নাই! নিশ্চয়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! যবনিকার অন্তরালে সহসা কিসের যেন চাঞ্চল্য জাগিয়া ওঠে, অস্পষ্ট কথাবার্তা আর সেই সঙ্গে দ্রুতপদক্ষেপ কানে আসে। বোধহয় কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে, বোধহয় কোন বিরূপ বিঘ্ন ঘটিয়া গিয়াছে! পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। সংগীত-পরিচালক তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মনে হয়, এতক্ষণে সবই প্রস্তুত...কিন্তু, কৈ আরম্ভ তো হইল না! কি ব্যাপার? অধীর চঞ্চল হইয়া ওঠে। এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন সজোরে কাঁপিয়া উঠিল। অর্কেষ্ট্রা আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েক ঘণ্টা এখন আনন্দের সাগরে ডুবিয়া থাকিবে জাঁ-ক্রিস্তফ, একমাত্র দুঃখ এত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, একটা সংগীত-অনুষ্ঠান জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তরে তীব্রতর আলোড়ন আনিয়া দিল। যে-প্রথম অপেরাটি শুনিয়া সে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, তাহার রচয়িতা স্বয়ং ম্যারি হাস্‌লার তাহাদের নগরে আসিবেন। তাঁহার নিজের সৃষ্ট একটা নূতন রচনার কনসার্ট তিনি নিজেই পরিচালনা করিবেন। সারা শহর উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সেই নবীন সংগীত-স্রষ্টাকে লইয়া তখন জার্মানীতে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল, একপক্ষকাল ধরিয়া সর্বত্র তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব বিতর্ক থামিয়া গেল। মেলশিয়র আর বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের বন্ধুরা অষ্টপ্রহর তাঁহাদের কাছে আসিয়া সেই সম্মানিত সংগীত-স্রষ্টা সম্বন্ধে হাজার রকমের কৌতূহলী প্রশ্ন করেন ; তাঁহার বিচিত্র সব রীতিনীতি আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গল্পে শহর ভরিয়া ওঠে। বালক নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই সব কাহিনী শোনে। সেই মহাপুরুষ যে-মাটিতে এখন বিচরণ করিতেছেন, যে-বাতাস তিনি নিঃশ্বাসে লইতেছেন, জাঁ-ক্রিস্তফও সেই মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে, সেই একই বাতাস নিঃশ্বাসে লইতেছে, ভাবিতে এক বিপুল গর্বে বালকের মন ভরিয়া ওঠে।

গ্রাণ্ড ডিউকের অতিথিস্বরূপ হাস্‌লার প্রাসাদেই উঠিয়াছিলেন। থিয়েটরে রিহার্সাল দিবার জন্য ছাড়া তিনি বাহিরে আর কোথাও যাইতেন না। তখন থিয়েটরে অবশ্য জাঁ-ক্রিস্তফের উপস্থিত থাকিবার কোন উপায়ই ছিল না। অন্যসময়, তিনি প্রিন্সের গাড়ীতে চড়িয়াই একটু আধটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাই শত ইচ্ছা সত্বেও জাঁ-ক্রিস্তফ সেই ঈপ্সিত মহাপুরুষের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিল না। একবার শুধু তিনি যখন প্রিন্সের গাড়ীতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, জাঁ-ক্রিস্তফ দূর হইতে ক্ষণিকের জন্য তাঁহাকে দেখিতে পায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুইধার হইতে পথচারীদের ধাক্কা সামলাইয়া রাস্তায় অপেক্ষা করিয়া থাকার ফলে, সে শুধু হাস্‌লারের গায়ে যে ফার কোটটি ছিল, তাহাই দেখিতে পাইল। প্রাসাদের যে-ঘরে তিনি আছেন, জাঁ ক্রিস্তফ তাহার খবর লইয়া প্রাসাদের সামনে রাস্তায় সেই ঘরের জানালার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাহিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখে সে-ঘরের জানালা বন্ধই থাকে। যাহারা খবরাখবর একটু বেশী রাখিত, তাহারা বলে, হাস্‌লার নাকি দিনের আলো সহ্য করিতেই পারেন না, চির-রাত্রির মধ্যেই নাকি তিনি বাস করেন।

অবশেষে একদিন সেই বহু-আকাঙ্খিত শুভলগ্ন জাঁ-ক্রিস্তফের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, জাঁ-ক্রিস্তফ তাহার উপাস্য দেবতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পাইল। কনসার্টের দিন। সারা শহর ভাঙিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সু-উচ্চ রয়েল বক্সের দুই ধারে দুই মুকুটদণ্ড লইয়া দুইজন সুসজ্জিত বালক-ভৃত্য দাঁড়াইয়া, আর তাহার ভিতর গ্রাণ্ড ডিউক সপারিষদ বসিয়া আছেন। সমস্ত থিয়েটার বাড়ী আলোকে, পুষ্পে সুশোভিত। রঙ্গমঞ্চকে ওকের শাখা আর পুষ্প-মাল্যে সাজান হইয়াছে। শহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, এমন সব বাজিয়েই আজ অর্কেষ্ট্রায় যোগদান করিয়াছে। মেলশিয়রও আজ বেহালা হাতে আসিয়াছে। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল নিজে কোরাস্ পরিচালনা করিতেছিলেন।

এমন সময় হাস্লার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষা-গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি জাগিয়া উঠিল, মহিলারা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাস্লারকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য। জাঁ-ক্রিস্তফ দুই চোখ দিয়া যেন তাঁহাকে গিলিতে লাগিল। হাস্লার যখন নিজের প্রোগ্রাম সুরু করিয়া কনসার্ট পরিচালনা করিতে লাগিলেন, তখন সঙ্গীতের ভাব অনুযায়ী তাঁহার নমনীয় মুখে নিমেষে নিমেষে রেখার পরিবর্তন হইয়া চলিল। তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে, তাঁহার মুখের বিচিত্র রেখায় রেখায় তাঁহার সৃষ্ট সঙ্গীতের ছায়া আসিয়া পড়িল। জাঁ-ক্রিস্তফ সারা মনপ্রাণ দিয়া শোনে। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে কিসের একটা ধাক্কা লাগিয়া সুরের স্নিগ্ধ ধারার সমতা যেন ছিন্ন হইয়া যায়, কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য সুরের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে, বালকের ভাল লাগে না। আপনার অজ্ঞাতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। বাতাস অতিরিক্ত ভারী বোধ হয়। যেন নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। স্থির হইয়া আসনে বসিয়া থাকিতে কষ্ট হয়, ছটফট্ করিতে সুরু করিয়া দেয়। ভয় হয়, পাছে তাহার এই অস্বস্তির কথা জানিতে পারিয়া লোকে তাহার দিকেই চাহিয়া থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সঙ্গীতের সুর ধাক্কা মারিয়া যেন তাহাকে আসন হইতে ঠেলিয়া ফেলে, সে উঠিয়া দাঁড়ায় আবার বসে, বিরক্ত হইয়া সঙ্গীতের প্রতিবাদে এমনভাবে ঘাড় নাড়ে আর হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে যে পাশের আসনের শ্রোতা আহত হইবার ভয়ে বিরক্ত হইয়া ওঠে। জাঁ-ক্রিস্তফ বিস্মিত হইয়া দেখে, ঘর-ভর্তি শ্রোতারা কিন্তু উল্লসিত হইয়া উঠি-

য়াছে...সংগীতের রচনার কৃতিত্বে নয়, অনুষ্ঠান রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাহারা তৃপ্ত। জলসরা শেষে অভিনন্দন আর জয়-ধ্বনির ঝড় জাগিয়া উঠিল এবং জার্মান-প্রথা অনুযায়ী শ্রোতাদের সেই উল্লাস-ধ্বনির সংগে অর্কেষ্ট্রার জয়-ঢাকও বিজয়োল্লাসে ঘন ঘন বাজিয়া উঠিল, বিজয়ীর অভিনন্দনকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য। সেই সমবেত বিজয়-উল্লাসের উন্মাদনায় জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তরও মাতিয়া ওঠে, এক বিচিত্র গর্বে তাহার সারা অংগ কাঁপিতে থাকে যেন তাহারই জন্য এই জয়োল্লাস উঠিতেছে। দেখে, সেই অভিনন্দনের উত্তরে হাস্লারের মুখ শিশুর মতন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া তাহার বড় ভাল লাগিল। মহিলারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ফুল ছুঁড়িতে থাকে, পুরুষরা টুপি খুলিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত করে। সকলে রংগমঞ্চের দিকে অধীর আগ্রহে ছুটিল। সকলের সাধ সেই সংগীত-সম্রাটের সহিত করমর্দন করিবে। জাঁ-ক্রিস্তফ দেখিল, একজন ভক্ত হাস্লারের হাতটি তুলিয়া ধরিয়া নিজের অধরের কাছে আনিয়া চুম্বন করিল, আর একজন ভক্ত সেই ফাঁকে টেবিল হইতে হাস্লারের রুমালটি তুলিয়া লইয়া সরিয়া পড়িল। তাহারও ইচ্ছা করিতেছিল, ছুটিয়া রংগমঞ্চে হাস্লারের সামনে গিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু যদি সেই মুহূর্তে কোন রকমে সে সত্যই হাস্লারের সামনে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে লজ্জায় আর আবেগের তাড়নায় সেখান হইতে ছুটিয়াই পালাইত। তবুও সে আগাইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র দেহ লইয়া সেই স্কার্ট আর চলন্ত পায়ের জংগলের ভিতর দিয়া বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

সৌভাগ্যবশত কন্সার্ট শেষ হইয়া যাইবার পর তাহার ঠাকুরদা একদল বাদককে সংগে লইয়া গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদে হাস্লারকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সংগে জাঁ-ক্রিস্তফকেও লইলেন। তখন রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে। পথে সারাক্ষণ ধরিয়া তাহারা শুধু একটি কথাই বলিল, এই মাত্র যে সংগীত-রচনা তাহারা শুনিয়াছে, তাহারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এইভাবে তাহারা প্রাসাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলে জাঁ-ক্রিস্তফ লক্ষ্য করিল, নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে তাহারা হাস্লারের ঘরের জানলার তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের হাব-ভাব হইতে জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝিল তাহাদের যেন কোন সংগোপন মতলব আছে।

উৎকণ্ঠিত আবেগে সে অপেক্ষা করিয়া থাকে। রাত্রির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সহসা তাহারা যে-যার যন্ত্র তুলিয়া লইল এবং হাস্-লারের রচনা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিখ্যাত কয়েকটি অংশ বাজাইতে সুরু করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, প্রিন্সকে সঙ্গে লইয়া হাস্লার মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তযাত্রীর দল জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। সে-জয়োল্লাসের উত্তরে প্রিন্স এবং হাস্লার উভয়েই মাথা নত করিয়া প্রত্যুভিবাদন জানাইলেন। একজন রাজভৃত্য প্রাসাদের ভিতর হইতে আসিয়া তাঁহা-দের আমন্ত্রণ জানাইল, প্রিন্স তাঁহাদের ভিতরে ডাকিতেছেন। বড় বড় হলঘরের ভিতর দিয়া, বৃহদাকার রঙীণ সব প্রাচীর-চিত্রের তলা দিয়া, লৌহ-বস্ত্র-পরিবৃত নানা প্রস্তর-মূর্তির পাশ দিয়া, তাহারা আগাইয়া চলে। পায়ের তলায় কার্পেট এত পুরু যে কোন পদশব্দই কানে আসে না। অবশেষে তাহারা যে-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, জাঁ-ক্রিস্তফ দেখে, আলোয় যেন সেখানে দিন হইয়া আছে। সামনেই প্রশস্ত সব টেবিলে নানারকমের সুরার বোতল আর সেই সঙ্গে থরে থরে কত না উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে।

ঘরের ভিতর গ্রাণ্ড ডিউকও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ তাঁহাকে দেখিতেই পাইল না, কারণ, তাহার দৃষ্টি একমাত্র শুধু হাস্-লারের উপরই নিবদ্ধ ছিল। হাস্লার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাদের ধন্যবাদ জানাইলেন। ধীরে, অতি সাবধানে বাছিয়া বাছিয়া তিনি শব্দ প্রয়োগ করেন। কথা বলিতে বলিতে উপযুক্ত কথার অভাবে হঠাৎ থামিয়া যান, তারপর একটা উদ্ভট হেঁয়ালির মতন কিছু বলিয়া সকলকে হাসাইয়া তুলিয়া অসম্পূর্ণ উক্তির দায়িত্ব হইতে কৌশলে নিজেকে রক্ষা করেন। টেবিলে খাইতে বসিবার সময় হাস্লার কয়েক-জন বাদককে বাছিয়া লইয়া তাঁহার পাশে স্থান দিলেন এবং বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের পরম সৌভাগ্য যে সঙ্গীত সম্রাট তাঁহারই মারফৎ অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। হাস্লার বৃদ্ধের বাজনার রীতি-মত প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীত-রচনাকে যাহারা সর্বপ্রথম গ্রহণ করে, তাহার মধ্যে একদিন জাঁ-মিচেল ছিলেন এবং তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে, সে-বন্ধু জাঁ-মিচেলেরই ছাত্র, তিনি তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রশংসারই কথা শুনিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধের অন্তর ভরিয়া ওঠে এবং আবেগের আতিশয্যে বৃদ্ধ এমন অতিরিক্ত আড়ম্বরে হাস্-

লারের স্তব করিতে সুরু করিয়া দিলেন যে, জাঁ-ক্রিস্তফ লজ্জিতই হইয়া ওঠে। কিন্তু হাস্লারের নিকট তাহা অস্বাভাবিক বোধ হইল না, তিনি উপভোগই করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ নিজের উচ্ছ্বাসের অরণ্যে যেন পথভ্রান্ত হইয়া জাঁ-ক্রিস্তফের হাত ধরিয়া হাস্লারের নিকট উপস্থিত করিল। হাস্লার হাসিয়া বালকের দিকে চাহিলেন এবং অন্যমনস্কভাবে তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে বালক তাঁহার সঙ্গীতের ভক্ত এবং তাঁহাকে দেখিবে বলিয়াই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে, বালককে কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লজ্জায় আর আনন্দে বালক বাক্শক্তিহীন হইয়া যায়, সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্যন্ত পারে না। হাস্লার নিজের হাত দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরেন। জাঁ-ক্রিস্তফ বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া চাহিয়া দেখে। দেখে, দেবতার দুই চোখ স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে ভরা। সে-হাসির সংস্পর্শে বালকও হাসিয়া ওঠে। হাস্লার তাহাকে দুই হাত দিয়া বুকে টানিয়া লন। এক অপরূপ আনন্দে বালকের চেতনা ডুবিয়া যায়, দুই চোখ ভরিয়া আনন্দাশ্রু বাহির হইয়া আসে। এই সহজ সরল স্নেহ হাস্লারকেও মুগ্ধ করে, স্নিগ্ধ মমতায় তিনি বালকের শিরশ্চুম্বন করেন। তাঁহার কণ্ঠে ফুটিয়া ওঠে নিবিড় স্নেহ। নানারকম হাসির গল্প উত্থাপন করিয়া বালককে হাসাইতে চেষ্টা করেন। বিগলিত অশ্রুর ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া বালকের মুখে ফুটিয়া ওঠে নির্ভয় হাসি। দেখিতে দেখিতে বালক কখন সহজ স্বাভাবিক হইয়া ওঠে, নির্ভয়ে হাস্লারের সব প্রশ্নের জবাব দেয়। অস্ফুট কণ্ঠে হাস্লারের কানে কানে তাহার কিশোর মনের সংগোপন সব দুরাকাঙ্খার কথা বলিতে সুরু করিয়া দেয়, যেন তাহারা দুইজনে বহুদিনকার পরিচিত বন্ধু। বালক নিঃসঙ্কোচে জানায়, একদিন সে হাস্লারের মতনই অমনি বড় সঙ্গীতজ্ঞ হইবে, তাঁহারই মতন অপরূপ সঙ্গীত রচনা করিবে, তাহার একমাত্র বাসনা সে ইতিহাসের বীরদের মতন একজন সত্যিকারের বীরপুরুষ হইবে। কোথায় ভাসিয়া যায় তাহার লজ্জার, সঙ্কোচের বাঁধ, একান্ত সংগোপন সব কথা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বলিয়া চলে। কি যে সে বলিতেছে, তাহার কোন ধারণাই তাহার ছিল না, আবেগের আকুলতায় এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হাস্লার আনন্দে তাহার কলোচ্ছ্বাস শুনিয়া চলেন। বলেন : 'যখন

তুমি বড় হ'য়ে একজন সত্যিকারের বড় সংগীত-রচয়িতা হবে, তখন বার্লিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, কেমন? তখন আমি তোমাকে দিয়ে একটা কিছু করাবো!'

জাঁ-ক্রিস্তফ আনন্দে কোন উত্তরই দিতে পারে না।

হাস্‌লার উত্তরের জন্যে তাহাকে ক্ষেপাইতে সুরু করেন:

'তাহলে তুমি আসতে চাও না? কেমন?'

জাঁ-ক্রিস্তফ তবুও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। তাহার বদলে পাঁচ ছ'বার জোরে ঘাড় দোলাইয়া হাঁ বলিতে চেষ্টা করে।

'তাহ'লে তোমার সঙ্গে এই কথাই রইলো!'

জাঁ-ক্রিস্তফ আগেকার মতন তেমনি ঘাড় দোলাইয়া হাঁ জানায়।

'তাহলে একটা চুমু দাও!'

জাঁ-ক্রিস্তফ দুই হাত দিয়া সজোরে হাস্‌লারের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরে।

'আরে আমাকে ভিজিয়ে দিলে দেখছি! ইস্! নাক দিয়েও যে কান্না ঝরতে শুরু করেছে!'

হাস্‌লার হাসিয়া ওঠেন এবং ঈষৎ সচেতন ভাবেই নিজেই বালকের নাক মুছাইয়া দেন। বুক হইতে নামাইয়া হাত ধরিয়া তাহাকে একটা টেবিলের সামনে লইয়া যান, নিজের হাতে কেক তুলিয়া তাহার দুই পকেট ভর্তি করিয়া দেন। 'তাহলে, এখন বিদায়! কিন্তু চুক্তির কথা ভুলো না!'

জাঁ-ক্রিস্তফ আনন্দের সাগরে ডুবিয়া যায়। সেই মুহূর্তে তাহার নিকট অবশিষ্ট পৃথিবীর যেন কোন অস্তিত্বই থাকে না। মনের মধ্যে সন্ধ্যার সব ঘটনার স্মৃতি যেন হারাইয়া যায়। যতক্ষণ সেখানে থাকে, নিবিড় অনুরাগে শুধু হাস্‌লারের প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি ভংগীর দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু হাস্‌লারের একটা কথা সহসা তাহার মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। হাস্‌লার একটা গ্লাস হাতে তুলিয়া ধরিলেন, কথা বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার মুখের রেখা শক্ত হইয়া উঠিল, স্থির কণ্ঠে বলিলেন:

'আজকের দিনের এই আনন্দে আমরা যেন ভুলে না যাই, আমাদের শত্রুদের। যারা আমাদের শত্রু, কোনদিনই কোনমতেই তাদের ভুলে থাকা চলবে না। আমরা যে আজও পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই নি, তার জন্যে তাদের যে কোন ত্রুটির অভাব আছে, তা নয়। তারাও যদি নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে থাকে তাতেও আমাদের কোন ত্রুটির অভাব নেই।

তাই আজ আমি এই গ্লাস তুলে এই কথাই প্রস্তাব করছি, জগতে এমন জাত আছে, যাদের স্বাস্থ্যপান আমরা করতে পারি না।' ০

এই স্বাস্থ্যপান-প্রস্তাবের অভিনব রীতিতে সকলেই উল্লসিত হইয়া অনুমোদন জ্ঞাপন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের কঠিন রেখা আবারে কোমল হইয়া আসিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রস্তাব আর অনুবর্তী উল্লাসে জাঁ-ক্রিস্তফের সমস্ত আনন্দ যেন সহসা নিভিয়া গেল। অবশ্য তাহার উপাস্য বীর-পুরুষের কোন বিরূপ সমালোচনা করিতে তাহার মন চাহিল না, কিন্তু আজকের এমন ক্ষণে তিনি যে-জাতীয় বিরূপ জিনিসের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে সে মনে মনে ক্ষুণ্ণই হইল। আজকের এই অপরূপ মুহূর্তে, যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু আনন্দময়, তাহাই শুধু ভাবিতে ভাল লাগে, তাহাই শুধু ভাবা উচিত। কিন্তু এই বিরূপ চিন্তার ব্যথা বেশীক্ষণ তাহার মনে স্থায়ী হইল না, অন্তরের আনন্দের জোয়ারে তাহা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। বিশেষ করিয়া, তাহার ঠাকুরদা নিজের স্যামপেনের গেলাস হইতে তাহাকে পান করিতে দিয়াছিলেন, স্যামপেনের মধুর আবেশে সেই ক্ষীণ আঘাতের রেখা তলাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে বৃদ্ধ অনর্গল বকিয়া চলিলেন। হাস্লার যে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন, সেই আনন্দে বৃদ্ধ উদ্বেল হইয়া ওঠেন। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তারস্বরে ঘোষণা করেন, হাস্লার যে শুধু এক-জন প্রতিভাবান সঙ্গীত-রচয়িতা তাহাই নয়, তাঁহার মতন প্রতিভা এক শতাব্দীর মধ্যে আর দেখা যায় নাই। জাঁ-ক্রিস্তফ একটি কথাও বলিল না। তাহার অন্তরে আজ ভালবাসা যে অপরূপ উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে তাহার অন্তরের মধ্যেই অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। হাস্লার তাহাকে চুম্বন করিয়াছেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন! কি অসম্ভব ভাল তিনি! কত বড়, কত মহৎ!

শয্যায় আবেগে বালিশকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে করিতে আপনার মনে ভাবে: 'যদি দরকার হয়, আমি তাঁর জন্যে জীবন দিতে পারি...নিশ্চয়ই পারি!'

...সেদিন রাত্রিতে সেই ক্ষুদ্র শহরের আকাশকে চকিতে আলোকিত করিয়া যে জ্যোতিষ্ক চলিয়া গেল, জাঁ-ক্রিস্তফের জীবনের উপর তাহা একটা স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়া গেল। সারা শৈশব ধরিয়া

বালক হাস্‌লারের মূর্তিকে অষ্টপ্রহর চোখের সামনে ধরিয়া রাখিল এবং তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য সেই ছয় বৎসরের মানুষটি সংগীত রচনা করিবার সংকল্প করিল। প্রকৃতপক্ষে, তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সে তাহার চেতনার প্রথম দিন হইতেই মনে মনে সেই সংকল্পকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, সংগীত-রচনা যে কি বস্তু তাহার জ্ঞান জন্মাইবার আগে হইতেই সে সংগীত-রচনা করিয়া চলিয়াছিল।

রক্তের মধ্যে সুর লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের নিকট সবই সংগীত। যাহা কিছু গতিবান, যাহা কিছু স্পন্দমান, যাহা কিছু সচল, কম্পমান,—সূর্যালোক-স্পন্দিত গ্রীষ্মের দিন, ঝড়ের কাঁদনে-ভরা অন্ধকার নিষুতি রাত্রি, প্রদীপের কম্পমান আলোকের শিখা, দূর নক্ষত্রের জ্যোতির স্পন্দন, গর্জমান ঝঞ্চা, প্রভাতে সন্ধ্যায় পাখীর কূজন, পতঙ্গের লঘু পক্ষ-বিতাড়ন, বৃক্ষের পল্লব-মর্মর, মানুষের কণ্ঠ, কখনো বা প্রেম-সিক্ত কখন বা তিক্ত, ক্রুদ্ধ, প্রতিদিনের জীবনের অতি-পরিচিত সব শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়া বা খোলার আওয়াজ, চলে-যাওয়া মানুষের পায়ের শব্দ, রাত্রির নিস্তব্ধতায় শিরায় চলমান রক্তের গতির ছন্দ, যাহা কিছু নড়ে, চলে, কাঁপে, তাহাই সংগীত। একমাত্র শুধু প্রয়োজন, তাহাদের শুনিবার মত কান। এই বিপুল ধরণীর অস্তিত্বের মহাসংগীত জাঁ-ক্রিস্‌তফের অন্তরে আপনা হইতেই জাগাইয়া তোলে প্রতিধ্বনি, অনুরণন। যাহা কিছু সে দেখিত, যাহা কিছু সে অনুভব করিত, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাই তাহার অন্তরে সংগীতে সুরে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। সে যেন নিত্য শব্দায়মান একটা মৌচাক। কিন্তু তাহা কেহই জানিত না। সে নিজেও না।

সচরাচর বালকেরা যেমন করিয়া থাকে, তেমনি জাঁ-ক্রিস্‌তফও সারাদিন ধরিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া চলিত। রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে, কিম্বা এক পায়ে লাফাইতে লাফাইতে, কিম্বা ঠাকুরদার ঘরে মেঝেতে শুইয়া গালে হাত দিয়া একমনে যখন ছবির বই দেখিত, রান্নাঘরের কোণে নিজের ছোট্ট চেয়ারটিতে বসিয়া যখন দিবাস্বপ্ন দেখিত, যখনই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ঠোঁট বন্ধ করিয়া আপনার মনে সে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া চলিত। লুইসা কর্ণপাতই করিত না, কালেভদ্রে বিরক্ত হইয়া গোলমাল করিতে বারণ করিয়া উঠিত।

যখন এই অর্ধ-তন্দ্রা-ভাব আর ভাল লাগিত না, নড়িয়া চড়িয়া একটা কিছু করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিত, তখন সে সশব্দেই জাগিয়া উঠিত। গলা ছাড়িয়া সুরের ঝংকার তুলিত। নিজের সুবিধা মত সে প্রত্যেক কাজের জন্য এক একটা স্বতন্ত্র সুর নিজেই গড়িয়া লইয়াছিল। সকালবেলা স্নানের সময় জল-পাত্রে লাফাইয়া পড়িবার একটা আলাদা সুর ছিল, কতকটা হাঁসের ডাকের মত। পিয়ানোর সামনে টুলে গিয়া বসিবার সুর একরকম, আবার গানের কসরৎ শেষ করিয়া টুল পরিত্যাগ করিয়া উঠিবার সুর আর এক রকম, দ্বিতীয় সুরটি অবশ্য প্রথম সুরের অপেক্ষা ঢের বেশী আনন্দোজ্জ্বল। খাবার টেবিলে লুইসা যখন সুপের পাত্রটি তাহার সামনে ধরিত, তখন তাহার সুরে যেন ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিত; আহার-অন্তে খাবার-ঘর হইতে যখন শোবার-ঘরে যাইত, তখন গুরুগম্ভীর ছন্দে বিজয়-সঙ্গীতের মত সুর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত। মাঝে মাঝে ছোট ভাই দুটিকে লইয়া সে শোভাযাত্রা করিয়া চলিত, আগে-পিছু লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইত, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের জন্য একটা করিয়া আলাদা সুর সে ঠিক করিয়া দিত, অবশ্য, সব চেয়ে ভাল সুরটি নিজের জন্যই রাখিয়া দিত। একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার ছিল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যাপারের চরিত্র অনুযায়ী সে স্বতন্ত্র করিয়াই সুর তৈয়ারী করিত এবং একটার সঙ্গে অন্যটার কিছুতেই গোঁজামিল হইতে দিত না। সেদিকে তাহার কড়া নজর ছিল। অবশ্য, সাধারণ লোকের কাছে, সব সুরই প্রায় এক রকমের বোধ হইত, সে ছাড়া আর কেহই এই সব বিভিন্ন সুরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল, তাহা ধরিতে পারিত না।

একদিন ঠাকুরদার বাড়ীতে ঘরের ভিতর সে সশব্দে পদচারণা করিতেছিল; মাথা উঁচু করিয়া বুক সোজা রাখিয়া, পায়ের শব্দে তাল দিয়া সেই ছোট্ট ঘরটির ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা নূতন সুর তৈয়ারী করিতেছিল। কতবার যে সেইভাবে ঘুরপাক খাইল, তাহার কোন হিসাবই ছিল না, এতটুকুও তাহার ক্লান্তিবোধ ছিল না। বৃদ্ধ তখন আয়নার সামনে দাঁড়ি কামাইতেছিল। হঠাৎ একগাল সাবান লইয়া মুখ ফিরিয়া বালকের দিকে চাহিয়া দেখে এবং সুর-রচনার মাঝখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ওঠে: 'এ কি সুর তুই গাইছিস?'

জাঁ-ক্রিস্তফ বলে: 'কি সুর? তা তো জানি না।'

বৃদ্ধ বলিয়া ওঠে : 'আবার গা দেখি!'

জঁা-ক্রিস্‌তফ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই আর মনে করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার সংগীত যে বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, সেই গর্বে বালক বৃদ্ধের মুখ হইতে তাহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার তারিফ আদায় করিতে ব্যস্ত হইয়া ওঠে এবং তাহার কণ্ঠস্বর যে কত মিষ্ট তাহার প্রমাণ স্বরূপ পুরানো অপেরার একটা গান গাহিয়া বৃদ্ধকে শোনায়। কিন্তু বৃধ তো তাহা শুনিতে চায় নাই। যে-সুর লইয়া সে খেলা করিতেছিল, বৃদ্ধ যে কেন তাহাকে আবার তাহাই গাহিতে বলিল, তাহা জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিতে পারিল না। আপনার মনে যে কি সুর সে সৃষ্টি করিয়া চালিয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানিত না। বৃদ্ধ তাহাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না, যেন তাহাকে আর লক্ষ্যই করিতেছে না, এমন ভাবে পাশের ঘরে চলিয়া আসিল কিন্তু চলিয়া আসিবার সময় দরজাটি ঈষৎ-মুক্ত করিয়াই রাখিয়া গেল, যাহাতে বালক যখন আপনার মনে খেলা করিতে করিতে গান গাহিবে, তখন যেন সে তাহা শুনিতে পায়।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, একদিন জাঁ-ক্রিস্‌তফ ঘরের সমস্ত চেয়ার টানিয়া আনিয়া অর্কেষ্ট্রার বাদকদের বসিবার মত করিয়া সাজাইল। এক নূতন সুরের খেলা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। থিয়েটর হইতে যেসব সংগীত সে শুনিয়াছিল, তাহার টুকরা টুকরা অংশ লইয়া নিজের মতন করিয়া জুড়িয়া একটা সংগীত সে রচনা করিয়াছে। সংগীত-পরিচালকদের যেমন পদক্ষেপ করিতে, মাথা নাড়াইতে দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে পদক্ষেপ করিয়া, মাথা দোলাইয়া, সে নিজের সংগীত নিজেই পরিচালনা করিয়া চলে। সামনের দেয়ালে বিঠোফেনের একটা ছবি ছিল। নতমস্তকে বিঠোফেনকে উদ্দেশ করিয়াই সে শেষ-অংশ গাহিয়া ওঠে। পরিচালনা শেষ করিয়া নাচিতে নাচিতে পিছন ফিরিতেই দেখে, ঠাকুরদা ঈষৎ-মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল, বৃদ্ধ বুঝি তাহার কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছে, লজ্জায় সে কাঠ হইয়া যায়। ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া কাঁচে মুখ রাখিয়া বাহিরে চাহিয়া থাকে, যেন বাহিরে বিশেষ কোন দৃশ্য সে একমনে দেখিতেছে। বৃদ্ধ কিন্তু কোন কথাই বলিল না, ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিল বৃদ্ধ সন্তুষ্টই হইয়াছে। বৃদ্ধের আদরে

সে গর্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; স্পষ্ট বুঝিল, বৃদ্ধ তাহার কৃতিত্বকে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া পাইল না, ঠিক কোন্ বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব বৃদ্ধকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নাট্য-প্রতিভা না সংগীত-রচনা, কণ্ঠ-সংগীত না নৃত্য!

এক সপ্তাহ পরে, এই ঘটনার স্মৃতি যখন বালকের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন একদিন বৃদ্ধ রহস্যজনকভাবে তাহাকে জানাইল, একটা জিনিস আজ তাহাকে দেখাইবে। ডেস্ক খুলিয়া একটা হাতে-লেখা সংগীত-লিপির বই বাহির করিয়া পিয়ানোর ষ্টাণ্ডের উপর খুলিয়া ধরিল। সেই স্বরলিপি দেখিয়া জাঁ-ক্রিস্-তফকে বাজাইতে বলিল। জাঁ-ক্রিস্তফের কৌতূহল জাগিয়া উঠিল এবং চেষ্টা করিয়া মোটামুটি একরকম ঠিক বাজাইল। স্বরলিপির বইটি হাতে লেখা এবং বৃদ্ধের নিজের হাতের লেখা, অতি যত্নে গোটা গোটা করিয়া লেখা। জাঁ-ক্রিস্তফ যখন বাজাইতেছিল, বৃদ্ধ পাশে বসিয়া একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া দিতেছিল। বাজনা শেষ হইয়া গেলে, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল : 'বল তো দাদু, কি বাজালে?'

জাঁ-ক্রিস্তফ পিয়ানোর পর্দায় এমন তন্ময় হইয়া ছিল যে, কি বাজাইতেছে তাহার কোন ধারণাই তাহার ছিল না। ঠাকুরদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল : 'তা তো জানি না!'

'ভেবে বল্!...সত্যি জানিস্ না, কি বাজালি তুই?'

জাঁ-ক্রিস্তফ নিজের মনের ভিতর চাহিয়া দেখে। হাঁ...হাঁ... অস্পষ্ট যেন মনে পড়িতেছে...কোথায় যেন এই সুর শুনিয়াছে...কিন্তু কোথায় শুনিয়াছে, তাহা ঠিক ধরিতে পারে না। বৃদ্ধ হাসিয়া ওঠে।

'আবার ভেবে দেখ্!'

জাঁ-ক্রিস্তফ ঘাড় নাড়িয়া জানায় : 'না, জানি না!'

কিন্তু না বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের ভিতর কি যেন একটা কথা মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে...এই সুর...এই সুর যেন... না, না, সেকথা ভাবিতে তাহার সাহসে কুলায় না...'জানি না, দাদু!'

স্নেহজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ মৃদু ভর্ৎসনায় বলে : 'হাঁরে মুখ্যু, নিজের তৈরী জিনিস, নিজে চিনতে পারলি নে?'

মনের মধ্যে এই কথাই তাহার জাগিয়া উঠিয়াছিল...সাহস করিয়া বলিতে পারে না...ঠাকুরদার মুখে শুনিয়া তাহার বুক সজোরে কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দের আবেগে চিৎকার করিয়া উঠিল : 'দাদু, দাদু গো!'

বৃদ্ধের মুখ আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। বইটি তুলিয়া লইয়া একটি একটি করিয়া লাইন বালককে দেখায়। বালক আপনার অজ্ঞাতে কিশোর মনের খেলায় যেসব সুর সৃষ্টি করিয়াছিল, বৃদ্ধ সংগোপনে তাহার স্বরলিপি করিয়া প্রথামত তাহাকে সাজাইয়া একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীতের রূপ দিয়াছে।

'এই দেখ্ প্রস্তাবনা...মঙ্গলবার ঘরের মেঝেতে শুয়ে তুই যে সুর গাইছিলি...তারপর, এটা হলো মার্চ...গত সপ্তাহে মনে আছে, আমি যখন দাঁড়ি কামাচ্ছিলাম, তোকে আবার গাইতে বললাম, কিন্তু তুই মনে ক'রে আর গাইতে পারলি না? আর এইটে হলো, তার মিনুয়ে... সেদিন বিঠোফেনের ছবির সামনে নেচে নেচে যা গাইছিলি!'

বইটির প্রচ্ছদ-পত্রে এই রচনার যে নামকরণ বৃদ্ধ করিয়াছিল, বড় বড় গথিক অক্ষরে তাহা লেখা রহিয়াছে :

'শৈশবের সুখ-স্মৃতি : আরিয়া, মিনুয়েতো, ভাল্‌সি এবং মার্সিয়া, অপেরা নং ১, জাঁ-ক্রিস্‌তফ ক্রাফ্‌ট কর্তৃক রচিত।'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিমুগ্ধ বিহ্বল হইয়া যায়। এত বড় একটা বই... এমন সুন্দর নাম...তাহারই নিজের সৃষ্টি...চোখের সামনে বড় বড় অক্ষরে তাহারই নাম...কোন কথা সে বলিতে পারে না। শুধু সঙ্গীতের মত গুঞ্জন করিয়া চলে : 'দাদু, দাদু, দাদু গো!'

বৃদ্ধ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লয়। বৃদ্ধের জানুর উপর বসিয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফ তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দের আতিশয্যে আরক্তিম কাঁপিতে থাকে। তাহার অধিক আনন্দ বৃদ্ধের সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন আপ্লুত করিয়া ফেলে। বৃদ্ধ নিজেকে যেন আর সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাই উদাসীন থাকিবার প্রাণপণ চেষ্টায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে : 'অবশ্য গানটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে হার্মনি আর বাজনার অংশ আমি যোগ করেছি...আর,' বৃদ্ধ দু'একবার কাশিয়া লইয়া নিজেকে সম্বরণ করিয়া লয় : 'আর... মিনুয়ে-র সঙ্গে একটা ত্রিয়ো জুড়ে দিতে হয়েছে...মানে...ওটা...এমনি দিতে হয়...রেওয়াজ...তবু,...হাঁ, বলতে হবে বৈ কি, আসলে চমৎকার জিনিসই হয়েছে!'

বৃদ্ধ বেহালা নিজে বাজাইতে সুরু করিল। জাঁ-ক্রিস্‌তফ পিয়ানোতে অনুসরণ করিয়া চলিল।

'কিন্তু দাদু, ও-তে তোমারও নাম নিশ্চয়ই দিতে হবে!'

বৃদ্ধের কণ্ঠ অশ্রু-রুদ্ধ হইয়া আসে। বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলে : 'তার কোন প্রয়োজন নেই দাদু...তুই ছাড়া জগতের আর কারুর এ বিষয়ে জানবার কোন প্রয়োজন নেই...শুধু...'

বৃদ্ধের কণ্ঠ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে: 'শুধু...একদিন...যখন আর আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না...তখন এই রচনা হয়ত' তোকে মনে করিয়ে দেবে, তোর একজন দাদু ছিল...তাই না? বল্, তুই তাকে কোনদিন ভুলে যাবি না?'

বঞ্চিত-ভাগ্য সেই বৃদ্ধ বুঝিয়াছিল যে তাহার পৌত্রের এই প্রতিভার দান তাহার জীবনকে ছাড়াইয়া অনাগত কালেও বাঁচিয়া থাকিবে। তাহার নিজের কোন রচনাই সে-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। তাই পৌত্রের এই রচনার মধ্যে নিজের রচনার অংশকে জুড়িয়া দিয়া রাখিতে যে সহজ সুখ স্বভাবতই জাগে, তাহা ছাড়াও বৃদ্ধের অন্তরে এক সকরুণ দুরাশা সংগোপনে বৃদ্ধকে এই কার্যে প্রণোদিত করে। একদা এই রচনা পৌত্রকে যে-যশ আনিয়া দিবে, তাহার মধ্যে নামহীন তাহার সামান্য দানও লুকাইয়া থাকিবে এবং এই ভাবে তাহার অন্তরের একটা সামান্য টুকরাও অনাগত কালের মধ্যে, সংগোপনে হইলেও, বাঁচিয়া থাকিবে। নাই বা থাকিল তাহার নাম, তবুও জানিয়া গেল, তাহার সব-টুকুই চিরান্ধকারে হারাইয়া যাইবে না।

বৃদ্ধের সেই সংগোপন সকরুণ বাসনার কথা জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝিতে পারে। চুম্বনে চুম্বনে বৃদ্ধকে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। বৃদ্ধও তাহার মস্তক মুখের কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বনের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলে : 'তাই দাদু, এ বুড়োকে ভুলিস নি! একদিন যখন তুই একজন খুব বড় সঙ্গীত-স্রষ্টা হবি, তোর কৃতিত্বে তোর বংশ উজ্জ্বল হবে, তোর কৃতিত্বে এই শিল্প আরো মহীয়ান হ'য়ে উঠবে, দেশে বিদেশে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে, তখন মনে রাখিস ভাই, তোর এই বুড়ো ঠাকুরদাই সর্বপ্রথম তোর সেই প্রতিভাকে স্বীকার করেছিল, একদিন তুই যা হবি, এই বুড়োই সর্বপ্রথম তার ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গেল!'

বৃদ্ধের দুই চোখ অশ্রু-সজল হইয়া ওঠে, এত চেষ্টা করিয়াও এই অশ্রু-দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তবু বৃদ্ধ কিছুতেই এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। হঠাৎ যেন কাসির বেগ সুরু হয়, কাসিতে কাসিতে আবার গম্ভীর হইয়া যায়। বালককে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। অমূল্য পাণ্ডুলিপিখান বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ বিদায় লয়।

আনন্দে বিহ্বল হইয়া জাঁ-ক্রিসতফ বাড়ী ফেরে। মনে হয়, পথের পাথরগুলি যেন তাহাকে ঘিরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যে অভিনন্দন পাইল, তাহাতে এই বিহ্বলতার সুর মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যখন নিজের কৃতিত্বের কথা জ্ঞাপন করিল, কেহই তাহাতে আনন্দিত হইল না, বরঞ্চ ভর্ৎসনা করিয়া উঠিল। লুইসা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, অবিশ্বাসের হাসি। মেলশিয়র রাগিয়া উঠিয়া জানাইল, বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, এই ভাবে ছেলেটির মাথা চিবাইয়া না খাইয়া তিনি যদি নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। এবং সেই সঙ্গে জাঁ-ক্রিস্‌তফকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল, মাথা হইতে ঐ সব বাজে অপদার্থ কল্পনা দূর করিয়া দিয়া, অবিলম্বে চারঘণ্টা ধরিয়া পিয়ানোতে যথারীতি তাহাকে গৎ সাধিতে হইবে। কি করিয়া যথানিয়ম বাজাইতে পারা যায়, আগে তাহা ভাল করিয়া শিখিতে হইবে; এখন হইতে সংগীত-রচনা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই, পরে জীবনে যখন তেমন আর কিছু করিবার থাকিবে না, তখন সংগীত-রচনার যথেষ্ট অবকাশ মিলিবে!

মেলশিয়রের এই জাতীয় বিজ্ঞ উক্তি হইতে অবশ্য, একথা মনে করা ঠিক হইবে না যে, মেলশিয়র পুত্রকে এই অস্বাভাবিক অল্প-বয়সী গর্বের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়াও অন্য একটা ব্যাপার ছিল। মেলশিয়রের মনে কোনদিন এমন কোন ভাবের উদয় হয় নাই, যাহাকে সংগীতে সে রূপান্তরিত করিতে পারিত, কিম্বা অন্তরের ভাবনাকে সংগীতে রূপান্তরিত করিতে হইলে, মনের পিছনে যে দুর্বার তাগিদ থাকে, তাহাও কোনদিন সে নিজের জীবনে অনুভব করে নাই। তাই সংগীত-রচনার ব্যাপারকে সে কোনদিনই প্রথমশ্রেণীর শিল্পকার্যের মর্যাদা দিতে পারে নাই। তাহার নিকট সংগীত-রচয়িতার অপেক্ষা গায়ক বা বাদকেরই বেশী মূল্য ছিল। অবশ্য হাস্‌লারের মত সংগীত-রচয়িতা লোকের নিকট হইতে যে বিপুল অভিনন্দন পাইতেন, তাহা যে সে বুঝিত না, তাহা নহে। তবে সে তাহার অন্য ব্যাখ্যা করিত। জয়ী হওয়ার একটা সার্থকতা আছে, সে সেইটি বুঝিত, কি উপায়ে সে-জয় অর্জিত হইল, তাহা সে ভাবিয়া দেখিত না। এবং যখনই হাস্‌লারের মত সংগীত-রচয়িতাকে লোকে জয়োল্লাসে অভিনন্দিত করিত, মেলশিয়রের মনে হইত, বাদক হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে চুরি করিয়াই তাঁহারা সেই যশ ভোগ করিতে-

ছেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছিল, বাদক হিসাবে কৃতিত্বেরও কম মূল্য নাই, বরঞ্চ সে-কৃতিত্ব তাহার নিকট আরো বেশী লোভনীয় ও গৌরবজনক বোধ হইত। যেসব বিখ্যাত সংগীত-রচয়িতার নামে লোকে উল্লসিত হইয়া উঠিত, মেলশিয়র তাঁহাদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের চরিত্র এবং বুদ্ধি-বৃত্তি সম্বন্ধে নানারকমের আষাঢ়ে গল্প সানন্দে প্রচার করিয়া তাঁহাদের ছোট করিতে একটা বিশেষ সুখ পাইত। তাহার বিবেচনায় আর্টের ক্ষেত্রে বাদক আর গায়কই হইল সর্বপ্রথম স্তরের জীব। তাহার প্রমাণস্বরূপ সে বলিত, কে না জানে আমাদের দেহের মধ্যে আর্টের দিক হইতে জিহ্বাই সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ কিন্তু শব্দ ছাড়া চিন্তার অস্তিত্ব কোথায়? বাদক আর গায়ক যদি না থাকিত, তাহা হইলে সংগীত থাকিত কোথায়?

জাঁ-ক্রিস্তফকে ভর্ৎসনা করিবার কারণ যাহাই থাকুক না কেন, মেলশিয়রের ভর্ৎসনা বালকের কিঞ্চিৎ উপকারই করিল। ঠাকুরদার প্রশংসায় তাহার মধ্যে যে উদ্বেল-ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, মেলশিয়রের ভর্ৎসনায় তাহা সংকুচিত হইয়া স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসিল। সে অবশ্য ভাল করিয়া জানিত যে, তাহার পিতার অপেক্ষা তাঁহার ঠাকুরদার বুদ্ধিবৃত্তি ঢের বেশী প্রখর। তবুও পিতার ভর্ৎসনায় সে যে পিয়ানোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত সাধিবার জন্য নিজেকে টানিয়া বসাইল, তাহার পিছনে পিতৃ-বাক্যের প্রতি বিশ্বাস আদৌ ছিল না। সে জানিত, এই পিয়ানোর সামনে বসিয়া পর্দায় যখন আঙগুল চালাইত, তখন নির্বিবাদে সে আপনার মনে স্বপ্ন রচনা করিবারই অবকাশ পাইত। সেই স্বপ্ন-সুখই তাহাকে যন্ত্রের নিকট টানিয়া আনিল। যখন পর্দায় আঙগুল দিয়া বারবার করিয়া একই গৎ বাজাইতে হইত, তখন তাহার ভিতর হইতে গর্বোৎফুল্ল কণ্ঠে কে যেন বলিয়া চলিত: 'আমি সুর-স্রষ্টা...আমি সত্যিকারের একজন সুর-স্রষ্টা!'

যেদিন ঠাকুরদার নিকট হইতে সে নিজের সংগীত-রচনা-ক্ষমতার সন্ধান পাইল, সেইদিন হইতেই সে সেই সাধনায় নিজেকে ব্রতী করিল। বর্ণমালা লিখিতে শেখার আগেই সে স্বরলিপির সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বাড়ীর হিসাবের খাতা হইতে পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া সে সংগোপনে তাহাতে সেই সব বিচিত্র সঙ্কেতের চিত্র আঁকিয়া চলে। কিন্তু সেই সব সঙ্কেতের চিহ্ন দিয়া যখনই কোন মনের ভাবনাকে লিখিতে চেষ্টা করে, দেখে কোন ভাবনাই তাহাতে ফুটাইয়া

তুলিতে পারিতেছে না। শুধু কতকগুলি চিহ্ন কাগজে পড়িয়া থাকে। জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিপন্ন বোধ করে, কিন্তু হতাশ হয় না; জন্মসূত্রে-লব্ধ সৃজনী-প্রতিভার প্রেরণায় সে নিজের মতন করিয়া নানাভাবে সেই সব সঙ্কেত চিহ্নকে সাজাইয়া চলে, তাহার মধ্যে কোন সঙ্গীতের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে কি না, তাহা লইয়া সে নিজেকে বিব্রত করিতে চায় না। তারপর, সংগোপনে সেই কাগজগুলি লইয়া শুধু ঠাকুরদাকে দেখায়। ঠাকুরদার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে, অবশ্য বার্ধক্যের দরুণ তখন স্বভাবতই তাঁহার চোখ ভিজিয়া থাকিত। বালক-স্রষ্টাকে তিনি অকপটে উৎসাহিত করেন: 'সত্যিই, অপূর্ব হয়েছে রে!'

অবশ্য, এই জাতীয় প্রশংসা তাহার মতন বালকের মাথা বিগড়াইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা সাধারণ বুদ্ধির রাশটান ছিল যে, উহা বালকের কোন ক্ষতিই করিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, এই সময় বালক এমন আর একজন লোকের প্রভাবে আসিয়া পড়িল, যাহার মধ্যে কোন আতিশয্যের বালাই ছিল না, কাহারও উপর আধিপত্য করিবারও কোন বাসনা যাহার ছিল না, এবং যে ব্যক্তি সর্বদাই এই পৃথিবীকে সাধারণ বুদ্ধির স্থির চোখে দেখিত। সে ব্যক্তি হইল, লুইসার ভাই। গতেফ্রেদ।

লুইসার মতনই তাহারও গড়ন পাতলা, ছোটখাটো ছিল। তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না, তাহার বয়স ঠিক কত। আসলে তাহার বয়স চল্লিশের উপর হইবে না, কিন্তু দেখাইত যেন পঞ্চাশেরও বেশী। ছোট্ট রেখাঙ্কিত মুখ, গায়ের রঙ ম্লান গোলাপী, দুটি সকরুণ নীল চোখ, যেন দুটি বিশুদ্ধ ফরগেট্‌-মি-নট্‌ ফুল। পাছে হঠাৎ কোন এক ফাঁকে ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়, সেই ভয়ে ভদ্রলোক সর্বদাই মাথায় টুপি ব্যবহার করিত। টুপি খুলিলেই, চোখে পড়ে, মোচার খোলার মতন একখণ্ড গোলাপী টাক্—জাঁ-ক্রিস্‌তফ আর তাহার ভাইদের এই টাকটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যখনই সুযোগ জুটিত, তখনই তাহারা এই টাকের ব্যাপার লইয়া ভদ্রলোককে উদব্যস্ত করিয়া তুলিত, চুলগুলি কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল, তাহার হদিশ জানিবার জন্য ভদ্রলোককে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিত। মেলশিয়রও এই বিষয় লইয়া সর্বদাই রসিকতা করিত, ছেলেরা তাহাতে আরো উৎসাহিত হইয়া উঠিত। ভদ্রলোক কিন্তু হাসিয়াই তাহাদের এইসব আক্রমণকে গ্রহণ করিত, বিন্দুমাত্র ধৈর্য হারাইত না। ভদ্রলোক জীবিকা-অর্জনের জন্য

ফেরিওয়ালার বৃত্তি লইয়াছিল। পিঠে এক বৃহৎ বোঝা লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই বোঁচকায় পাওয়া যাইত না হেন জিনিসই ছিল না, মুদিখানার সওদা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাতে যাবতীয় স্টেশনারী দ্রব্য, কেক্, বিস্কুট, রুমাল, জুতা, চাটনী, দেয়াল-পাঁজি, গানের বই, এমন কি ঔষধও থাকিত। দু'একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, পায়ে হাঁটিয়া ফেরি না করিয়া, ছোটখাট একটা দোকান-ঘর লইয়া যাহাতে ভদ্রলোক বসিয়া কেনাবেচা করিতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের ধাতে তাহা সহিত না। হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা বোঁচকা গুছাইয়া লইয়া আবার বাহির হইয়া পড়িত। দোকানের দরজায় তালা লাগাইয়া চাবিটা দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরে ফেলিয়া দিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তাহার আর দর্শন মিলিত না। তারপর হঠাৎ একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ফিরিয়া আসিত। দরজার সামনে দাঁড়াইয়া খানিকটা যেন ইতস্তত করিত, তারপর মাথা হইতে টুপি খুলিয়া দরজার ফাঁক দিয়া টাক-ওয়ালা মাথাটা আগাইয়া দিয়া শান্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিত: 'গুড্-ইভনিং এভরিবডি!' তারপর পায়ের জুতার ধূলা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিত, ছোট-বড় প্রত্যেককে সমান সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন জানাইত, ধীরপদক্ষেপে ঘরের একেবারে এক কোণে চুপটি করিয়া গিয়া বসিত। ধীরে পাইপটি জ্বালাইয়া লইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চেয়ারে নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, জানিত অবিলম্বেই প্রশ্নের ঝড় উদব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অসীম ধৈর্যে সে-ঝড়কে কাটাইয়া উঠিতে হইত। জাঁ-ক্রিস্তফের বাবা, ঠাকুরদা, দুই-জনেই ভদ্রলোকটিকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তাহা লুকাইতেও তাঁহারা চেষ্টা করিতেন না। তাঁহাদের নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে একজন যে ফেরিওয়ালা, একথা ভাবিতেই তাঁহাদের আত্মসম্মানে কঠিন আঘাত লাগিত। এবং সে-কথা স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে তাঁহারা কোন ত্রুটি করিতেন না, কিন্তু এই অবজ্ঞা সে গায়েই মাখিত না। পরিবর্তে, তাঁহাদের দুইজনকেই এমন গভীর শ্রদ্ধা সে নিবেদন করিত যে, মেলশিয়র না হোক্, বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল তাহাতে একে-বারে নিরস্ত্র হইয়া পড়িত। বৃদ্ধকে যে শ্রদ্ধা করিত, তাহার যত দোষই থাকুক, বৃদ্ধ তাহার উপর বিরূপ হইতে পারিত না। কিন্তু মাঝে মাঝে পিতা-পুত্রে ভদ্রলোককে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রূপ বাণে এমন

ভাবে বিদ্ধ করিত যে, লুইসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিত। ক্রাফ্‌টদের বংশ-গত বিদ্যা-বুদ্ধির আভিজাত্যের কাছে লুইসা বিনা প্রশ্নে অবনত-মস্তকে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাই স্বামী বা শ্বশুরের উক্তিকে সে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লইত, কিন্তু নিজের ভাইকেও অস্বীকার করিতে পারিত না। ভাইয়ের প্রতি একটা সহজাত গভীর ভালবাসা ছিল এবং লুইসা জানিত যে, তাহার ভাইও নীরবে তাহাকে কতখানি ভালবাসিত। তাহাদের বংশের মধ্যে তাহারা এই দুই ভাই-বোনই শুধু বাঁচিয়াছিল, দুইজনই সমান ভাগ্যহত, দীন, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত। তাহাদের দুইজনের ভাগ্যে সেই একই ব্যর্থতা নিঃশব্দে সংগোপনে তাহাদের অন্তরকে এক সকরুণ প্রেমে এক করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ক্রাফ্‌টদের বলিষ্ঠ আনন্দ আর কোলাহলমুখর প্রাণ-দীপ্ত সতেজ আত্মগর্বিত জীবনের পাশে, এই দুটি ক্ষীণ, দুর্বল, ভীরু প্রাণীকে অত্যন্ত বেমানান দেখাইত, মনে হইত যেন তাহাদের জীবনের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্কই নাই। ভাই-বোনে তাহা জানিত ও বুঝিত কিন্তু তাহা লইয়া কোনদিন নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনাই করিত না।

শৈশবের স্বাভাবিক নিষ্ঠুর বিচারহীনতায় জাঁ-ক্রিস্‌তফও ফেরিওয়ালা মাতুল সম্পর্কে তাহার পিতা আর পিতামহের অনুরূপ মনোভাবই পোষণ করিত। তাহাকে লইয়া নিষ্ঠুর কৌতুক করিত, সার্কাসের ক্লাউনের মতন তাহাকে দেখিত ; অকারণে মূঢ়ের মতন উত্যক্ত করিয়া চলিত, কিন্তু অসীম ধৈর্যে সে তাহা সহ্য করিত। কিন্তু তবু, জাঁ-ক্রিস্‌তফ তাহাকে ভালবাসিত, কেন যে বাসিত তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখিত না। হয়ত শিশু-সুলভ চপলতায় এই লোকটিকে লইয়া সে তাহার নিজের খুশিমত খেলা করিতে পারে, তাই তাহাকে সে ভালবাসে। তাহা ছাড়া, আর একটি কারণও ছিল, এই লোকটির নিকট জাঁ-ক্রিস্‌তফ প্রায়ই কিছু না কিছু উপহার পাইত, সামান্য একটা খেলনা, একটা ছবি, নানারকমের ছোটখাট মন-ভোলান জিনিস। তাই বহুদিন অদর্শনের পর যখন সে দেখা দিত, শিশুদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত, এবার তাহাদের জন্য কি উপহার লইয়া আসিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহলের অবধি থাকিত না। গরীব হইলেও, প্রত্যেক শিশুর জন্য একটা না একটা কিছু সে লইয়া আসিত; তাহাদের সংসারের কাহার কবে জন্মদিন, সে তাহা ঠিক মনে করিয়া রাখিত। এবং যেখানেই

ঘুরিয়া বেড়াক না কেন, ঠিক জন্মদিনের উৎসবে আসিয়া হাজির হইত এবং ভালবাসিয়া বাছিয়া গুছিয়া চমৎকার একটা উপহার সংগ্রহ করিয়া আনিত। এই উপহার-পাওয়া তাহাদের কাছে এমন স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তাহার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার কথা পর্যন্ত তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ সারাদিনের উৎপাতের পর রাত্রিতে যখন বিছানায় গিয়া শুইত, সাধারণত তাহার ভাল ঘুম হইত না, সারাদিন যাহা ঘটিয়াছে মনের মধ্যে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত, তখন এই মাতুলের কথা বিশেষ করিয়া তাহার মনে জাগিত, বুঝিত কত স্নেহশীল এই লোকটি, এক অপূর্ব কৃতজ্ঞতার বন্যায় তখন তাহার অন্তর উচ্ছল হইয়া উঠিত। কিন্তু পরের দিন দিনের আলোয় সেকথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না, লজ্জা করিত, মনে হইত যেন লোকে হাসা-হাসি করিবে। তাহা ছাড়া, তাহার শিশু-চেতনায় এই সহৃদয়তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিত না। শিশুর ভাষায়, ভালমানুষ আর বোকা, প্রায়ই একার্থবোধক হইয়া থাকে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ জাঁ-ক্রিস্তফ চোখের সামনে তাহার মাতুল গতেফ্রেদের ব্যাপারেই যেন দেখিতে পায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, মেলশিয়র বাড়ীতে ছিল না, লুইসা ছেলেদের ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত, গতেফ্রেদ একা বাইরের ঘরে বসিয়াছিল। নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, সামনেই কয়েক গজ দূরে নদীর ধারে গিয়া বসিল। জাঁ-ক্রিস্তফ তাহাকে অনুসরণ করিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিশু-সুলভ দুষ্টামিতে তাহাকে উদব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া সামনের ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। উপুড় হইয়া শুইয়া ঘন ঘাসের মধ্যে নাক ডুবাইয়া দিল। দুষ্টামি করিতে করিতে তাহার দম ফুরাইয়া আসিয়াছিল। খানিকটা বিশ্রামের পর নূতন কোন দুষ্টামির ফিকিরে আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি বলিয়া মামাকে ক্ষেপানো যায়! ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার সন্ধান পাইল, তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল ও ঘাসে মুখ গুঁজিয়া নিজেই হাসিয়া অস্থির হইল। কিন্তু তাহার পরিহাসের কোন জবাবই পাইল না। হঠাৎ মামা কেন নীরব হইয়া গেল, তাহা দেখিবার জন্য মুখ তুলিয়া চাহিয়া পরিহাসের কথাটি আবার উচ্চারণ করিল। দেখিল অস্তসূর্যের শেষরশ্মির আভায় গতেফ্রেদের মুখ যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই মুখের দিকে চাহিতেই তাহার মুখের কথা যেন সে নিজেই গিলিয়া

লইল। অর্ধনিমীলিত চোখে গতেফ্রেদ হাসিয়া উঠিল, ম্লান মুখে কি এক অবর্ণনীয় বিষাদ আর বেদনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। জাঁ-ক্রিস্তফ দুই হাত দিয়া দুই গাল চাপিয়া ধরিয়া নীরবে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ক্রমশ রাত্রির ছায়া ঘন হইয়া ওঠে। অন্ধকারে গতেফ্রেদের মুখের রেখা হারাইয়া যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। গতেফ্রেদের মুখের সেই রহস্যঘন ছায়া যেন আপনা হইতে জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তরে আসিয়া প্রতিফলিত হয়। একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন-মোহ যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ধরণী অন্ধকারে ভরা, উপরে আকাশ আলোময়। নক্ষত্রের দল চাহিয়া আছে পৃথিবীর দিকে। পায়ের কাছে তট-ভূমিতে ওঠে নদীর জল-মর্মর। তন্দ্রা ছাইয়া আসে বালকের চোখে! কাছেই ঝিঁঝিঁ ডাকে। মনে হয় যেন সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়িবে।

সহসা, সেই নীরব অন্ধকারে, গতেফ্রেদ গান গাহিয়া উঠিল। ক্ষীণ, চাপা গলায়, যেন নিজেকেই নিজে গান শোনাইতেছে, কুড়ি গজ দূরে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না! কিন্তু সেই ক্ষীণ কণ্ঠে ছিল প্রাণ, ছিল আবেগ, ছিল সরলতা। তাহার অন্তরের ভাবনাই যেন গানের রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; স্বচ্ছ জলের মতন, সেই গানের ভিতর দিয়া তাহার অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত দেখা যায়। জীবনে আর কোন দিন জাঁ-ক্রিস্তফ সেইরকমভাবে কাউকে গাহিতে শোনে নাই, সেরকম গানও আর কোনদিন সে শোনে নাই। কোন তাড়াহুড়া নাই, ধীর, স্থির, শিশুর মতন শান্তগতি, অথচ সুগম্ভীর, মাঝে মাঝে থামিয়া যায়, আপনার খেয়ালে অনেকক্ষণ থামিয়া থাকে, আবার চলিতে আরম্ভ করে, কোথায় চলিয়াছে তাহার কোন স্থিরতা নাই, কোথায় পেঁৗছিল তাহা জানিবারও যেন কোন তাগিদ নাই, ক্রমশ সে-গানের সুর চলিতে চলিতে হারাইয়া যায় রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে, স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে। জাঁ-ক্রিস্-তফের মনে হয় যেন বহু...বহু দূর হইতে এই সুর যাত্রা সুরু করিয়াছে, কতদূরে যাইবে কে জানে? অতি শান্ত-গতি, বেদনায় মন্থর, তাহার আড়ালে যেন স্বব্ধ হইয়া আছে, যুগ-যুগান্তের ক্রন্দন। জাঁ-ক্রিস্তফ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া থাকে, বিন্দুমাত্র নড়িতে পর্যন্ত পারে না, রুদ্ধ আবেগে প্রস্তর-হিম হইয়া আসে। গান শেষ হইয়া গেলে, হামাগুঁড়ি দিয়া গতেফ্রেদের পায়ের কাছে আসিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে: 'মামা!'

গতেফ্রেদ কোন উত্তর দেয় না। উঠিয়া বসিয়া গতেফ্রেদের হাঁটুর উপর হাত আর থুতনি রাখিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ আবার ডাকে: 'মামা!'

স্নিগ্ধকণ্ঠে এবার গতেফ্রেদ উত্তর দেয়: 'কি রে?'

'কি গাইলে? বল আমাকে, কি গাইছিলে?'

'তা তো জানি না!'

'বলবে না? বল...'

'সত্যি, জানি না। এমনি একটা গান...'

'তোমার তৈরী গান?'

'আরে, না, না! কি সর্বনাশ!...একটা পুরানো গান...'

'কার তৈরী?'

'তা কেউ জানে না...'

'কোন্ সময়কার?'

'তাও কেউ জানে না!'

'যখন তুমি খুব ছোট ছিলে...সেই সময়কার?'

'না, আমার জন্মাবার আগের...আমার বাবার জন্মের আগে. .বাবার বাবার জন্মেরও আগে...বহু বহু কাল আগে...চিরকাল ধরে আছে...'

'কি আশ্চর্য! এরকম হয়? কেউ তো আমাকে তা বলেনি!'

এক মিনিট কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল: 'মামা, তুমি এই রকম অন্য আর কোন গান জানো?'

'জানি!'

'দোহাই তোমার, গাও!'

'তার তো কোন দরকার নেই! আবার আর একটা গান গাইবো কেন? একটাই তো যথেষ্ট। গান না গাইলে যখন আর চলে না, তখনি গান গাইতে হয়। মনে যখন চায়, তখনই...নইলে, গান গাইতে হবে বলে, গান গাইতে নেই!'

'কিন্তু যখন গান রচনা করতে হয়...?'

'সেটা গান নয়!'

বালক পথ হারাইয়া ফেলে। ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বুঝাইবার জন্য কোন তাগিদও করে না। শুধু এইটুকু বুঝিতে পারে, সংগীত বলিয়া যাহা কিছু সে শুনিয়াছে, তাহা যেন আজিকার এই সংগীতের মতন নয়।

তবু জিজ্ঞাসা করে: 'মামা, তুমি কোন দিন তৈরী করেছ?'

'তৈরী? কি?'

'গান!'

'আমি কি ক'রে গান তৈরী করবো? গান যে তৈরী করা যায় না!'

বালকের যুক্তিতে বিভ্রম লাগে। একথা সে কি করিয়া স্বীকার করিয়া লইবে? তাই আবার জিজ্ঞাসা করে: 'কিন্তু, একদিন, কেউ না কেউ তো তৈরী করেছিল...'

গতেফ্রেদ তেমনি প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলে: 'না, তারা চিরকাল এমনি তৈরী হয়েই আছে...'

বালক কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবে না। তাই অন্যভাবে সেই প্রশ্নই করে: 'কিন্তু...অন্য কোন গান, অন্য কোন নতুন গান, কেউ কি আর তাহলে তৈরী করতে পারবে না?'

'কি দরকার তৈরী ক'রে? এই পৃথিবী-ভরা সব জিনিসের জন্যেই রয়েছে পর্যাপ্ত গান। দুঃখের দিনের গান আছে; সুখের দিনের গান আছে। ক্লান্তিতে যখন মন ছেয়ে আসে, তখনকার গানও আছে, বাড়ীর জন্যে যখন মন কেমন করে, তখনকারও গান আছে। গান আছে, যখন নিজেকে নিজেরই আর ভাল লাগে না, মনে হয় এই পৃথিবীতে শুধু একটা পোকার মতনই রয়ে গেলাম; গান আছে, যখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে সাধ যায়, যখন মানুষের কাছ থেকে তুমি পেলে না যা তোমার প্রাপ্য; আবার গান আছে, যখন আনন্দে ভরে যায় মন, সুন্দর লাগে পৃথিবীকে, সুন্দর লাগে সব কিছু এই পৃথিবীর...গান আছে, যখন চোখের সামনে হেসে ওঠে ভগবানের এই আকাশ, ভগবানের মতই বিরাট, তাঁরই মত স্নেহময়, দয়াময়...সব কিছুরই, সব কিছুরই আছে গান...তবে আবার কেন তৈরী করতে যাবো, বল্?'

জাঁ-ক্রিস্তফের মনে পড়ে ঠাকুরদার কথা, ঠাকুরদার দুরাকাঙ্ক্ষার কথা, উত্তর দিয়ে উঠে: 'কেন তৈরী করবো? গান তৈরী করবো, বড় হবো বলে...পৃথিবীর ইতিহাসে মস্ত বড় নাম করবো...'

গতেফ্রেদ হেসে ওঠে।

সে-হাসিতে জাঁ-ক্রিস্তফ আহত হয়, ক্ষুণ্ণ হয়। জিজ্ঞাসা করে: 'হাসলে যে?'

গতেফ্রেদ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে: 'ওঃ...না...না...আমি...আমি তো কেউ নই...কিছু নই!'

বালকের শিরশ্চুম্বন করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে: 'তুই বুঝি মস্ত বড়লোক হতে চাস্?'

গর্বিতকণ্ঠে বালক বলে: 'হাঁ!' ভাবে, তাহার এই স্পষ্ট উত্তরে গতেফ্রেদ খুশিই হইবে। কিন্তু গতেফ্রেদ বলে: 'কেন? কিসের জন্য?'

এ প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? জাঁ-ক্রিস্তফ বিব্রত হইয়া পড়ে। কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া উত্তর দেয়: 'ভাল ভাল সংগীত তৈরী করবার জন্যে!' গতেফ্রেদ আবার হাসিয়া ওঠে। বলে: 'তুই ভাল ভাল গান তৈরী করতে চাস্ বড় লোক হবি বলে; আবার বড় লোক হতে চাস্, ভাল ভাল গান তৈরী করতে পারবি বলে! ব্যাপারটা কি রকম হলো জানিস্? একটা কুকুর যেন তার নিজের ল্যাজকে ধরবার জন্যে ঘুর-পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে!'

জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে পরাজিত বোধ করে। গতেফ্রেদ যে তাহাকে এইভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, অন্য সময় হইলে জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুতেই সহ্য করিত না, এতকাল ধরিয়া তাহারই মুখের সামনে সে হাসিয়া আসিয়াছে। এবং তর্কে যে গতেফ্রেদের নিকট এইভাবে তাহাকে হার স্বীকার করিতে হইবে, একথা সে ভাবিয়া উঠিতেই পারে না। ইহার পূর্বে আর কোন দিনই সে তাহার মাতুলকে ততখানি বুদ্ধির অধিকারী ভাবে নাই। তাই ব্যর্থ-রোষে প্রতি-আক্রমণের জন্য মনের মধ্যে একটা উপযুক্ত উত্তরের সন্ধান করিয়া বেড়ায়, অন্তত কোন একটা বিদ্রূপও যদি লাগসই পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই মিলিল না। গতেফ্রেদ বলিয়া চলিল: 'এখানে থেকে কব্লেন্ৎজ্ যত দূর, যদি ততটাই বড় হস্, তবুও একটা গানও তৈরী করতে পারবি না!'

জাঁ-ক্রিস্তফের পক্ষে এতটা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল: 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবো! আমি বলছি, আমি পারবো!'

'যত জোর করবি, তত কম পারবি। গান তৈরী করতে হলে, ঐ, ঐ যে সব প্রাণী অন্ধকারে ডাকছে, ওদের মতন হতে হবে...শোন্ মন দিয়ে...'

মাঠের ওপারে আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে, পরিপূর্ণ আলো-ঝলমল। মাটির উপরে চারিদিকে, চিকন জল-ধারার উপরে ম্লান কুয়াশা চাঁদের আলোয় রুপালী হইয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও নদী-তটে ব্যাঙেরা ডাকিয়া চলিয়াছে, দূরে মাঠ হইতে তাহাদের আত্মীয়রা

সুর মিলাইয়া গাহিয়া ওঠে। আকাশে নক্ষত্রের আলোক-স্পন্দনের উত্তরে মাটিতে পতঙ্গরা অবিরাম গুঞ্জন করিয়া চলে। ঘন আল্‌ডারের বনে বাতাসে পল্লব-মর্মর জাগে। নদী-পারে পর্বতের অরণ্য হইতে ভাসিয়া আসে নাইটিঙ্গেলের সুর।

বহুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গতেফ্রেদ বলিয়া ওঠে: 'এই বিরাট জলসার মধ্যে আর বাকি কি আছে গাইবার?'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিতে পারে না, গতেফ্রেদ কাহার সহিত কথা বলিতেছে, জাঁ-ক্রিস্‌তফের সঙ্গে, না নিজের সঙ্গে!

'ওদের গান শুনে কি মনে হয় না যে, আমাদের সব তৈরী গানের চেয়ে ঢের মধুর ওদের ঐ গান?'

বহুদিন জাঁ-ক্রিস্‌তফ রাত্রির এই সঙ্গীত কান পাতিয়া শুনিয়াছে। শুনিতে তাহার ভাল লাগে। কিন্তু আজ যেমন করিয়া শুনিল যেন আগে আর কোনদিন তেমন করিয়া শুনিতে পায় নাই। সত্যই তো! এই গানের পর, আর গাহিবার কি দরকার থাকিতে পারে?...এক অপরূপ সকরুণ মমতায় অন্তর ভরিয়া ওঠে। মনে হয়, এই মুহূর্তে যেন বুকে জড়াইয়া ধরে, এই চন্দ্রালোকিত তৃণ-ভূমি, এই নদী, তারায়-ভরা ঐ আকাশ! দেখে, গতেফ্রেদের মুখে যেন আজ কোথা হইতে এক নূতন আলো আসিয়া পড়িয়াছে, মনে হয়, সে যেন ফেরিওয়ালাা নয়, তাহার পরিবর্তে তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে জগতের মধ্যে যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সকলের চেয়ে যে সুন্দর! সমস্ত অন্তর তাহাকে ভালবাসিবার জন্য উদ্বেল হইয়া ওঠে। এই লোককে সে এতদিন কি অন্যায়ভাবে ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে! হঠাৎ তাহার মনে হইল, গতেফ্রেদ যে বিষণ্ণ হইয়া থাকে, তাহার জন্য বুঝি সে-ই দায়ী; সে গতেফ্রেদকে এই ভাবে ভুল বোঝে বলিয়াই বুঝি সে এমনি বিষণ্ণ হইয়া থাকে। অনুশোচনায় অন্তর ভরিয়া যায়। ইচ্ছা হয় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া সে বলে: 'মামা, দুঃখ করো না! আমাকে ক্ষমা করো! আর আমি অবিচার করবো না! আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমাকে ভালবাসি!'

কিন্তু মুখ ফুটিয়া তবু বলিতে পারিল না। হঠাৎ গতেফ্রেদের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু মন যাহা বলিতে চায়, কিছুতেই মুখে তাহা বাহির হয় না। শুধু কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট গুঞ্জনের মতন বলিয়া চলে: 'আমি তোমাকে ভালবাসি। সত্যি, আমি তোমাকে ভালবাসি!'

গতেফ্রেদ সেই অকস্মাৎ ভাবোচ্ছ্বাসে বিস্মিত হইয়া যায়; বুঝিতে না পারিলেও, তাহার ভাল লাগে। বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। আদরে তাহার শিরচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করে: 'কি হ'লোরে? কি?'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ আর কিছুই বলিতে পারে না।

তখন গতেফ্রেদ উঠিয়া পড়ে। জাঁ-ক্রিস্‌তফের হাত ধরিয়া চলিবার জন্য পা বাড়ায়: 'চল্‌, এবার বাড়ী ফিরে যাই!'

জাঁ-ক্রিস্‌তফের মন অভিমানে ভারী হইয়া ওঠে। সে বুঝিতে পারে, গতেফ্রেদ তাহাকে বুঝিতে পারে নাই। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া গতেফ্রেদ বলে: 'তোর যদি ভাল লাগে, তাহলে আবার একদিন নদীর ধারে ভগবানের নাটশালায় গিয়ে বসবো, তোকে আরো গান গেয়ে শোনাবো!'

বিদায়ের কালে চুম্বন করিতে গিয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফ দেখে, গতেফ্রেদের দুই চোখ আলোতে, হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে-হাসিতে জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝিতে পারে, গতেফ্রেদ তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে! নামিয়া যায় দুঃখের ভার।

সেইদিনের পর হইতে তাহারা দুইজনে প্রায়ই সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইত; নদীর ধার ধরিয়া অথবা মাঠের ভিতর দিয়া নীরবে দুই-জনে হাঁটিয়া চলিত। অন্ধকারে গতেফ্রেদ আপনার মনে আস্তে আস্তে পাইপ টানিয়া চলিত, সামনে ঘনায়মান অন্ধকারে মাঝে মাঝে ভীত হইয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফ হাত বাড়াইয়া গতেফ্রেদের হাত জোর করিয়া ধরিত। ক্লান্ত হইয়া নদীর ধারে কিম্বা মাঠের মাঝখানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িত, কয়েক মুহূর্ত নীরবেই কাটিয়া যাইত, তারপর গতেফ্রেদ কথা বলিতে আরম্ভ করিত, আকাশের দিকে চাহিয়া নক্ষত্রের আর মেঘের গল্প বলিত। রাত্রির সেই সুবিশাল নাট্যশালায় অনাদি সংগীতের যে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রতিমুহূর্তে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে জানিতে, তাহাকে চিনিতে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে, তাহাকে শিখাইত। এই পৃথিবী, তাহাকে পরিব্যপ্ত করিয়া এই মহাশূন্য, এই নদী, সাগর, প্রত্যেকের চলার একটা আলাদা করিয়া সুর আছে; বাতাসে পাখার উপর ভর করিয়া যাহারা উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রত্যেকের কান্না, ভালবাসার, তাহাদের প্রত্যেকের পাখার স্পন্দনের আলাদা আলাদা সংগীত আছে; অন্ধকারে সঞ্চরমান কত না প্রাণী, পায়ে হাঁটিয়া, মাটিতে বুক দিয়া, পাখা মেলিয়া, সাঁতার কাটিয়া কত ভাবে চলিতেছে ফিরিতেছে,

তাহাদের প্রত্যেকেরই গতির আছে স্বতন্ত্র একটা রূপ, স্বতন্ত্র সংগীত ...রাত্রির এই মহা-সঙ্গীতের সুবিশাল জলসায়, দূর নক্ষত্রের আলোক-স্পন্দন হইতে অন্ধকারে পল্লবের মৃদু পত্র-মর্মর পর্যন্ত কত না বিচিত্র তন্ত্রীতে নিত্য উঠিতেছে কত না বিচিত্র সুর! একটি একটি করিয়া গতেফ্রেদ তাহাদের পরিচয় দিয়া চলে, এই বিরাট অর্কেষ্ট্রার প্রত্যেক যন্ত্রটিকে আলাদা আলাদা করিয়া চিনাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তাহারি মধ্যে মাঝে মাঝে গতেফ্রেদ দু'একটা সুর গাহিয়া ওঠে, কিন্তু সে-সব সুরের ধরন একই রকমের এবং প্রত্যেকটি সুরই জাঁ-ক্রিস্তফের মনকে কি এক অজানা বেদনায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু কোন দিনই গতেফ্রেদ একবারের জায়গায় দুইবার গাহিত না। জাঁ-ক্রিস্তফ লক্ষ্য করিত, যেদিনই অনুরোধে তাহাকে গাহিতে হইত, সেইদিনই তাহার কণ্ঠে তেমন করিয়া আর খুশি ফুটিয়া উঠিত না। কোন কোন দিন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা দুইজন পাশাপাশি বসিয়া থাকিত, নীরবে... কেহ কোন কথাই বলিত না। জাঁ-ক্রিস্তফ নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, কখন আপনা হইতে গতেফ্রেদ গাহিয়া উঠিবে, কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া এইভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে যখন সে নিরাশ হইয়া ভাবিত, তাহা হইলে আজ আর মামা গাহিবে না, তখনই অকস্মাৎ গতেফ্রেদ গাহিয়া উঠিত।

একদিন এইরকম এক সন্ধ্যায়, জাঁ-ক্রিস্তফ যখন বুঝিল আজ আর কিছুতেই গতেফ্রেদ গাহিতেছে না, তাহার মাথায় এক বাসনা জাগিয়া উঠিল, মামার নিকট তাহারই রচিত একটি ছোট্ট সংগীতকে সে উপস্থিত করিবে! কি বিপুল চেষ্টায় আর নিষ্ঠায় তাহার এই গর্বের ধনকে সে সৃজন করিয়াছে! তাহার সাধ, সে গতেফ্রেদকে দেখাইবে, সত্যই সে কতখানি শিল্পী হইয়া উঠিয়াছে! গতেফ্রেদ নীরবে সব শুনিল। তারপর বলিয়া উঠিল: 'ওরে হতভাগা জাঁ-ক্রিস্তফ, যা শোনালি তা... কুৎসিত...অতি কুৎসিত!'

সেই সোজা কথা অকস্মাৎ জাঁ-ক্রিস্তফের মনকে এমন রূঢ়ভাবে আঘাত করিল যে, সে কি বলিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না।

গতেফ্রেদ তেমনি অনুকম্পা-কাতর কণ্ঠে বলিয়া ওঠে: 'কেন তৈরী করতে গেলি? এতে যে কোন সৌন্দর্যই নেই! কেউ তো তোকে এর জন্যে বাধ্য করে নি?'

রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া জাঁ-ক্রিস্তফ প্রতিবাদ করিয়া ওঠে: 'হতে

পারে কুৎসিত তোমার কাছে, কিন্তু আমার দাদু রীতিমত তারিফ করেছেন, বলেছেন চমৎকার হয়েছে!'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া গতেফ্রেদ বলে: 'তা হবে! তিনি যখন বলেছেন, তখন ঠিকই বলেছেন। তাই হবে! তিনি একজন পণ্ডিত লোক...সঙ্গীত সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি জানেন। সত্যি, আমি তো এ-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুই জানি না...'

তারপর কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া আবার বলিয়া ওঠে: 'তবু ...আমার মনে হয়...আমার নিজের মনে হয়, কুৎসিত!'

কথা শেষ করিয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, দেখে রাগে কঠিন হইয়া গিয়াছে মুখের রেখা। হাসিয়া বলে: 'আর কোন কিছু রচনা করেছিস নাকি? হয়ত, এটার চেয়ে অন্য আর একটা ভাল লাগতে পারে!'

কথাটা জাঁ-ক্রিস্‌তফ ফেলিয়া দিতে পারিল না। এটা হয়ত কোন কারণে ভাল না লাগিতেও পারে! তাই প্রথমটার স্মৃতি তাহার অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য জাঁ-ক্রিস্‌তফ একে একে তাহার অধিকাংশ রচনাই গতেফ্রেদকে শোনাইল। গতেফ্রেদ কোন কথা বলিল না; যতক্ষণ না জাঁ-ক্রিস্‌তফ শেষ করিল, ততক্ষণ চুপ করিয়াই শুনিল। তারপর মাথা নাড়িয়া গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলিয়া উঠিল: 'এগুলো প্রথমটার চেয়ে আরো বেশী কুৎসিত!'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ দাঁতে দাঁত দিয়া, কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখে। সমস্ত থুতনিটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয়, এখুনি কান্নায় ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই গতেফ্রেদের। গতেফ্রেদ নিজেকেই যেন সেই রচনার জন্য অপরাধী মনে করে, এমনিভাবে বলিয়া ওঠে: 'সত্যি, কি কুৎসিত!'

অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে জাঁ-ক্রিস্‌তফ চিৎকার করিয়া ওঠে: 'কেন? কেন তুমি বলছো এগুলো কুৎসিত হয়েছে?'

স্বচ্ছ দৃষ্টিতে গতেফ্রেদ তাহার দিকে চাহিয়া বলে: 'কেন?...তা আমি জানি না...তবে...হাঁ...দাঁড়া বলছি...এগুলো কুৎসিত, প্রথমত, একদম বাজে...হাঁ নিরর্থক...কোন মানেই হয় না, বুঝেছিস? যখন তৈরী করেছিলি, তখন মনে তোর বলবার মত কিছুই ছিল না। কেন তৈরী করতে গেলি?'

আর্তকণ্ঠে জাঁ-ক্রিস্‌তফ বলিয়া ওঠে: 'তা জানি না! যা হোক্‌ একটা সুন্দর কিছু তৈরী করতে চেয়েছিলাম...'

'আমিও তো তাই বলছি—একটা কিছু তৈরী করতে হবে, তাই তৈরী করেছিস! কি তৈরী করছিস তার কোন ধারণাই তোর ছিল না। তুই একজন মস্ত বড় সংগীত-রচয়িতা হবি, লোকে তোর যশ গাইবে, এই জন্যেই তুই গান বাঁধতে গিয়েছিলি। ওরে, ওটা হলো গর্ব...ঐ গর্বের পাল্লায় প'ড়ে তুই মিথ্যাচার করেছিস, তাই তার শাস্তিও পেলি! মনে রাখিস, সংগীতে যখনি কোন মানুষ মিথ্যাচার করে, প্রবঞ্চনা করে, সংগীতের মধ্যে নিয়ে আসে গর্ব, তখনি মাপা থাকে তার শাস্তি। সংগীতকে হ'তে হবে সহজ, সরল, আন্তরিক—তা ছাড়া সংগীত আর কি? অন্তরের সহজ সত্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই, বিশ্বের এই সেরা সংগীতের যিনি রচয়িতা, তিনি আমাদের দিয়েছেন গান, দিয়েছেন সুর। তাই সেখানে ঔদ্ধত্য আর গর্ব মানেই হলো, তাঁকে অস্বীকার করা, তাঁকে অসম্মান করা!'

গতেফ্রেদ বুঝিল, জাঁ-ক্রিস্‌তফ তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, ব্যথিত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাই আদর করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে গেল। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্‌তফ রাগিয়া হাত ছাড়াইয়া ছিট-কাইয়া চলিয়া গেল এবং তাহার পর হইতে কয়েক দিন ধরিয়া গতেফ্রেদের সামনেই আসিল না। গতেফ্রেদকে রীতিমত ঘৃণা করিতে লাগিল। গতেফ্রেদের কথা মনে আসিলেই সে বারবার নিজেকে প্রবোধ দিয়া বলিতে চেষ্টা করিত: 'ওটা গাধা, একটা আস্ত গাধা! কিছু জানে না...কিছু না! দাদু ওর চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি ধরে, রীতিমত পণ্ডিত, দাদু আমার রচনার তারিফ করেছে...'

কিন্তু হায়, তাহার সমস্ত স্তোকবাক্য সত্ত্বেও, তাহার মনের গভীরে সে বুঝিয়াছিল, গতেফ্রেদই সত্য কথা বলিয়াছে, গতেফ্রেদের উপর তাহার যতই কেন রাগ বা ঘৃণা থাকুক, গতেফ্রেদের প্রত্যেকটি কথা তাহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিয়া গিয়াছে, সে যে মিথ্যাচার করিয়াছে, গতেফ্রেদ তাহা ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছে। তাই সংগোপন লজ্জার হাত হইতে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না।

সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতে যখনই সে সংগীত-রচনা করিতে বসিত, গতেফ্রেদের কথা তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিত। এবং রচনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরিয়া লইত, গতেফ্রেদ সে-সম্বন্ধে কি

মন্তব্য করিবে। রাগে দুঃখে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। এইভাবে একদিন সে একটা ছোট "মেলডী" রচনা করিল; নিজেই বিচার করিয়া বুঝিল, তাহার মধ্যে সত্যকারের আন্তরিকতা ষোলআনা ফুটিয়া ওঠে নাই, তবুও তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না, সযত্নে লুকাইয়া রাখিল, যাহাতে গতেফ্রেদ না দেখিতে পায়। গতেফ্রেদের সমালোচনাকে সে রীতিমত ভয় করিত। কিন্তু একদিন তাহার নব-রচিত একটা সংগীত দেখিয়া গতেফ্রেদ আপনা হইতে বলিয়া উঠিল: 'এটা আগেকার মতন তত খারাপ তো বোধ হচ্ছে না...বরঞ্চ ভালই লাগছে...'

জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় অনেকটা কাটিয়া যায়।

গতেফ্রেদকে জব্দ করিবার জন্য জাঁ-ক্রিস্তফের মাথায় এক ফন্দী জাগিয়া ওঠে। নাম-করা পুরানো সংগীত-রচয়িতাদের রচনা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধার করিয়া, নিজের রচনা বলিয়া গতেফ্রেদের সামনে উপস্থিত করে। যখন গতেফ্রেদ মুখ ভার করিয়া কুৎসিত বলিয়া তেমনি তীব্রভাবে তাহাদেরও প্রত্যাখ্যান করিত, জাঁ-ক্রিস্তফ উল্লসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু গতেফ্রেদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না। জাঁ-ক্রিস্তফ তাহাকে ঠকাইতে পারিয়াছে বলিয়া হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিত, গতেফ্রেদ তাহার উল্লাসে কোন বাধাই দিত না। বরঞ্চ সেই খেলায় সে-ও হাসিয়া যোগদান করিত। কিন্তু নিজের মতের কোন পরিবর্তন করিত না। সব কথার শেষে বারেবারে সেই একই মন্তব্য সে করিত: 'হয়ত রচনার দিক থেকে ভালই বলা যায়, কিন্তু কোন অর্থ নেই, কি বলছে তা রচয়িতা নিজেই জানে না।' মেলশিয়রের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ছোট-খাট জলসার আয়োজন হইত। গতেফ্রেদ কিছুতেই সে-সব জলসায় উপস্থিত থাকিতে চাহিত না। যত ভালই কনসার্ট হোক না কেন, কিছুক্ষণ পরেই তাহার হাই উঠিতে আরম্ভ হইত, বিরক্তিতে ঝিমাইয়া পড়িত এবং এমন অসহ্য বোধ হইত যে নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়িয়া চুপি চুপি সেখান হইতে সরিয়া পড়িত। জাঁ-ক্রিস্তফকে প্রায়ই বলিত: 'বুঝেছ বৎস, এই ঘরের ভিতর থেকে চেয়ারে বসে তোমরা যে-সংগীত তৈরী করো, তা সংগীত নয়। ঘরে-তৈরী এই সংগীত কেমন জান? যেমন ঘরের ভিতর সূর্যের আলো! সংগীত আছে ঘরের পাঁচিলের বাইরে, যেখানে বয়ে চলেছে অবাধে ভগবানের আলো আর বাতাস!'

গতেফ্রেদের আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সব কথাতেই সে

ভগবানের নাম করিত। জাঁ-ক্রিস্তফের বাবা আর ঠাকুরদা, দুজনেই ছিলেন স্বাধীন চিন্তাওয়ালাদের দলে, তাঁহারা ভগবানকে লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করিতেন না, দরকার হইলে শুক্রবার রীতিমত মাংস ভক্ষণ করিতেন। সেদিক দিয়া গতেফ্রেদ ছিল তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী, রীতিমত একজন ধর্ম-ভীরু লোক।

সহসা মেলশিয়র তাহার মত পরিবর্তন করিল। কেন যে করিল, জাঁ-ক্রিস্তফ তাহার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে উৎসাহ দেওয়ার দরুণ একদিন বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের উপর মেলশিয়র রীতিমত ক্রুদ্ধই হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সহসা কি হইল কে জানে, জাঁ-ক্রিস্তফের সেই সব টুকরা টুকরা খেয়ালের দানকে একসঙ্গে গাঁথিয়া সঙ্গীতের রূপ দিবার জন্য মেলশিয়র তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সমর্থন করিতে লাগিল এবং শুধু যে মুখের কথায় সমর্থন করিল তাহা নহে, জাঁ-ক্রিস্তফের সেই প্রথম সঙ্গীত-রচনার পাণ্ডুলিপি হইতে নিজের হাতে দুইতিনখানি কপি তৈয়ারী করিল। সেই সম্বন্ধে জাঁ-ক্রিস্তফ যদি কোন কথা তুলিত, তাহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া এখন মেলশিয়র গম্ভীরভাবে বলিত: 'আচ্ছা, সে-সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাবে...' কখনও বা হাতে হাত ঘষিয়া হাসিয়া উঠিত, কিম্বা আদর করিয়া বালকের মাথা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া উঠিত ...কখন বা রহস্যছলে বালকের পিঠে মৃদু করাঘাত করিত। হঠাৎ এতখানি আদর জাঁ-ক্রিস্তফ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিত না, তবে একটা কথা বুঝিত যে, তাহার পিতা তাহার সম্বন্ধে সন্তুষ্টই হইয়াছে, কেন যে হইয়াছে তাহা সে ভাবিয়া ঠিক পাইত না।

ইদানীং তাহার পিতা আর ঠাকুরদা দুইজনে মিলিয়া রহস্যজনকভাবে কি সব মতলব করিতেন, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ সে জানিতে পারিল, তাহার সেই প্রথম সঙ্গীত-রচনা, শৈশবের সুখ-স্মৃতি, মহামান্য গ্র্যান্ড ডিউক লিওপোল্ডের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মেলশিয়র প্রিন্সের মনোভাব যাচাই করিয়া দেখিয়াছে এবং বুঝিয়াছে যে রাজ-সুলভ-উদারতায় তিনি এই সম্মান আনন্দেই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন। গ্রান্ড ডিউকের সেই সম্মতি পাওয়ার পর মেলশিয়র ঘোষণা করিল, আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া, প্রথম, প্রিন্সের নামে উৎসর্গ-পত্রটি অবিলম্বে যথোপযুক্তভাবে লিখিয়া ফেলিতে হইবে; দ্বিতীয়, এই বইটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপাইতে হইবে; তৃতীয়, এই

সংগীতকে সাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য একটা কনসার্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে মেলশিয়র আর বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের মধ্যে ক্রমান্বয় আলোচনা চলিতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুইজনে রীতিমত উত্তেজিতভাবে বচসা করে। বাড়ীর সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের কথাবার্তায় যেন কেহ কোন রকমের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। কাগজ পেনসিল লইয়া মেলশিয়র উৎসর্গ-পত্র লিখিতে বসে, লেখে আর কাটে, কাটে আর লেখে। পাশে বসিয়া বৃদ্ধ অনর্গল বকিয়া চলে, যাহা লিখিতে হইবে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহা কবিতার মতন আবৃত্তি করিয়া চলে। হঠাৎ কোন একটা শব্দ ঠিক উপযুক্ত হইল কি না, তাহা লইয়া দুইজনে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া যায়, টেবিল চাপড়াইয়া, চিৎকার করিয়া দুইজনে যেন বাড়ী মাথায় করিয়া তোলেন।

খসড়া তৈয়ারী হইয়া গেলে, জাঁ-ক্রিস্তফের ডাক পড়ে। জাঁ-ক্রিস্তফের হাতে কলম দিয়া তাহার ডান দিকে পিতা চেয়ার লইয়া বসিল, বাঁ দিকে তাহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল। বৃদ্ধ খসড়া দেখিয়া বলিয়া চলে, জাঁ-ক্রিস্তফ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করে, কিন্তু সেই দীর্ঘ-পত্রের অধিকাংশ শব্দেরই মানে সে বুঝিতে পারে না; বুঝিবার চেষ্টা করিলেও, তাহার কোন সুযোগ পায় না; কেন না, একদিকে তাহার পিতা তারস্বরে চিৎকার করিয়া হয়ত কোন শব্দের প্রতিবাদ করিয়া ওঠে, বৃদ্ধ সেই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফের আর এক কানের কাছে আরো জোরে চিৎকার করিয়া ওঠে। ক্রমশ বৃদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ারে আর বসিয়া থাকিতে পারে না, চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে রীতিমত অংগ-ভংগী করিয়া বক্তৃতা দিয়া চলে এবং ঠিকমত লেখা হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। মেলশিয়রও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে, বালক তাহার সংশোধনকে গ্রহণ করিতেছে কি না; মাঝখানে বিহ্বলভাবে জাঁ-ক্রিস্তফ সেই দুই উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কি লিখিতেছে তাহা ভুলিয়া যায়, এবং মাঝে মাঝে জিভ বাহির করিয়া কলম তুলিয়া বোকার মতন বসিয়া থাকে। চোখের সামনে যেন সব ঝাপসা হইয়া যায়, লিখিতে গিয়া ভুল করিয়া বসে, অক্ষরগুলি অসমান হইয়া যায়, কাটাকুটি করিতে হয়, একদিকে মেলশিয়র গর্জন করিয়া ওঠে, আর এক দিকে বৃদ্ধ ঝড়ের মতন আসিয়া ভর্ৎসনা করে। নূতন করিয়া আবার আরম্ভ করিতে হয়,

আবার ভুল হইয়া যায়, আবার নূতন করিয়া সুরু করিতে হয়, এইভাবে যখন জাঁ-ক্রিস্তফ হাঁফ ছাড়িয়া বুঝিল, লিখা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ কলম হইতে এক ফোঁটা কালি কাগজের উপর পড়িয়া গেল। দুই দিক হইতে দুইজনে কান ধরিয়া তাহাকে সজোরে চেয়ার হইতে টানিয়া তুলিল, জাঁ-ক্রিস্তফের চোখ ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেই চিৎকার করিয়া উঠিল: 'খবরদার কাঁদবি না, চোখের জলে যে লেখা নষ্ট হয়ে যাবে মুখ্যু!' কাঁদিবারও উপায় নাই! আবার নূতন করিয়া গোড়া হইতে লিখিতে হয়, জাঁ-ক্রিস্তফ লেখে আর ভাবে, বুঝি অনন্তকাল এই ভাবে লিখিয়াই চলিতে হইবে।

অবশেষে পর্ব সমাপ্ত হইল। জাঁ-ক্রিস্তফের নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ আবৃত্তি করিয়া চলিতে থাকে, মেলশিয়র পা ছড়াইয়া দিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া চেয়ার দোলাইতে দোলাইতে মহাবিজ্ঞের মতন সায় দিয়া চলে। বৃদ্ধ আবৃত্তি করিয়া চলে:

"হে মহামহিমার্ণব মান্যবর! অনুগৃহীত-জনের মহদাশ্রয়! হে রাজন্,

"মদীয় জীবনের চতুর্থ বর্ষ বয়ঃকাল হইতে সঙ্গীতই হইল আমার শৈশব-জীবনের সর্ব-প্রথম সাধনা। সেই অতি শিশুকালেই আমি আমার অন্তর সঙ্গীতের বরদাত্রী দেবীর চরণে অর্পণ করিয়াছি, দেবী পরম অনুগ্রহে আমার অন্তরকে বিমল মহা-সঙ্গীতিতে বিকশিত করিয়া তোলেন। অন্তর দিয়া দেবীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, আমি জানি, তিনিও আমাকে সেই ভালবাসাতেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা আমার বয়স মাত্র ছয়।

"কিছুকাল যাবৎ দিব্যমুহূর্তে আমি যেন শুনিতে পাই, সঙ্গীতদেবী আমার শ্রবণে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছেন : 'বৎস! মা ভৈ! মা ভৈ! তোমার অন্তরে যে হার্মনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে সঙ্গীতে রূপ দাও!' বিস্মিত হইয়া আমি ভাবি, আমি যে ছয় বৎসরের শিশু, কি করিয়া আমি এই দুঃসাহস অর্জন করিব? সঙ্গীতে যাঁহারা কৃতদর্শী পণ্ডিত, তাঁহারা বলিবেন কি? ইতস্তত করিতে লাগিলাম। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু দেবী তেমনি আদেশ দিয়াই চলিলেন। অবশেষে সম্মত হইলাম। সঙ্গীত রচনা করিলাম।

"তাই আজ আমি,

"হে মহা-মহিমান্বিত পুরুষোত্তম, কম্পান্বিতকলেবরে অসীম দুঃসাহসিকতায় উপস্থিত হইয়াছি, আপনার ঐ সিংহাসনের পাদমূলে

আমার শৈশব-সাধনার সর্ব-প্রথম ফলকে নিবেদন করিবার জন্য! আমি কি সাহস করিয়া ভরসা করিতে পারি যে, আমার সেই দীন অর্ঘের উপর আপনার পিতৃ-স্নেহের সুমহান্ অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিপতিত হইবে?

"হাঁ, আমি জানি, আপনার উদার অন্তরে বিজ্ঞান আর আর্ট চিরকাল তাহাদের পরম নির্ভয়ে আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। আপনি হইলেন তাহাদের রক্ষক ও পালক, আপনারই সুপবিত্র লালন-পালনে প্রতিভার কুসুম ফুল্ল বিকশিত হইয়া উঠে।

"সেই সুগভীর আর নিঃসংশয় বিশ্বাসের বলেই আমার এই শৈশব-সাধনার অর্ঘ লইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

"হে মহামহিমান্বিত পুরুষোত্তম! একজন শিশুর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের নিঃসংশয় শ্রদ্ধারূপে এই অর্ঘ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করুন। তাহার এই রচনা আর সেই সঙ্গে আপনার চরণে একান্ত শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক তাহার রচয়িতার প্রতি অনুগ্রহের কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করুন। ইতি

"মহামহিমান্বিত অশেষগুণাশ্রিত রাজাধিরাজের দীনতম,
একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য,
জাঁ-ক্রিস্তফ ক্রাফ্‌ট"

কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের কানে কোন কথাই পৌঁছায় না। সে শুধু এই ভাবিয়া শান্তি পাইল যে, লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে। পাছে, কোন কারণে আবার যদি লিখিতে হয়, এই ভয়ে সে ঘর হইতে ছুটিয়া একে-বারে বাড়ীর বাহিরে পালাইল। সে যে কি লিখিল, তাহার কোন ধারণাই তাহার ছিল না, তাহা জানিবার জন্যও কোন আগ্রহ তাহার ছিল না।

একবার পড়িয়া যেন তাহার পূর্ণ স্বাদ পাওয়া গেল না, তাই বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার পড়িতে সুরু করিয়া দিল। দ্বিতীয়বার পাঠ শেষ হইলে মেলশিয়র ও বৃদ্ধ দুইজনেই ঘোষণা করিল, উৎসর্গ-পত্রটি সত্যই একটা অদ্ভূত রচনা হইয়াছে। যখন জাঁ-ক্রিসত্‌ফের পাণ্ডুলিপিসমেত সেই উৎসর্গ-পত্রটি গ্রাণ্ড ডিউকের নিকট নিবেদন করা হইল, তিনিও তাহার অপরূপত্ব স্বীকার করিলেন। পরম অনুগ্রহে তিনি পরে মেলশিয়র আর বৃদ্ধকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, সংগীত-পুস্তক আর অনুসংগী উৎসর্গ-পত্র, উভয়ই তাঁহার প্রীতি উদ্রেক করিয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি কনসার্টেরও সম্মতি প্রদান করিলেন এবং আদেশ দিলেন, 'একাডেমি অব মিউজিক'-এর হল-ঘর কনসার্টের জন্য মেলশিয়র ব্যবহার করিতে পাইবে

এবং অনুষ্ঠানের দিন বালক-রচয়িতাকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিবারও সম্মতি দিলেন।

তখন যত শীঘ্র সম্ভব সেই অনুষ্ঠান হয়, তাহার জন্য মেলশিয়র উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। অনুষ্ঠানের আগে জাঁ-ক্রিস্তফের সেই প্রথম রচনাটিকে যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, মুদ্রিত পুস্তকের প্রচ্ছদপটে জাঁ-ক্রিস্তফের একটি ছবিও দিবে, জাঁ-ক্রিস্তফ পিয়ানোয় বসিয়া বাজাইতেছে, আর তাহার পাশে বেহালা হাতে মেলশিয়র দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে-বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল, অবশ্য খরচের জন্য নয়, মেলশিয়র এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য খরচের কোনই কার্পণ্য করিল না; পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ, সময় আর ছিল না। ভিতরের টাইটেল-পৃষ্ঠায় দীর্ঘ উৎসর্গ-বাণীর সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে প্রিন্সের নাম মুদ্রিত হইল এবং পাতার মাথার কাছে এক লাইন বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রহিল: "হের জাঁ-ক্রিস্তফ ক্রাফ্টের বয়স মাত্র ছয় বৎসর।" যদিও, প্রকৃতপক্ষে তাহার বয়স তখন সাড়ে সাত হইয়াছিল। ছাপান ছাড়া, প্রচ্ছদ-পট আর টাইটেল-পাতার সাজ-সরঞ্জামের দরুণও বিস্তর খরচ পড়িয়া গেল। বিল দিবার মতন নগদ পয়সা হাতে না থাকায় মেলশিয়র অষ্টাদশ-শতাব্দীর একটা কারুকার্যময় প্রাচীন সিন্দুক বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। পুরানো-আসবাব-পত্র ব্যবসায়ী ওয়র্মসার বহুবার মেলশিয়রকে প্রলোভন দেখাইয়াছিল, সেই প্রাচীন শিল্পদ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য, কিন্তু মেলশিয়র কিছুতেই তখন রাজী হয় নাই। আজ স্বেচ্ছায় তাহা বিক্রয় করিতে হইল। তবে মেলশিয়রের মনে কোন সন্দেহই ছিল না যে, এই অনুষ্ঠান হইতে যে-টাকা পাইবে, তাহাতে তাহার সমস্ত খরচ-পত্রই উঠিয়া আসিবে।

আর একটা দুশ্চিন্তা তখন পাইয়া বসিল, অনুষ্ঠানের দিন জাঁ-ক্রিস্তফকে কি পোষাকে উপস্থিত করিবে! তাহার মীমাংসার জন্য বাড়ীতে সভা বসিল। মেলশিয়র জানাইল, তাহার বাসনা, চার বছরের শিশু যেমন সাদাসিধে ভাবে থাকে, জাঁ-ক্রিস্তফ সেইরকম ভাবেই পোষাক করিবে। কিন্তু চার বছরের শিশু বলিয়া তাহাকে আর চালান যায় না, তাহা ছাড়া তাহার বয়সের পক্ষে রীতিমত তাহাকে ভারী দেখায়, আর সবাই তাহাকে চেনে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর মেলশিয়রের মাথায় আর একটা বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, শাদা টাই-এর সঙ্গে রীতিমত

ড্রেস-স্যুট তাহাকে পরাইলে কেমন হয়! লুইসা ঘোরতর প্রতিবাদ করিল, ছোট ছেলেকে সেই পোষাকে হাস্যকর দেখাইবে। কিন্তু মেলশিয়র তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাতই করিল না। বলিল, তাহার বিশ্বাস লোকে খুশি হইবে, সেই বিচিত্র পোষাকের আকস্মিকতায় লোকে রীতিমত মজা পাইবে। মেলশিয়রের কথাই থাকিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ দরজীর ডাক পড়িল। দরজী আসিয়া সেই ছোট্ট মানুষটির কোটের মাপ লইল। পোষাকের জন্যে যে কাপড় বাছিয়া দেওয়া হইল, তাহা রীতিমত দামী এবং সেই সঙ্গে একটা পেটেণ্ট-লেদারের ভাল জুতাও কেনা হইল। মেলশিয়রের হাতে শেষ-কপর্দক পর্যন্ত তাহাতে নিঃশেষিত হইয়া গেল। সেই নূতন পোষাকে কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের অস্বস্তিই হইতে লাগিল। অনুষ্ঠানের আগে পুরা একমাস ধরিয়া পিয়ানোর টুল হইতে সে আর ছুটিই পাইল না। ভিতরে ভিতরে রাগে আর যন্ত্রণায় গুমরাইতে থাকে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস পায় না। নিজেকে বোঝাইতে চেষ্টা করে, একটা বিস্ময়কর কিছু সে করিতে যাইতেছে, সুতরাং এসব সহ্য করাই উচিত। সেই বিস্ময়কর সম্ভাবনার কথা মনে ভাবিতে রীতিমত একটা গর্ব অনুভব করে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অজানা আতঙ্কও তাহাকে পাইয়া বসে। বাড়ীর লোকেরা রীতিমত আদরে তাহাকে উৎসাহ দিয়া চলে। সর্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে চেষ্টা করে, পাছে অসুখে পড়িয়া যায়, কিম্বা ঠাণ্ডা লাগে। তাই সর্বদাই গলায় একটা কাপড় জড়াইয়া তাহাকে থাকিতে হয়, পায়ের জুতা দুইবেলা আগুনে সেঁকিয়া গরম করিয়া দেওয়া হয়, খাবার টেবিলে ভাল জিনিসটি আগে তাহাকে পরিবেশন করা হয়।

অবশেষে সেই মহা-দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। সকাল বেলা নাপিত আসিয়া তাহার অবাধ্য চুলগুলিকে শাসন করিয়া সুচিক্কণ কুঞ্চিত করিতে বসিল এবং যতক্ষণ না তাহা মনমত হইল, ততক্ষণ জাঁ-ক্রিস্তফকে মাথা বিকাইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। নাপিত সজ্জা ঠিক করিয়া দিলে, বাড়ী শুদ্ধ লোক একে একে তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; সকলেই একবাক্যে বলিল: 'চমৎকার!' মেলশিয়র আসিয়া তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া, সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার করিয়া দেখিল; হঠাৎ মনে হইল, একটি জিনিস বাকি রহিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে ছুটিয়া গিয়া একটি ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং কোটের বাটন্-হোলে সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কিন্তু

লুইসা পুত্রের সজ্জা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল : 'এ যে বানরের সাজ হয়েছে!' কথাটা জাঁ-ক্রিস্তফের মনে কাঁটার মতন বিঁধিয়া গেল। বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সে-পোষাকে সে গর্বিত হইবে, না, লজ্জিত হইবে!

এই সমস্ত ব্যাপারের দরুণ মনের ভিতর আপনা হইতেই সে নিদারুণ একটা হীনতা অনুভব করে, সে-হীনতা-বোধ কনসার্টের সময় যেন আরো বাড়িয়া যায়। তাহার জীবনের সেই প্রথম স্মরণীয় দিবসের স্মৃতি তাহার চিত্তে অব্যক্ত হীনতার বেদনায় জাগরূক হইয়া থাকিবে।

এইবার কনসার্ট আরম্ভ হইবে। প্রেক্ষাগৃহ অর্ধেক খালি পড়িয়া-ছিল, গ্রান্ড ডিউক তখনও আসিয়া পেঁছান নাই। সচরাচর এই জাতীয় ব্যাপারে কোথা হইতে একজন না একজন হিতাকাঙ্খী আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই রকম একজন বন্ধু গায়ে পড়িয়া জ্ঞানাইল যে, প্রাসাদে হঠাৎ একটি জরুরী বিষয়ে সভা করিতে হইতেছে বলিয়া গ্রান্ড ডিউক আসিতে পারিবেন না। বিশ্বস্তসূত্রে সে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। শুনিয়া মেলশিয়র একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল। চঞ্চল হইয়া পায়চারি করিতে সুরু করিয়া দেয় আর ঘন ঘন জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলও এই সংবাদে রীতিমত ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত হইলেন, কিন্তু নাতীকে লইয়া তিনি তখন এত ব্যস্ত যে সেদিকে আর ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না। কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, তাহার ফিরিস্তি, বারবার করিয়া বালকের কানে সগর্জনে বর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার চারিদিকে আপন-জনের সেই উৎকণ্ঠিত চাঞ্চল্য জাঁ-ক্রিস্তফকেও পাইয়া বসে। নিজের সঙ্গীতের কথা তখন আদৌ তাহার মাথায় ছিল না, তাহার পরিবর্তে সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিতে হইবে, এবং সেই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে আরো যেন মুসড়াইয়া পড়িতেছিল।

অবশেষে তাহাকে আরম্ভ করিতেই হইল। শ্রোতারা অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এই অনুষ্ঠানে মেলশিয়র 'হফ্ মিউজিক্ ভেরিয়িন্ কনসার্ট-দল'কে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা ক্যারিওলান্ ওভার্চার সুরু করিয়া দিল। যদিও বহুবার বিঠোফেনের সঙ্গীত সে শুনিয়াছে, তবুও ক্যারিওলান্ অথবা বিঠোফেন, নাম ধরিয়া জাঁ-ক্রিস্তফ কোন সঙ্গীতকেই চিনিত না, জানিত না। যে-সব সঙ্গীত সে শুনিত, তাহা-দের নাম বা পরিচয় জানিবার জন্য তাহার এতটুকুও আগ্রহও ছিল না।

নিজের মতন করিয়া সে সেই সব সংগীতের নামকরণ করিয়া লইত এবং তাহাদের সুর লইয়া মনে মনে নিজের মতন সব ছবি সৃজন করিয়া চলিত। সাধারণত তখন পর্যন্ত যে-সব সংগীত সে শুনিয়াছিল, মনে মনে সে তাহাদের তিনটি স্বতন্ত্র রূপ ঠিক করিয়া লইয়াছিল, আগুন, জল আর পৃথিবী; মোজার্টের সংগীতের সহিত ছিল জলের সংযোগ, মোজার্টের সংগীত যেন নদীর ধারে সবুজ প্রান্তর, নদীর উপরে ভাসমান প্রভাতের স্বচ্ছ কুয়াশা, যেন ঝর্ণার ধারা, কিম্বা বর্ষা-অন্তে রামধনু। বিঠোফেন হইল আগুন, কখনও শতশিখাময় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, তাহাকে বেষ্টন করিয়া উঠিতেছে মেঘচুম্বী ধূম্রস্তম্ভ, কখনও বা মনে হইত, সমস্ত অরণ্য যেন আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মাথার উপর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে রক্তবর্ণ ভয়ংকর মেঘভার, তাহাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া চমকাইয়া উঠিতেছে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ, কখন বা মনে পড়িত নক্ষত্র-বিছানো উদার অনন্ত আকাশ, সহসা সেই নক্ষত্র-পুঞ্জ হইতে একটা বিদ্রোহী অগ্নিস্মান হইয়া পৃথিবীর দিকে তীব্রবেগে জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়া আসিতেছে, অবশেষে হেমন্তের রাত্রির স্নিগ্ধতায় আপনাকে নিভাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিল, বালকের অন্তরের স্পন্দন তখন সহসা দ্রুততর হইয়া উঠিত।

আজ এই মুহূর্তে বিঠোফেনের বীর-অন্তরের সেই দুরন্ত দুর্দান্ত বহ্নিশিখা সহসা যেন তাহাকে পাইয়া বসিল। তাহার বিদ্যুৎ-স্পর্শে নিমেষে অন্তর হইতে সব চিন্তা যেন দূরীভূত হইয়া গেল। তাহার চারিদিকে, এই যে মেলাশিয়র হতাশায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, জাঁ-মিচেল উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত, লোকজনের ভিড়, শ্রোতাদের অধীরতা, গ্রান্ড ডিউক আসিলেন, না আসিলেন না, কি যায় আসে তাহার? ইহাদের সহিত তাহার কিসেরই বা সম্পর্ক? তাহার আর ইহাদের মাঝখানে কে আছে দাঁড়াইয়া? সে-কি সে নিজে?...

তাহার ভিতরে আর একজন কাহার দুরন্ত মন যেন তাহাকে সুতীব্রবেগে টানিয়া লইয়া চলে। মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত কাঁপিতেছে, দুই পা যেন নিথর হিম হইয়া আসিয়াছে, কোথা হইতে চোখে অশ্রু উদ্‌গত হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই জানে না। সে নিজেকে অন্তরের সেই দীপ্যমান বহ্নিশিখার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে। শিরায় রক্ত-প্রবাহ যেন তাহার কানে আসিয়া বলিতেছে: 'এগিয়ে চল্, ঝাঁপিয়ে পড়্!' সে-আদেশে থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে সর্বাঙ্গ। দ্রুত

দুলিতে থাকে হৃদ্-পিণ্ড। এমন সময় অর্কেষ্ট্রা সহসা এক মুহূর্তের জন্য গতির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ আবার সেই ক্ষণিক নীরবতাকে ভঙ্গ করিয়া সামরিক অভিযানের বিপরীত ছন্দে গর্জিয়া উঠিল। এক ধরণের সুর হইতে সহসা তাহার বিপরীত ধরনে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত জাঁ-ক্রিস্তফের কানে আসিয়া লাগিল যে, দাঁতে দাঁত দিয়া কোন রকমে চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু রাগে মাটিতে পা ঠুকিয়া, নিরুপায় হইয়া দেয়ালের দিকেই ঘুসি তুলিয়া মনের আক্রোশকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিল।

সংগীতের মাঝখানে সহসা এইরকম বে-আইনী ও বেয়াড়া পরিবর্তন কেন ঘটিল, তাহা জাঁ-ক্রিস্তফ না বুঝিলেও মেলশিয়র বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সংগীতের মাঝ বরাবর মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, অর্কেষ্ট্রার বাদকরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য এইভাবে সহসা জাতীয় সংগীত বাজাইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাণ্ড ডিউকের আগমনে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলও তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে জাঁ-ক্রিস্তফকে শেষবারের মতন সমস্ত হদিস বাৎলাইয়া দিলেন।

অভিনন্দনের পালা শেষ হইয়া গেলে অর্কেষ্ট্রা পুনরায় আরম্ভের সুরে ফিরিয়া আসিল এবং যথারীতি শেষ করিল। এবার জাঁ-ক্রিস্তফের পালা। মেলশিয়র এমনভাবে প্রোগ্রাম সাজাইয়া ছিল যাহাতে পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতার কৃতিত্বও লোকের কাছে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। দুইজনে মিলিয়া পিয়ানো ও বেহালায় মোজার্টের একটা সোনাটা বাজাইবে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তাহারা দুইজনে একসঙ্গে প্রবেশ করিবে না। তাহা হইলে মেলশিয়রের আবির্ভাবের নাটকীয়তা নষ্ট হইয়া যাইবে। মেলশিয়র তাই স্থির করিয়াছিল জাঁ-ক্রিস্তফ একাই প্রথমে প্রবেশ করিবে। ষ্টেজের প্রবেশ-দ্বারের কাছে জাঁ-ক্রিস্তফকে হাত ধরিয়া আনিয়া, মেলশিয়র সেখান হইতে তাহাকে রঙ্গমঞ্চস্থ পিয়ানোটি দেখাইয়া কোথায় কিভাবে বসিতে হইবে, কি কি করিতে হইবে, শেষবারের মতন পুনরায় ভাল করিয়া জানাইয়া দিল। তারপর রঙ্গমঞ্চের পাশ হইতে তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

থিয়েটর সম্বন্ধে তাহার ভয় অবশ্য কাটিয়া গিয়াছিল কিন্তু আজ সহসা রঙ্গমঞ্চে একা প্রবেশ করিয়া সামনেই চাহিতে যখন দেখিল, অগনণ চক্ষু তাহারই দিকে চাহিয়া আছে, সহসা এক তুমুল ভীতি

তাহাকে পাইয়া বসিল এবং মেলশিয়র আর বৃদ্ধের সমস্ত উপদেশ ভুলিয়া শ্রোতাদের দিকে পিছন করিয়া উইংগসের দিকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। কিন্তু সামনেই দেখিল, তাহার পিতা রক্তচক্ষু লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাত-পা ছুঁড়িতেছে। অগত্যা তাহাকে পিয়ানোর দিকে ফিরিয়া চলিতে হইল। ইতিমধ্যে শ্রোতারা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। এক-পা এক-পা করিয়া যেমন সে অগ্রসর হইয়া চলে, শ্রোতাদের কৌতূহলও সেই সংগে বাড়িয়া ওঠে এবং ক্রমশ মৃদু হাসির রোল হইতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ অট্টহাসিতে দুলিয়া ওঠে এবং হাসি আর থামিতেই চাহে না। মেলশিয়র ঠিক এমনটিই আশা করিয়াছিল, জাঁ-ক্রিস্তফের পোষাক দেখিয়া শ্রোতারা যে এইরকম উল্লসিত হইয়া উঠিবে, তাহা সে ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। একরাশ লম্বা লম্বা চুল আর জিপ্সীদের মতন গায়ের রঙ সেই ছোট্ট শিশুকে রীতিমত একজন ভারিক্কি মানুষের পুরা সান্ধ্য-পোষাকে ধীর পাদক্ষেপে চলিতে দেখিয়া, শ্রোতারা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহারা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ সেই অট্টহাস্যের রোলে দুলিয়া ওঠে। অবশ্য সে-হাসির মধ্যে বিরূপ বিরোধিতা কিছু ছিল না, কিন্তু তাহাতে অবিচলিত থাকা রীতিমত কড়া পেশাদার নট-নটীর পক্ষেও দুরূহ ছিল। চারিদিকে শত শত চক্ষু তাহারই দিকে চাহিয়া আছে, এই চিন্তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই তুমুল অট্টহাস্যের শব্দে জাঁ-ক্রিস্তফ ভীত আতঙ্কিত হইয়া ওঠে, মনের মধ্যে তখন একটি মাত্র চিন্তা প্রবল হইয়া ওঠে, কোনরকমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিয়ানোতে তাহার নির্দিষ্ট আসনে গিয়া বসা। স্পষ্টই সে বুঝিয়াছিল, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্যে পিয়ানোর সামনে আসনটুকুই হইল তাহার একমাত্র রক্ষাদ্বীপ। মাথা নত করিয়া, ডাইনে বা বামে কোন দিকে না চাহিয়া, একরকম ছুটিয়া সে মঞ্চের মাঝামাঝি আসিয়া পড়ে, সেখান হইতে শ্রোতাদের মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিবার কথা ছিল, মেলশিয়র আর বৃদ্ধ বার বার করিয়া সেই কথা তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল এবং বহুবার তাহার রিহার্সালও দিতে হইয়াছিল, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল, সেখান হইতে পিছন ফিরিয়া সে কোনরকমে পিয়ানোর সামনে টুলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু সেখানে আসিয়া আর এক বিপত্তি ঘটিল। টুলটি তাহার পক্ষে এত উঁচু যে নিজে কিছুতেই স্বচ্ছন্দে তাহার উপর উঠিয়া বসিতে পারিল না।

বিভ্রান্ত বেদনায় কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া, সে কোন রকমে হাঁটু দিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিল। তাহাতে শ্রোতারা আর এক দফা আরো জোরে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু এখন আর তাহাতে জাঁ-ক্রিস্তফের কিছু যায় আসে না। সে তাহার পরিচিত আশ্রয়-স্থলে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। সেখানে বসিয়া, সে জগতের কোন কিছুকেই ভয় করে না।

অবশেষে, মেলশিয়র প্রবেশ করিল। শ্রোতারা তখন খোশ-মেজাজেই ছিল, তাই তাহাকেও বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিয়া উঠিল। সোনাটা আরম্ভ হইয়া গেল। পিয়ানোর পর্দার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, একাগ্রতায় দুই ওষ্ঠ সুসংবদ্ধ, জাঁ-ক্রিস্তফ নিখুঁতভাবে বাজাইয়া চলিল। যতই সংগীত আগাইয়া চলে, ততই সে নির্ভয় হইয়া উঠে, যেন তাহার পরিচিত বান্ধব মহলে সে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রেক্ষাগৃহ হইতে প্রশংসার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়; তাহার বাজনা শুনিবার জন্যই সেই বিরাট প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হইয়া আছে, ভাবিতেই তাহার সর্ব-শরীরে আনন্দ আর গর্বের রোমাঞ্চ জাগিয়া ওঠে। কিন্তু বাজনা শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে আবার সেই আতঙ্ক ফিরিয়া আসিল এবং শ্রোতাদের আনন্দ-করতালিতে আনন্দের চেয়ে সে যেন বেশী লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মেলশিয়র যখন তাহার হাত ধরিয়া পাদপ্রদীপের সামনে টানিয়া লইয়া গিয়া শ্রোতাদের অভি-বাদন করিতে ইঙ্গিত করিল, লজ্জায় সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। মেলশিয়রের আদেশ সে পালন করিল বটে কিন্তু এমন ছোট করিয়া মাথা নত করিল যে সেই অনভ্যস্ত বে-কায়দায় শ্রোতারা হাসিয়া উঠিল। লজ্জায় জাঁ-ক্রিস্তফ আরক্তিম হইয়া ওঠে, যেন হাস্যকর কুৎসিত কিছু করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহাকে আবার গিয়া পিয়ানোয় বসিতে হইল, কারণ, তখন আসল জিনিসই বাকি ছিল। পিয়ানোয় ফিরিয়া গিয়া, সে তাহার নিজস্ব রচনা, শৈশবের সুখস্মৃতি বাজাইতে আরম্ভ করিল। সেই সংগীত শুনিয়া শ্রোতারা সত্যই বিমুগ্ধ হইয়া গেল। প্রত্যেক অংশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা সোৎসাহে করতালি দিয়া ওঠে। এবং একবার বাজানো শেষ হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার গোড়া হইতে বাজাইবার জন্য অনুরোধ করে। জাঁ-ক্রিস্তফ আজ জয়ী। গর্বে তাহার বুক দুলিয়া ওঠে। দ্বিতীয়বার বাজনা শেষ হইলে, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে

অভিনন্দন জানাইল। জাঁ-ক্রিস্তফ তখন একলা পিয়ানোর টুলে বসিয়াছিল, সাহস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পর্যন্ত পারিল না। শ্রোতারা তাহাতে আরো উত্তেজিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার মাথা ক্রমশ আরো যেন নীচু হইয়া আসিতে থাকে, অবনত-মস্তকে সে জনতার বিপরীত দিকে দৃষ্টি-নিবন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। অবশেষে মেলশিয়র আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল। হাত ধরিয়া তাহাকে আসন হইতে তুলিয়া লইয়া পাদপ্রদীপের দিকে অগ্রসর হয় এবং জনতার অভিবাদনের উত্তরে রঙ্গমঞ্চ হইতে চুম্বন ছুঁড়িয়া দিবার জন্য বালককে আদেশ করে। গ্রান্ড ডিউক কোথায় বসিয়া আছেন, ইঙ্গিতে বালককে তাহা দেখাইয়া দেয়। কিন্তু কোন কথাই জাঁ-ক্রিস্তফের কানে আসিয়া পৌঁছায় না। মেলশিয়র ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে নিম্নস্বরে বালককে রূঢ়ভাবে ভর্ৎসনা করে। অগত্যা বালক নির্দেশ মত সবই করিল কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কাহারও দিকে ফিরিয়া দেখিল না, এমন কি মাটির দিক হইতে একবারও চোখ তুলিয়া চাহিল না; কোন রকমে মাথা ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। এমন জয়ের মুহূর্তে, অন্তরের অন্তস্থল কোথা হইতে ছাইয়া আসে নিরানন্দে, নিদারুণ অস্বস্তিতে। কেন, তাহা সে বুঝিতে পারে না, বেদনায় ভরিয়া ওঠে মন। তাহার আত্ম-সম্মানে কোথায় যেন সুতীব্র আঘাত লাগে। তাহার আশে-পাশে চারিদিকে যেসব লোক তাহাকেই অভিনন্দিত করিতেছে, ভাল লাগে না তাহাদের। এখন কেন তাহারা তাহার জয়ধ্বনি করিতেছে? সে ভোলে নাই, কিছু-ক্ষণ আগেই তাহাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্কো-চের অনভ্যস্ততায় তাহারা রীতিমত মজা পাইয়াছিল! না, না, সে কিছুতেই তাহাদের ক্ষমা করিবে না। তাহাদের উদ্দেশ্যে চুম্বন বর্ষণ করিবার জন্যই কোমরে হাত দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল, কি হাস্যকর অবস্থাতেই না তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল, রাগে তাহাদের অভিনন্দন পর্যন্ত জাঁ-ক্রিস্তফের বিরাগের কারণ হইয়া উঠিল। শূন্য হইতে মেলশিয়র যখন তাহাকে নামাইয়া দিল, কোন দিকে না চাহিয়া সে সোজা উইঙ্গসের দিকে ছুটিল। যখন ছুটিয়া যাইতেছিল, প্রেক্ষাগৃহ হইতে একজন মহিলা এক গুচ্ছ ভায়োলেট ফুল তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিল, সজোরে সেই পুষ্পগুচ্ছ তাহার মুখে আসিয়া লাগিল। কি না কি, আতঙ্কে চমকাইয়া উঠিয়া দ্রুত চলিতে গিয়া সামনের এক চেয়ারের

সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। যত জোরে সে ছোটে, শ্রোতারা তত জোরে হাসিয়া ওঠে, যত জোরে তাহারা হাসে, তত জোরে সে ছুটিতে আরম্ভ করে।

অবশেষে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে মঞ্চ-দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখে, একদল লোক তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, একরকম তাহাদের ধাক্কা দিয়া সে ছুটিয়া পিছনের একটি ঘরের আড়ালে আসিয়া হাঁফ ছাড়িল। ঠাকুরদা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া আসিয়াছিল, বৃদ্ধের আজ উল্লাসের অবধি নাই। আশীর্বাদে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ফেলেন। অর্কেষ্ট্রার বাদকরা তাহার নিকটে আসিয়া উল্লসিত কণ্ঠে হাসিতে থাকে এবং প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানায়, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুতেই তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে পারে না, করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইতে পর্যন্ত পারে না। মেলশিয়র কান খাড়া করিয়া শোনে, তখনও পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে করতালি উঠিতেছে, স্থির করে জাঁ-ক্রিস্তফকে সে পুনরায় মঞ্চে লইয়া যাইবে। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ রীতিমত ক্রুদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইল, ঠাকুরদার জামা ধরিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যে কেহ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল, হাত-পা ছুঁড়িয়া সে তাহাদের ফিরাইয়া দিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

ঠিক সেই সময় একজন অফিসর আসিয়া জানাইল, মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউক তাঁহার বক্সে শিল্পীকে আনিবার জন্য বাসনা জানাইয়াছেন। সেই অবস্থায় কি করিয়া বালককে গ্রাণ্ড ডিউকের সামনে উপস্থিত করানো যায়? রাগে মেলশিয়র গালাগাল দিয়া উঠিল কিন্তু মেলশিয়র যত গালাগাল দেয়, বালক ততই কাঁদিতে থাকে। অবশেষে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল নিভৃতে বালককে টানিয়া লইয়া শপথ করিল, যদি সে কান্না থামায়, তাহা হইলে তিনি এক পাউণ্ড চকোলেট তাহাকে কিনিয়া দিবেন। বৃদ্ধ জানিতেন, চকোলেট সম্বন্ধে জাঁ-ক্রিস্তফের দুর্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে বালক স্তব্ধ হইয়া গেল, সমস্ত কান্না চেষ্টা করিয়া যেন গিলিয়া লইল। বালক যাইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহার নিকট অঙ্গীকার করিতে হইল যে, রঙ্গমঞ্চের উপর আর তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে না।

গ্রাণ্ড ডিউকের বক্সের সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে জাঁ-ক্রিস্তফকে যখন

গ্রান্ড ডিউকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি রহস্যছলে অন্তরঙ্গের মতন বালককে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া সম্বোধন করিয়া উঠিলেন: 'এস! নব-কলেবরে নূতন মোজার্ট!' তারপর পর্যায়ক্রমে তাহাকে গ্রান্ড ডাচেস, আর তাঁহার কন্যা এবং দলের অন্যান্য লোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া রইল। কিন্তু চোখ তুলিয়া একবারও সে কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল না, দেখিল শুধু কোমরের নীচে কোটের অংশ আর স্কার্টের ঝালর। তরুণী রাজকুমারী তাহাকে আদর করিয়া কোলে বসাইল, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঠ হইয়া সে বসিয়া রহিল মাত্র। রাজকুমারী তাহাকে যত প্রশ্ন করিল, একটিরও উত্তর সে দিতে পারিল না, তাহার হইয়া মেলশিয়র একান্ত অনুরক্ত দীন ভৃত্যের মত গদ্‌গদকণ্ঠে প্রাণহীন স্তোক বাক্যে উত্তর দিয়া চলিল; কিন্তু সে-উত্তরের জন্য রাজকুমারীর কোন আগ্রহই ছিল না, সে অনবরত চেষ্টা করিতেছিল, কি করিয়া সেই বালকের মুখ হইতে কথা বাহির করা যায়।

লজ্জায় জাঁ-ক্রিস্‌তফ ক্রমশ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল এবং যতই লজ্জায় সে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, তাহার মুখের দিকে নিশ্চয়ই সবাই চাহিয়া আছে, নিশ্চয়ই সবাই ভাবিতেছে, কেন তাহার মুখ এত লাল হইয়া উঠিল। পাছে তাহারা অন্যরকম কিছু মনে করে, সেইজন্য তাহাদের একটা কিছু বুঝাইয়া বলা দরকার। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জাঁ-ক্রিস্‌তফ বলিয়া ওঠে:

'আমার মুখ...ঐ রকমই লাল...মানে...আমি...'

রাজকুমারী অট্টহাস্য করিয়া ওঠে। কিন্তু সে-অট্টহাসি এবার জাঁ-ক্রিস্‌তফের খুব খারাপ লাগিল না। কিছুক্ষণ আগে শ্রোতাদের অট্টহাসিতে সে যে রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, রাজকুমারীর হাসিতে কিন্তু রাগের কোন হেতু দেখিতে পাইল না। বরঞ্চ তাহার হাসি মধুরই লাগিল। রাজকুমারী আদর করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, জাঁ-ক্রিস্‌তফের ভালই লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইবার সময়, দেখিল, ঠাকুরদা পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন, আনন্দে প্রোজ্জ্বল মুখ কিন্তু কুণ্ঠায় বিনম্র। বৃদ্ধের অন্তরের প্রবল বাসনা ছিল, সকলের সামনে দাঁড়াইয়া কিছু বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না, কেহ তাঁহাকে ডাকেও নাই। দূরে দাঁড়াইয়া তিনি পৌত্রের গৌরব নীরবে অনুভব করিতেছিলেন। ঠাকুরদাকে দেখিয়াই জাঁ-ক্রিস্‌তফের অন্তর বেদনায় সকরুণ হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে এক

দুর্বার বাসনা জাগিয়া উঠিল, বৃদ্ধের প্রতি যে অবিচার করা হইতেছে, সে অন্তত তাহা সহ্য করিবে না, বৃদ্ধের কৃতিত্ব লোককে জানাইতে হইবে। নিজের জন্য যাহা সে পারে নাই, বৃদ্ধের জন্য তাহা সে অবলীলাক্রমে করিল। তাহার নূতন বন্ধু রাজকুমারীর কানে গিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল : 'একটা গোপন কথা আপনাকে বলবো!'

রাজকুমারী তাহার গাম্ভীর্যে হাসিয়া উঠিয়া বলিল: 'কি?'

জাঁ-ক্রিস্তফ বলে: 'আপনার মনে আছে...আমি যে-সংগীত বাজালাম...তার মিনুয়েতো অংশে যে ত্রিয়ো ছিল... মনে পড়েছে তো? [আস্তে আস্তে গুঞ্জন করিয়া সেই অংশটুকু সে শুনাইয়া দেয়]... আপনি জানেন, সেটুকু কার রচনা? আমার ঠাকুরদা সেই অংশটুকু রচনা করেছেন, আমি নই। অবশ্য বাকি আর সব আমারই। কিন্তু ঐ ত্রিয়োটুকুই তো আমার রচনার মধ্যে সব চেয়ে ভাল...না? সেটা ঠাকুরদাই তৈরী করেছেন, তাঁর সৃষ্টি! অবশ্য, ঠাকুরদা আমাকে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন, যেন আমি কাউকে না জানাই। আপনি নিশ্চয়ই আর কাউকে জানাবেন না। কেমন? [বৃদ্ধকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া] উনিই হলেন আমার ঠাকুরদা। আমি খুব ভালবাসি ওঁকে...আমাকেও উনি কত যে ভালবাসেন!'

জাঁ-ক্রিস্তফের কথায় রাজকুমারী আনন্দে হাসিয়া ওঠে, বলে: 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি সোনা, তুমি মনা!' সেই সঙ্গে চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া তোলে এবং জাঁ-ক্রিস্তফের নিষেধ ভুলিয়া গিয়া দলের সকলকে ডাকিয়া তাহার ঠাকুরদার কৃতিত্বের কথা জানাইয়া দেয়। সকলেই আনন্দে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানায়। গ্রাণ্ড ডিউক খুশি হইয়া বৃদ্ধকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে এমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন যে, অপরাধী আসামীর মতন স্পষ্ট করিয়া কিছু উচ্চারণ করিতেই পারিলেন না। জাঁ-ক্রিস্তফ কিন্তু আর কোন কথাই বলিতে পারে না। ঠাকুরদার সম্বন্ধে তাহার যে নির্ভীকতা ছিল, নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। রাজকুমারী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে পারিল না। সে তেমনি কাঠ হইয়া রহিল। এবার মনে মনে রাজকুমারীর উপর তাহার নিদারুণ রাগ হইল। অন্য কাহাকেও জানাইতে সে বারণ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রাজকুমারী সকলকে ডাকিয়া

জানাইয়া দিল। এ জাতীয় অপরাধ, অন্তত রাজকুমারী সম্পর্কে সে ক্ষমা করিতে পারে না।

রূপকথার রাজকুমারী সম্পর্কে তাহার মনে যে ধারণা ছিল, তাহা ভাঙিগয়া চুরমার হইয়া গেল। তাহার অন্তরের কথা যে রাজকুমারী তাহার কাতর মিনতি সত্ত্বেও এইরকম ভাবে সকলকে জানাইয়া দিতে পারিল, তাহাকে কি করিয়া আর সে রাজকুমারী বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে? তাই তাহাকে কথা বলাইবার রাজকুমারীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও, সে কাঠ হইয়া রহিল। একটা কথাও আর মুখ দিয়া উচ্চারণ করিল না, যেন সে বোবা। তাহার বিশ্বাসের এই অপব্যবহারে সে এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আশেপাশে যে-সমস্ত কথা হইতেছিল, তাহার কিছুই তাহার কানে প্রবেশ করিল না, এমন কি প্রিন্স রহস্য করিয়া যখন বলিলেন, অতঃপর জাঁ-ক্রিস্তফকে তিনি তাঁহার রাজসভার বেসরকারী পিয়ানো-বাদক নিযুক্ত করিবেন, জাঁ-ক্রিস্তফ শুনিতেই পাইল না।

সেখানকার পালা শেষ করিয়া থিয়েটরের নিষ্ক্রমণ-পথের উপর যখন আসিয়া দাঁড়াইল, চারিদিক হইতে লোকে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অভিনন্দন জানাইল। এমনকি যখন থিয়েটর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও লোকে তাহাকে ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, কেহ কেহ আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। যে কেহ, তাহার অনুমতি না লইয়া, এইভাবে তাহাকে চুম্বন করিবে সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। বড়ই বিরক্তিকর লাগে।

অবশেষে তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। বাড়ীতে পা দিতে না দিতে মেলশিয়র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জানাইল, সে একটা আস্ত গাধা, কেন সে বাইরের লোকদের জানাইয়া দিল, ত্রিয়ো-অংশটা তাহার রচনা নয়? জাঁ-ক্রিস্তফ এই ভর্ৎসনায় বিস্মিত হইয়া যায়। তাহার ধারণা, এই কার্যের দ্বারা সত্যিই সে একটা প্রশংসনীয় কিছু করিয়াছে, সু-মহান কর্তব্য বলিয়াই তাহার অন্তর যাহার নির্দেশ দিয়াছিল। তাহার জন্য প্রাপ্য অকুণ্ঠ প্রশংসা, তিক্ত ভর্ৎসনা নয়। তাই পিতার সেই রূঢ় ভর্ৎসনায় সে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। পিতার মুখের উপর জানাইয়া দেয়, তাহার ভর্ৎসনাকে সে গ্রাহ্য করে না।

পুত্রের এই অবাধ্যতায় মেলশিয়রের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, শাসাইয়া ওঠে, কান মলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবে! অবশ্য, বাজনা সে ভালই

বাজাইয়াছে কিন্তু তাহার মূর্খতায় আসল উদ্দেশ্য সব পণ্ড হইয়া গিয়াছে।

পিতার এই ভর্ৎসনা ভয়াবহ অন্যায়রূপে তাহার অন্তরকে আহত করিল। সবাইকে সুবিচার করিবার যে স্বভাবধর্ম তাহার শিশু-অন্তরে প্রবল হইয়াছিল, রূঢ়ভাবে তাহাতে আঘাত লাগিল। ঘরের অন্ধকারে এক কোণে মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে, বিশ্ব-শুদ্ধ লোকের উপর ঘৃণায় মন ভরিয়া যায়, তাহার পিতা, গ্রান্ড ডিউক, সবাইকে সমান ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। আর একটি কারণে সে আরও ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে; দেখে প্রতিবেশীরা সকলে বাড়ীতে আসিয়া তাহার পিতাকেই অভিনন্দন জানাইতেছে, যেন আসলে মেলশিয়রই বাজাইয়াছে, মেলশিয়রের জন্যই যেন সেই কনসার্ট হইয়াছে।

এমন সময় গ্রান্ড ডিউকের প্রাসাদ হইতে একজন ভৃত্য উপহার লইয়া উপস্থিত হইল, গ্রান্ড ডিউক একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছেন, আর রাজকুমারী এক বাক্স নানাধরণের উপাদেয় মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছেন। দুইটি উপহারই জাঁ-ক্রিস্তফের ভাল লাগিল, কিন্তু তখন এমন খারাপ মেজাজে ছিল যে, তহার ভাল লাগিয়াছে, সেকথা পর্যন্ত সে কিছুতেই বাহিরে স্বীকার করিতে পারিল না। বিশেষ করিয়া রাজকুমারীর মিষ্টান্নের বাক্সের দিকে মুখ ভার করিয়া বিরক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, মনে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, যে তাহার বিশ্বাসের এইরকম অপব্যবহার করিয়াছে, তাহার উপহার গ্রহণ করা উচিত হইবে কি না। প্রায় নিজেকে রাজী করিয়া আনিয়াছিল, এমন সময় মেলশিয়র আদেশ করিল, এখুনি কালি-কলম লইয়া টেবিলে বসিতে হইবে এবং সে যেভাবে বলিয়া দিতেছে, অবিকল সেইভাবে এবং সেই ভাষায় পত্র লিখিয়া অবিলম্বে ধন্যবাদ জানাইতে হইবে। জাঁ-ক্রিস্তফ আর নিজেকে সংগোপন রাখিতে পারিল না। সারাদিনের উত্তেজনার ফলে তাহার মন যেরকম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর মেলশিয়র চিঠির সম্বোধন যে ভাষায় লিখিতে আদেশ করিল, তাহাতে জাঁ-ক্রিস্তফ আর অশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার সমস্ত আত্মসম্মান-বোধ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। চিঠির প্রারম্ভেই মেলশিয়র সুরু করিল: "মহামহিমান্বিত মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ দীন ভৃত্য ও সঙ্গীতকার...'

নিজের হাতে নিজের সেই অকারণ ক্ষুদ্রতার কথা সে লিখিতে

পারিল না। চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল এবং কোন প্রবোধ মানিল না। অদূরে রাজভৃত্য এই দৃশ্য দেখিয়া বিরক্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে মেলশিয়রকেই নিজের হাতে সেই চিঠি লিখিতে হইল এবং তাহার পরিণাম জাঁ-ক্রিস্তফের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইল না। এমন সময় ভাগ্যের চরম পরিহাসস্বরূপ জাঁ-ক্রিস্তফের নিকট হইতে উপহারের ঘড়িটি পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। নিরুদ্ধ ঝড় প্রলয়-মূর্তিতে বালকের মাথায় ভাঙিয়া পড়িল। মেলশিয়র চিৎকার করিয়া জানাইল, উপবাসে তাহাকে রাত কাটাইতে হইবে। লুইসাও তাহাতে যোগদান করিল, মিষ্টির বাক্সে সে হাত দিতে পারিবে না। লুইসার কথায় বালকও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, জানাইয়া দিল, সেই মিষ্টির বাক্স তাহার, অন্য কাহারও তাহাতে কোন অধিকার নাই, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না! বালক তাহার উত্তর পাইল, প্রহারে। রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া লুইসার হাত হইতে মিষ্টির বাক্সটা কাড়িয়া লইল এবং ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর সজোরে লাথি মারিতে লাগিল। মেলশিয়র রাগে বেত লইয়া উত্তম-মধ্যম প্রহার করিল, জোর করিয়া টানিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিল।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে শুনিতে পাইল, পাশের ঘরে তাহার মা-বাবা বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া রীতিমত ভূরি-ভোজনে বসিয়াছে, এক সপ্তাহ আগে হইতে কনসার্ট উপলক্ষে এই ভোজের আয়োজন চলিয়াছিল। অথচ আজ তাহা হইতে সে-ই বঞ্চিত হইল! এই নিদারুণ অবিচারে তাহার মনে হইল, সেই মুহূর্তে যেন সে মরিয়া যায়! তাহাদের সুতৃপ্ত অট্টহাসি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়, গেলাসে গেলাসে ঘর্ষণের শব্দ ওঠে। তাহার অনুপস্থিতির জবাবদিহিরূপে নিমন্ত্রিতদের জানান হইল যে সে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, তাই নিমন্ত্রিতরাও তাহার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে, নিমন্ত্রিতরা যখন যে-যার বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই সময় জাঁ-ক্রিস্তফ বিছানায় চোখ বন্ধ অবস্থায় শুনিতে পাইল, তাহার ঘরে যেন কাহার সন্তর্পণ মৃদু পদ-শব্দ হইল, সে-শব্দ তাহার বিছানার দিকে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল। জাঁ-ক্রিস্তফ শুনিল বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল তাহার শয্যার দিকে নত হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, স্নেহার্ত মৃদুকণ্ঠে শুধু বলিলেন : 'ওরে আমার পাগল...' তারপর, যেন লজ্জিত

হইয়াই বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নিঃশব্দে পা টিপিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বালকের হাতের মুঠার মধ্যে কতকগুলি মিষ্টান্ন গুঁজিয়া দিয়া গেলেন, টেবিল হইতে গোপনে পকেটে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সেই স্নেহের ছোট্ট স্পর্শটুকুতে জাঁ-ক্রিস্তফের মনের জ্বালা যেন শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তির ফলে তাহার ভাবিবার শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না, তাই বৃদ্ধের এই সামান্য আচরণ-টুকুর পূর্ণ তাৎপর্য সে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিল না। বিদ্যুৎ-স্পর্শে দেহ যেমন ব্যথিত চকিত হইয়া ওঠে, তেমনি ক্লান্ত স্নায়ু সর্বদেহকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। উন্মাদ উত্তাল সংগীত স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলে। গভীর রাত্রিতে সহসা নিদ্রা ভাঙিয়া যায়। কনসার্টের প্রারম্ভে বিঠোফেনের যে ওভার্‌চার শুনিয়া-ছিল, তাহা যেন সমুদ্র-গর্জনের মতন কানের কাছে আসিয়া বাজিতে থাকে। মনে হয় সমস্ত ঘর যেন সেই উত্তাল সংগীতের ছন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসে, হাত দিয়া দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বুঝিতে চেষ্টা করে, সে সত্যি জাগিয়া আছে, না, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। না...সে তো স্বপ্ন দেখিতেছে না...জাগিয়াই বসিয়া আছে। বিঠোফেনের সেই উন্মাদ দুরন্ত সংগীত, তাহার প্রত্যেকটি সুর যেন সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, সেই ক্রুদ্ধ গর্জন, বন্য আর্তনাদ, ঝঞ্ঝার হাহাকার স্পষ্ট তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে; তাহার নিজের অন্তরের প্রতিটি স্পন্দনে সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছে সেই উন্মাদ সংগীত-স্রষ্টার অনুরাগমত্ত অন্তরের আর্তস্পন্দন...অরণ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন উতলা করিয়া সেই দুরন্ত ঝড়ের ঝাপটা যেন তাহার মুখে চোখে সজোরে আসিয়া লাগিতেছে; তারপর হঠাৎ কোন্ মহাপ্রবলের আদেশে এক নিমেষের মধ্যে সেই উন্মাদ ধ্বংসের উত্তেজনা থামিয়া যায় ...প্রচণ্ড কলরবের বুকে সহসা আবির্ভূত হয় প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। বিঠোফেনের অতিকায় সত্বা যেন তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিজস্ব সমস্ত চেতনাকে ফুৎকারে নিভাইয়া দেয়, তাহার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিমেষের মধ্যে তাঁহার বিরাট সত্বার উপযোগী বিরাট বিশাল করিয়া তোলে। সে যেন শিশু নয়, সে যেন বিঠোফেনের আত্মার সহোদর, তেমনি সুবিশাল, অতিকায়। সমগ্র বিশ্বকে ছাইয়া উঠিয়াছে তাহার সত্বা। মেঘচুম্বী শৃঙ্গ লইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে...অচল অটল

পর্বত, তাহাকে ঘিরিয়া আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছে প্রমত্ত ঝড়, ব্যর্থ আক্রোশের ঝড়, বেদনার ঝড়। ...কি বিপুল বেদনা। কিন্তু পর্বতের তাহাতে কিছু যায় আসে না। জাঁ-ক্রিস্তফের কিছু যায় আসে না! পর্বতের মত সে অচঞ্চল, শক্তিমান...আসুক ঝড়, বেদনার ঝড়...যত প্রবলই হোক্, সে সহ্য করিবে...সহ্য করিবার সে-ক্ষমতা আছে পর্বতের ...দুঃখের চেয়ে বড় সেই দুঃখকে সহ্য করিবার শক্তি...কি আনন্দ আছে সেই শক্তিতে! যে শক্তিমান, আনন্দে সে পারে দুঃখকে গ্রহণ করিতে!

হঠাৎ রাত্রি-নিশীথে নিস্তব্ধ শয্যায় সে হাসিয়া ওঠে। সে-হাসিতে সহসা ঘরের নীরবতা ভঙ্গিয়া যায়। শয্যা হইতে জাগিয়া মেলশিয়র চিৎকার করিয়া ওঠে: 'কে? কে শব্দ করে?'

মৃদুকণ্ঠে লুইসা স্বামীকে বলে: 'চুপ্ কর...ও স্বপ্ন দেখ্ছে... স্বপ্নে হাসছে...'

আবার তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ হইয়া যায়।

সঙ্গীতও থামিয়া যায়। শুধু কানে আসে নিদ্রিতদের নিঃশ্বাসের উত্থান-পতনের নিয়মিত শব্দ...নিশ্ছিদ্র তমসার সাগরে নিদ্রার তরীতে তরীতে নীরবে ভাসিয়া চলিয়াছে যাত্রীর দল...একই বেদনার বন্ধনে বাঁধা সহযাত্রী সব...একই জীর্ণ ভগ্ন ভেলায় ভাগ্য তাহাদের পাশাপাশি টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে...উন্মাদ ঝঞ্ঝার তাড়নায় রাত্রির তমসা ভেদ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র তরী...